কাশ্মীর
ইতিহাস ও রাজনীতি
জাকারিয়া পলাশ

কাশ্মীর
ইতিহাস ও রাজনীতি
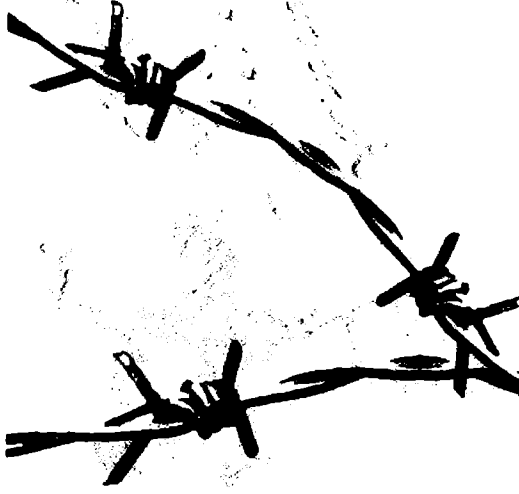
কাশ্মীর

ইতিহাস ও রাজনীতি

জাকারিয়া পলাশ

সূচীপত্র
ঢাকা-বাংলাদেশ

সৃজনশীল প্রকাশনায় ২৫ বছর পেরিয়ে...

প্রকাশক ❑ সাঈদ বারী
প্রধান নির্বাহী, সূচীপত্র
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন ❑ ০১৭১১-৫৮৩০৪৯

কাশ্মীর: ইতিহাস ও রাজনীতি
জাকারিয়া পলাশ

প্রথম প্রকাশ ❑ ফেব্রুয়ারি ২০১৭
প্রচ্ছদ ❑ সাইয়্যেদ মুহা. তাইয়্যেব
বর্ণবিন্যাস ❑ শাওন কম্পিউটারস্
মুদ্রণ ❑ সাদাত প্রিন্টিং প্রেস, ১৪ কবিরাজ গলি লেন, ঢাকা ১১০০

ভারতে পরিবেশক ❑ রাজু বুক স্টোর স্টল নং ৭, ব্লক-২, কলেজ স্কয়ার (দক্ষিণ), সূর্যসেন স্ট্রিট, কলকাতা,
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিবেশক ❑ মুক্তধারা জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক,
www.muktadhara.com
যুক্তরাজ্যে পরিবেশক ❑ সঙ্গীতা লিমিটেড ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন
কানাডায় পরিবেশক ❑ এটিএন বুক অ্যান্ড ক্রাফ্টস ২৯৭০ ড্যানফোর্থ অ্যাভিনিউ, টরেন্টো
অনলাইন বুকশপ ❑ www.rokomari.com/sucheepatra
KASHMIR: ITIHAS O RAJNITI (Kashmir: History & Pilitics)
by Zakaria Polash
Published by Saeed Bari, *Chief Executive*, Sucheepatra,
38/2Ka Banglabazar Dhaka 1100, Bangladesh.
Ph : (880-2) 01711-583049
e-mail : saeedbari07@gmail.com
www.facebook.com/sucheepatra
Price : BDT. 400.00 Only. US $ 20.00. £ 10.00

মূল্য : ৳ ৪০০.০০ মাত্র

ISBN 978-984-92131-1-6

এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও মতামত গ্রন্থকারের নিজস্ব –প্রকাশক

আমার চার বোন-

আয়শা, মাহমুদা, জামিলা ও ফেরদৌসী; যাদের অনুজ আমি

কৈফিয়ত ও কৃতজ্ঞতা

কাশ্মীরকে দেখেছি সবকটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। দুই বছর কাশ্মীর আমার সঙ্গে মিশেছিল; আর আমি কাশ্মীরের সঙ্গে। লিখতে গিয়ে 'আমি' শব্দটিকে পাশ কাটানোর চেষ্টা করেছি বহুবার। শেষে আবিষ্কার করলাম, 'আমি'কে বাদ দিলে কাশ্মীরকে লেখায় আনতে পারছি না। কাশ্মীরের সঙ্গে আমার এই সম্প্রীতি এ বইয়ের সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা। যদিও সাবধান ছিলাম, পাছে এই সংযোগ আমাকে পক্ষপাতদুষ্ট করে ফেলে! তবু ক্ষমাপ্রার্থী। চেষ্টা ছিল, বাংলাদেশির দৃষ্টিতেই কাশ্মীরকে দেখার ও তুলে ধরার। সার্থকতা বিচারের দায়িত্ব পাঠকের।
প্রায় তিন বছরের ভাবনা, পড়াশোনা আর প্রচেষ্টার ফসল এটি। এই সুদীর্ঘ কালে যারা পাশে ছিলেন তাদের নামগুলো শুরুতে জানানো আবশ্যক বোধ করি। শারমিন তামান্না, সুবর্ণা ধর, শাফিনুর শাফিন ও তানজিনা আহমেদ– এই চারজন কাশ্মীরে আমার বাংলাদেশি সহপাঠী, বোন-বন্ধু। ওদের ধন্যবাদ। ধন্যবাদ চিং চা থাওয়াই মারমা ও সৌরভ পথবাসীকে। সর্বপ্রথম এই দুই বাংলাদেশিই আমাকে কাশ্মীর দেখিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রজের বয়ানে। ধন্যবাদ অসংখ্য কাশ্মীরি সুহৃদকে, যারা আমার কাছে উন্মুক্ত করেছেন কাশ্মীরকে।

ধন্যবাদ পাবেন সূচীপত্র প্রকাশনীর সাঈদ বারী। লেখা শুরুর আগেই তিনি প্রকাশের নিশ্চয়তা দিয়ে আমার সাহস বাড়িয়েছেন। এনটিভিবিডিডটকম-এর শেখ ফয়সাল আহমেদকে ভোলা যায় না। প্রায়ই স্কাইপে কল করে তিনি তাগিদ দিতেন লেখার। দৈনিক মানবজমিনের প্রধান সম্পাদক শ্রদ্ধেয় মতিউর রহমান চৌধুরীর কল্যাণ কামনা আর প্রশংসা আমাকে আত্মবিশ্বাসী করেছিল। যোগাযোগ রাখতেন মানবজমিন পরিবারের কাজল ঘোষ, কাফি কামাল, লুৎফর রহমান, সাজিদুল হক, সিরাজুস সালেকিন, ইমরান আলীসহ অনেকে– কৃতজ্ঞতা তাদের প্রতি। ভ্রাতৃপ্রতিম কামরান সিদ্দিকী, খাদেমুল ইসলাম, রেজাউল হক কৌশিক, নাজমুস সাকিব, ইজাজ সৌমিক, সৈয়দ আরিফুল হক, জুবায়ের টিপু ও মামাতো ভাই হাসানুল বান্না অনুপ্রেরণা জোগাতেন সবসময়।
সাপ্তাহিক সাম্প্রতিক দেশকাল-সম্পাদক ইলিয়াস উদ্দিন পলাশ বিরাট অবদান রেখেছেন এ কাজে। তার কাগজে ধারাবাহিকভাবে ছাপা না হলে এ বছর কাজটি শেষ করা নিয়ে সংশয় থাকতো। সপ্তাহান্তে সাম্প্রতিক দেশকাল থেকে ফয়জুল আল আমীন ফোন করে বলতেন, 'পরের সংখ্যা কই?' ধন্যবাদ ওই প্রশ্নটির জন্য। কৃতজ্ঞতা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা পাঠকদের যারা সামাজিক মাধ্যমে আমাকে

পড়েছেন এবং দিয়েছেন মূল্যবান প্রতিক্রিয়া ও পরামর্শ। প্রিয় ফারুক আহমদকে ধন্যবাদ স্বল্প সময় পুরো বইটির প্রুফ দেখে দেওয়ার জন্য। স্নেহভাজন সাইয়্যেদ মুহা. তাইয়্যেব বইটির প্রচ্ছদ করেছেন। তাকেও ধন্যবাদ।

স্মরণ করছি সাউথ এশিয়া ফাউন্ডেশন ও কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনেস্কো মদনজিৎ সিং ইনস্টিটিউট অব কাশ্মীর স্টাডিজ (ইউএমআইকেএস) সংশ্লিষ্ট সবাইকে। ওখানে পড়ার সুযোগ না হলে এ লেখা সম্ভব হতো না। আমার মা, ভাই-বোন, স্বজন ও সুহৃদরা এ কাজের জন্য যে দৃঢ় আশাবাদ রেখেছেন তার প্রতিদান আল্লাহ-ই দেবেন। কারণ, এ অধম তা দিতে অক্ষম।

জাকারিয়া পলাশ

সূচিপত্র

কল্পনার কাশ্মীর	১১
পর্বতের ভাঁজ, তার ওপারে উন্মুক্ত উপত্যকা	১৬
উপত্যকায় যেভাবে সভ্যতার বিকাশ	২৬
দুই সহস্রাব্দঃ হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলিম কাশ্মীর	৩২
অমৃতসরে বিক্রি হওয়া হতভাগ্য জাতি	৪৩
১৯৪৭ : বিভাজনের দ্বিধা	৫১
স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা	৬৫
শের-এ-কাশ্মীর	৭৫
বন্দুকের নল ও আজাদির স্বপ্ন	৭৯
আজাদি ও ইসলামী রাজনীতি	৮৭
স্বাধীনতা ও সংখ্যালঘুর দ্বিধা	৯৮
কাশ্মীরের স্বাধীনতা ও বামপন্থা	১১১
কাশ্মীর সমস্যা, জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক মহল	১১৫
কাশ্মীরের রাজনৈতিক অর্থনীতি	১২২
রূপের মঞ্জরি, বেদনার নিনাদ	১৩৪
নারী-জীবন ও সামরিকতন্ত্র	১৪৩
ভাষাঃ কা'শুর পৈঠ	১৫৬
কাশ্মীরিদের ধর্মবোধ ও সংস্কৃতি	১৬৫
মধুর সন্তুরঃ মনকাড়া সুর	১৭২
কাশ্মীরিদের চোখে বাংলাদেশ	১৭৭
আগামীর কথা	১৮৮
কাশ্মীর থেকে শেখা	১৯৭
পরিশিষ্ট-১ঃ অমৃতসর চুক্তি	১৯৯
পরিশিষ্ট-২ঃ ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ	২০২
পরিশিষ্ট-৩ঃ পারভেজ মোশাররফের চার দফা প্রস্তাব	২০৪

১
কল্পনার কাশ্মীর

'কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্সের শিক্ষার্থী আমি। মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘুরি ফিরি। আপেল-আঙ্গুর-কমলা লেবু খাই শাকসবজির মতো প্রতিদিন! পথে-ঘাটে ১০-২০ টাকায় কিনতে পাওয়া যায় ওগুলো। কেতাবে আছে বেহেশত এতই সুন্দর যে, 'কোনো চোখ কখনও দেখেনি। কোনো কান কখনও শোনেনি। কোনো মন কখনও চিন্তাও করেনি।' সাধারণ জ্ঞানের বইয়ে পড়েছি, কাশ্মীর হলো পৃথিবীর বেহেশত। প্রকৃত বেহেশতের রূপ ভাবনাতীত! সেখানেই আমার বসবাস। কতই না নয়নাভিরাম, বর্ণনাতীত! বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে থাকি। ক্লাস-পড়াশোনার পাশাপাশি ঘুরে বেড়াই গ্রাম-শহরের অলিগলি। দিন দিন বাড়ে বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা। মানুষের বাড়িতে বাড়িতে যাই, থাকি-খাই; জানতে চাই কেমন তাদের জীবন? ভূ-স্বর্গের মানুষ বলে কথা! ক্রমে আমি হয়ে উঠি বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ্য লোকের কাছে পরিচিত, প্রিয়। কাশ্মীরি রূপসী ললনারা নেকাবের আড়াল থেকে আমাকে দেখে, তাতে আমার মধ্যে শিহরণ বয়। আমার নাম জানে সবাই। সভা-সেমিনারে আমি কথা বলি। তাই সবাই আমাকে দেখলে চেনে, সম্মান করে বাংলাদেশি শিক্ষার্থী হিসেবে।

হঠাৎ ছেদ পড়ে সেই স্বাভাবিক জীবনযাত্রায়। এক রাতে সশস্ত্র 'জঙ্গিরা আমাকে হোস্টেল থেকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। দূরে অজ্ঞাত স্থানে আমাকে চোখ বেঁধে আটকে রাখে। জানতে চায়, কে তুই? আমি বলি আমার নাম। বাবার নাম। জাতীয়তা। কেন কাশ্মীরে এসেছি, কবে এসেছি, কবে ফিরবো– সবকিছুই বলি। ওরা জানতে চায়, আমি মুসলমান কিনা। আমি বলি হ্যাঁ। ওদের সন্দেহ হয়। আমার কাপড় খোলা হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়। আমার ধর্মীয় জ্ঞানের পরীক্ষা নেয়া হয়। তাতে আমি উত্তীর্ণ হই। এরপর আমাকে আটকে রাখা হয় তিন দিন। রেখে দেওয়া হয় চোখ বেঁধে। কিছু খাবারও দেওয়া হয়। আমি অবশ্য সাহস হারাইনি। নিশ্চিন্তে ছিলাম এই ভেবে যে, যা হবার হবে। আল্লাহ ভরসা! তিন দিন পর সশস্ত্র এক যুবক এসে বলে, তোকে মেরে ফেলে আমাদের কোনো লাভ নেই। তোকে ভারতীয় চর সন্দেহে আমরা ধরেছিলাম। তুই বেঁচে গেছিস। কিন্তু, এখন তোকে ছেড়ে দেওয়া আমাদের জন্য কঠিন। ভারতীয় বাহিনী তোকে ধরবে। আমাদের সম্পর্কে জানতে চাইবে। এটা আমাদের জন্য অসুবিধা। যাই হোক, তোকে মারব না, ছেড়ে দেবো। আমাকে চোখ বেঁধে কিছু দূর নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো। আমি ফিরে এলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ফিরে এসে জানলাম, আমাকে নিয়ে তোলপাড়। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক খবরের কাগজে শিরোনাম হয়েছে, কাশ্মীরে বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেল থেকে বিদেশি (বাংলাদেশি) ছাত্র

নিখোঁজ। ভারতীয় সেনাবাহিনী, জেঅ্যান্ডকে পুলিশ, গণমাধ্যম তন্ন তন্ন করে সন্ধান করছে আমার। বাংলাদেশেও তোলপাড়। বাংলাদেশি হাইকমিশন উদ্বেগ জানিয়েছে ভারত সরকারের কাছে। ফিরে আসার পর সবাই আমার কাছে জানতে চায় কী খবর? কোথায় ছিলাম। আমি তো হতবাক! গণমাধ্যমে ফলোআপ এলো। আমার সাক্ষাৎকার নিতে হুমড়ি খাচ্ছেন সংবাদকর্মীরা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সামলে উঠতে পারছেন না। আমি মিডিয়ার সামনে যাচ্ছি না। এভাবে কাটলো এক দিন। পরের দিন আমাকে যেতে হলো পুলিশের সামনে। তারা জানতে চাইল সবকিছু। আমি জানাব কিনা তা নিয়ে দ্বিধান্বিত। যারা আমাকে তুলে নিয়ে যেতে পারল তাদের তো ক্ষমতা কম নয়! তারা তো আমাকে মুক্তিও দিলো। তাহলে তাদের খবর পুলিশকে দেওয়া উচিত কিনা? পুলিশ তো আমাকে নিরাপত্তা দিতে পারেনি। উদ্ধারও করতে পারেনি। এখন পুলিশকে তথ্য দেওয়ার পর যদি তারা আবার আমাকে নিয়ে যায়। পুলিশ কি আমাকে বাঁচাতে পারবে? এসব প্রশ্ন আমার মনে। অবশেষে ওসব প্রশ্ন লুকিয়ে যথাসম্ভব জবাব দিলাম। আমি তো বিদেশি। কারও পক্ষেও নই, বিপক্ষেও নই। তেমনভাবেই বললাম। ফিরে এলাম। কিন্তু, তারপর থেকে মনের মধ্যে শুরু হলো খচখচানি। মনে হলো, আমার কোনো নিরাপত্তা নেই। যেখানে যাই, মানুষ আমাকে দেখে। ওখানে আমার শিক্ষাকাল ছিল দুই বছর। তখনও বাকি প্রায় ছয় মাস। ওই ছয় মাস এভাবেই কাটল। কোনো রকমে লেখাপড়া শেষ করে দেশে ফিরলাম।'

উপরের সব কথা কাল্পনিক। এমন কল্পনা করেছিলাম কাশ্মীরে পৌঁছার আগে। এই কল্পনার পেছনে কাজ করেছে কাশ্মীর সম্পর্কে আমার পূর্বধারণা। আর সেই ধারণা আমার মধ্যে নির্মিত হয়েছিল বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক অবস্থার মাধ্যমে। আমার বিশ্বাস, সিংহভাগ বাংলাদেশি মানুষের মনে কাশ্মীর এভাবেই আঁকা আছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, সাবেক ছাত্রনেতা নূরে আলম সিদ্দিকী কাশ্মীর যাওয়ার আগে আমাকে বলেছিলেন, 'সাবধানে থেকো। তুমি তো সাংবাদিক। সবকিছুতে তোমার একটা অনুসন্ধানী মন থাকবে এটাই স্বাভাবিক। সেই অনুসন্ধানী মনটা একটু দমিয়ে রেখো। বিপদ আসতে তো আর সময় লাগে না।' সাংবাদিক লায়েকুজ্জামানকে যখন কাশ্মীরে যাওয়ার খবর জানালাম, তিনি বললেন, 'দেখো তুমি আবার জঙ্গি-টঙ্গি হয়ে যেও না।' শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী আমার ফেসবুক বন্ধু। একবার আমার এক স্ট্যাটাসে তিনি মন্তব্য করলেন, 'এত জায়গা থাকতে কাশ্মীরে গিয়েছেন; জঙ্গি প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন কিনা তাইবা কে জানে?' এই মন্তব্যগুলো উল্লেখ করে বোঝাতে চেয়েছি, কাশ্মীরকে আমরা কিভাবে দেখি। এ গ্রন্থখানি কাশ্মীরের এমন অস্বাভাবিক ও অপূর্ণ কাল্পনিক চিত্রের বিপরীতে একটি পরিপূর্ণ ও প্রত্যক্ষদর্শী চিত্র হাজির করবে বলে আমার বিশ্বাস।

কাশ্মীরের কথা; কাশ্মীরিদের কথা বলার দায়িত্ব আমি কেন কাঁধে তুলে নিলাম– এ প্রশ্ন প্রত্যাশিত। জবাবে বলছি, এর কারণ হলো দুটো। প্রথমত, দুই বছরে

কাশ্মীরের মানুষগুলোর উচ্ছ্বসিত ভালবাসা আমাকে দায়বদ্ধ করেছে এ কাজে। দ্বিতীয়ত, বাংলা ভাষার জ্ঞানভাণ্ডারে কাশ্মীরের অনুপস্থিতি আমাকে করেছে ব্যথিত ও অঙ্গীকারবদ্ধ। একটু খতিয়ে দেখা যাক, বাংলাদেশের সাহিত্যে কাশ্মীরের কথা কতটুকু আছে, কিভাবে আছে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বলাকা'য় বলেছেন কাশ্মীরের ঝিলাম নদীর দুর্দম গতীময়তার কথা। ১৯১৫ সালে তিনি গিয়েছিলেন কাশ্মীর। পশ্চিমবঙ্গের কিছু সাহিত্যে, উপন্যাসেও কাশ্মীরকে পাওয়া যায়। স্বাধীনতার আগে অবশ্য রাজনৈতিকভাবে কাশ্মীরের সমস্যা আমাদের নিজেদের সমস্যা বলেই মনে করা হতো। জনমতও ছিল তেমনই। কিন্তু, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের জনমানসে যৌক্তিক কারণেই ক্রমান্বয়ে কাশ্মীর অনুপস্থিত হয়ে পড়ে। কাশ্মীর কালক্রমে আন্তর্জাতিক রাজনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান আর ইতিহাসের পাঠ্যবইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। তাও হয় রাজনৈতিক বয়ানের বাইরে সামাজিক প্রেক্ষিতকে এড়িয়েই। সেখানে যৎসামান্য আছে, তাও উদার বা সর্বজনীন দৃষ্টিকোণ থেকে কাশ্মীরকে তুলে ধরতে পারেনি। খবরের কাগজের পাতায় মাঝে মধ্যেই ভারত-পাকিস্তানের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের আলোচনায় কাশ্মীর হাজির হয়। তাতেও সমস্যার ভিত্তিমূলে না গিয়ে কেবল দুই পক্ষের অবস্থানই তুলে ধরা হয়। তবে, ভ্রমণকাহিনী বা ভ্রমণোপন্যাস হিসেবে বুলবুল সরওয়ারের 'ঝিলাম নদীর দেশ'[১] শূন্যতা পূরণকারী। কাশ্মীরের কণ্ঠস্বরকে বাংলায় বলতে গেলে এককভাবেই তুলে ধরেছেন বুলবুল তার ঝিলামে। ১৯৮৭ সালে প্রথম প্রকাশিত ঝিলাম ইতোমধ্যে ৫১তম মুদ্রণ শেষ করেছে বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে।

সাহিত্যকর্ম হিসেবে 'ঝিলাম নদীর দেশ'কে পূর্ণ সফল বলতে দ্বিধা নেই। ইতিহাসের কোলে আশ্রয় নিয়ে লেখক সেখানে মানুষের প্রেম ও জীবনকে তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি তুলে ধরেছেন অপূর্ব প্রকৃতির ক্যানভাস। ভাষার মুন্সিয়ানায় সেই কাহিনী কখনো মধুর আবার কখনো বেদনাবিধুর হয়ে শিহরণ জাগাতে সক্ষম যেকোনও পাঠকের হৃদয়ে। উপন্যাস হিসেবে ঝিলাম তাই সার্থক। শুধু ঝিলাম নয়, কাশ্মীর ভ্রমণে তারই আরেক সংযোজন 'ঝিলামে যখন ছিলাম' (২০১৩)[২]। সেখানে অবশ্য নিজের পারিবারিক ভ্রমণের গল্পকেই সর্বজনীন করে তুলেছেন তিনি। তবে, দুই ক্ষেত্রেই, কাশ্মীরের মোগল আমল, তাদের শিল্প-সাহিত্য, জৌলুস আর হেরেমের অভ্যন্তরীণ বেদনাবিধুর রোমান্টিকতাকে উপস্থাপন করেছেন লেখক। হয়তো মোগলদের প্রতি তার ব্যক্তিগত দায়বোধ, বা বিনয় এর পেছনে কাজ করেছে। কিন্তু, কাশ্মীরের বর্তমান সাহিত্যে মোগল জৌলুস তো এক ঐতিহাসিক প্রতারণার ভিত্তি হিসেবেই পরিচিত! সম্রাট আকবরের কাশ্মীর দখলের ইতিহাস প্রকারান্তরে দিল্লি ও কাশ্মীরের আজকের সম্পর্কেরই রূপক উপস্থাপন। এ কারণেই, গবেষকের দায়বোধ থেকে বুলবুল সরওয়ারকে মূল্যায়ন করলে বলতে হয়, উপমার প্রয়োগ আর ইতিহাসের সরলীকরণের মাধ্যমে মূলত তিনি জটিল রাজনৈতিক সমীকরণকে এড়িয়ে গেছেন। পাঠকের মন ও দৃষ্টিকোণকে কাশ্মীরিদের জীবনের

বহুমুখী প্রেক্ষিত থেকে সরিয়ে ভাবাবেগের দিকে ধাবিত করেছেন। অবশ্য, ইতিহাস বলার দায় ঔপন্যাসিকের থাকে না। সত্যকথনের দায়িত্ব থেকে তিনি মুক্তি পেতেই পারেন। একজন মুসলিম হিসেবে ইতিহাসের সোনালী স্মৃতি, স্বজাতির কান্নার নোনাজল আমার মনকেও নোনতা করে তোলে। কিন্তু, সেই অবরুদ্ধ আবেগ আর কান্নার নোনা স্বাদের উর্ধ্বে উঠেই আমি এখানে তুলে ধরতে চেয়েছি সকল ধর্মীয় জাতিসত্তার সর্বজনীন প্রেক্ষিত। কেননা, বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনালোকের মিশ্রণ কবি বা শিল্পীর কারুকাজ বটে, তবে সেটি গবেষকের জন্য অপরাধ।

সাহিত্যের বিচারে এটি আসলে কী, তা বলার সাধ্য আমার নেই। কেউ হয়তো একে ভ্রমণ কাহিনী বলতে পারেন। কেউ বলবেন গবেষণা কর্ম। এটা গবেষণা কর্ম বটে, কিন্তু তা কেবল বর্ণনাধর্মী (Descriptive)। অনেকের কাছে বর্ণনাগুলো জার্নালিস্টিক মনে হতে পারে। তবে, তথ্য সংগ্রহে সম্ভাব্য সকল মতের মানুষের প্রতিনিধিত্ব (Quota Sampling) রাখার চেষ্টা করেছি। কোনো গভীর বিশ্লেষণ এখানে হাজির করিনি। সবকিছু ছাড়িয়ে এই বর্ণনায় কিছুটা এথনোগ্রাফিক উপকরণ এসেছে। আমি মিশেছি কাশ্মীরের মানুষের সঙ্গে। গ্রামে-শহরে ঘুরেছি অনুসন্ধানী মন নিয়ে। আর যেখানেই যে বই-পুস্তক-লেখনী পেয়েছি কাশ্মীর বিষয়ে তা পড়ার চেষ্টা করেছি গভীর আগ্রহে। কাশ্মীরকে নিয়ে লেখা গ্রন্থের সংখ্যা অগণিত। তার খুব সামান্যই আমি পড়তে পেরেছি। যা পড়েছি তার কিঞ্চিত প্রভাব হলেও এই লেখায় পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে লেখায় প্রাথমিক উৎস থেকে বিষয়গুলো মিলিয়ে নেওয়ার সুযোগ মেলেনি। সেকেন্ডারি উৎস থেকে তথ্য নিয়েছি। তবে, মানুষের সঙ্গে কথা বলা, নিজের চোখে দেখা স্মৃতিগুলোই এই গ্রন্থের মূল সংযোজন। কোনো সমাজের প্রাণপ্রকৃতি জানতে সমাজবিজ্ঞানীরা অনেক উপায় অবলম্বন হয়তো করেন। আমার কাছে জন্ম, মৃত্যু আর বিয়েশাদি এই তিন হলো মূল সূত্র। বিশ্বাস করি, এগুলো দেখেই একটি সমাজের মর্মমূল উপলব্ধি করা যায়। আমিও চেষ্টা করেছি তাই। এর মাধ্যমেই বুঝতে চেষ্টা করেছি কিভাবে কাশ্মীরিরা প্রকাশ ঘটায় তাদের ভালবাসার। কেমনইবা তাদের ঘৃণাগুলোর বহিঃপ্রকাশ। ভালবাসা আর ঘৃণা– এই তো মানুষের জীবন; শান্তি আর সংঘাত এছাড়া সমাজ বলতে আর কীইবা বাকি থাকে? রাজনীতি তো এ দুয়েরই স্ফুরণ। সুতরাং, এই বিষয়গুলোতে আমার জ্ঞান আর উপলব্ধি নিয়েই এই গ্রন্থ।

স্পষ্টতই, কাশ্মীরের প্রকৃতিকে ছাপিয়ে জীবন ও প্রাণ এই গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য হয়েছে। কেননা, আমার কাছে প্রকৃতির চেয়ে মানুষই বেশি মূল্যবান মনে হয়েছে। মানুষকে কেন্দ্র করেই তো স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন অপরূপ প্রকৃতি। মোগল কিংবা ব্রিটিশ, অথবা আধুনিক ভারত বনাম পাকিস্তান, কেউই প্রকৃতির প্রাণকেন্দ্রাসীন ওই মানুষগুলোর দিকে খুব একটা নজর দিতে সক্ষম হয়নি। মোগলাই প্রেম, সৃজনশীলতা আর আভিজাত্য কাশ্মীরকে যোগ করেছে একটি সমৃদ্ধ সভ্যতার সঙ্গে।

কিন্তু, তারা কি পেরেছিল কাশ্মীরিদের স্বকীয়তার মর্যাতা দিতে? পারস্য থেকে আসা মোগলরা সুচারুরূপে মিশে গিয়েছিল ভারতের মাটি ও মানুষের সঙ্গে। কিন্তু, কাশ্মীরিদের সঙ্গে সেই সখ্য তারা গড়তে পারেনি। বরং, কাশ্মীরে মোগলরা (১৫৮৬/৮৯-১৭৫১) দখলদারের ভূমিকায়ই অবতীর্ণ ছিল। আফগান পাঠানদের (১৭৫১-১৮১৯) নিষ্ঠুর নিষ্পেশন এখনও কাশ্মীরের রূপকথায় পাওয়া যায়। ইতিহাসে তো বটেই। শিখদের সামন্তবাদও (১৮১৯-১৯৪৬) মানবতাবাদের বাস্তবতা থেকে ছিল বিস্মৃত। ব্রিটিশরা তো অর্থের লোভে বিক্রিই করেছিল (১৯৪৬) কাশ্মীরের জমিন। সঙ্গে গোলাম বানিয়ে দিয়েছিল জনগণকেও। উপনিবেশিকতার পরের গল্প আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের। সেও আস্থা রেখেছে বলপ্রয়োগে আর দখলে। সীমান্ত, কাঁটাতার, টেরিটোরিই দুটি জমজ রাষ্ট্রের কাছে মুখ্য হয়ে রয়েছে প্রায় পৌনে শতাব্দীকাল ধরে। মানুষের কথা সেখানে কতটুকুইবা শোনা হয়েছে? যতসামান্যই। মোদ্দাকথা, সিংহভাগ সাহিত্য আর ইতিহাসে কাশ্মীরিদের স্থান হয়েছে 'অপূর্ব ফ্রেমের মধ্যে এক বিশ্রী ছবি' (An ugly picture in a magnificent frame)[৩] হিসেবে। সেই সীমাবদ্ধতা থেকেই আমার দায় কাশ্মীরিদের কাছে। ফ্রেম আর ছবির সামঞ্জস্যই এখানে আমার উপজীব্য। মানুষ আর প্রকৃতির মেলবন্ধনই এখানে আমার লক্ষ্য।

নোট/সূত্র

১. বুলবুল সরওয়ার; *ঝিলাম নদীর দেশ* (২০১৫); ৫১তম সংস্করণ; ঢাকা: অ্যাডর্ন
২. বুলবুল সরওয়ার; *ঝিলামে যখন ছিলাম* (২০১৬); ঢাকা: ঐতিহ্য
৩. Mridu Rai; *Hindu Rulers Muslim Subjects: Islam, Rights, and the History of Kashmir* (2014); New Delhi: Permanent Black. P3.

২

পর্বতের ভাঁজ, তার ওপারে উন্মুক্ত উপত্যকা

কলকাতার এক ভদ্রলোক কাশ্মীর পৌঁছে প্রশ্ন করেছিলেন, 'দাদা, হিমালয় কোথায়?' বলেছিলাম, 'আপনি দাঁড়িয়ে আছেন হিমালয়ে। চারদিকে দেখছেন, হিমালয়। হিমালয় তো আর একটা পর্বত নয়! এ হলো, পর্বতেরগুচ্ছ বা পর্বতরাজি (Series of mountains)।' পশ্চিমে আফগানিস্তান থেকে শুরু, পূর্বে গেছে মিয়ানমার পর্যন্ত। দক্ষিণের হাওয়ার বিরুদ্ধে এক দুর্ভেদ্য ঢাল রচনা করেছে যে, সে হিমালয়। ভারত মহাসাগর থেকে ওঠা মৌসুমী বায়ু উত্তরে যেতে যেতে যেখানে বাধা পায় সে হিমালয়। হিমালয়ের সে দুর্ভেদ্য সজ্জা অপূর্ব! ধাপে ধাপে উঁচুতে ওঠা। প্রথমে ছোটরা দাঁড়িয়ে; যাদের বলে পাহাড় (Smaller Himalayas)। তারপর মাঝারি (Middle Himalayas)। সবশেষে সুবিশাল-সুউচ্চ পর্বতসারি (Greater Himalayas)। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে হেঁটে হেঁটে উত্তরে যান। প্রথমে দেখা মিলবে ছোটদের। ক্রমান্বয়ে বড়রা সামনে পড়বে, উন্মুক্ত করবে তাদের উদার বক্ষ। সমুদ্রের পানিকণায় আর্দ্র বায়ুরা মেঘ হয়ে এগিয়ে যায় সামনে। ছোট পাহাড়েরা থামিয়ে দেয় তাদের গতি। তাই সমতল ভারতে আর বাঙাল এলাকায় বৃষ্টি হয়। সমতল বাংলায় তুমুল বৃষ্টিতে স্নান করে হেসে ওঠে ফুল, কদম্ব। বৃষ্টিস্নাত এই গোটা অঞ্চলের জলবায়ুকে বলে 'মৌসুমী জলবায়ু (Monsoon Climate)'। যেসব মেঘ ছোট পাহাড়ের মাথায় ঠেকে না তারা বাধা পায় মধ্য হিমালয়ে। আছড়ে পড়ে ছোট ছোট পাহাড়ের গায়ে। তাই, ভুটান, নেপাল, উত্তরাখণ্ডের দক্ষিণ দিকে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টি হয় জম্মুতেও একই কারণে। তাই, হিমালয় পাদদেশীয় পাহাড়গুলোও পায় মৌসুমী জলবায়ুর ছোঁয়া।

কাশ্মীরের অবস্থান মধ্য হিমালয়ে। তাই মৌসুমী জলবায়ু আর বৃষ্টিভেজা কদম ফুল নেই সেখানে। বৃষ্টি সেখানে হয় বটে, তবে সে অন্য কারণে। পশ্চিমের ভূ-মধ্যসাগর থেকে বয়ে আসা শীতল, পুবাল বাতাস সেখানে খানিকটা বৃষ্টি আনে। বেশিরভাগই মার্চ-এপ্রিল মাসে। তাই কাশ্মীরের জলবায়ুকে অনেকে বলেন খানিকটা ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু (Sub-Mediterranean Climate)। তবে, মূলত কাশ্মীরের নিজস্ব আবহাওয়া-জলবায়ু হলো, হিমালয়ান জলবায়ু। যার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, সে আনপ্রেডিক্টেবল। এই বৃষ্টি, এই মেঘ; আবার মিষ্টি রোদের হাসি; পরক্ষণেই মনে হবে, এ যে চামড়া জ্বালানো নিষ্ঠুর তাপদাহ।

মধ্য হিমালয় পর্বতগুচ্ছের ওপরে একটা সমতল উপত্যকার নাম কাশ্মীর। পাখির মতো আকাশ থেকে তাকিয়ে দেখলে (Birds eye view) একে মনে হয়, অনেকটা উল্টো পাঁচের মতো।

চারপাশে পর্বতের সারি, মধ্যে সমতল ভূমিতে মানুষের বসবাস। শুধু পশ্চিম দিকে পর্বতের বেষ্টনী উন্মুক্ত হয়ে চলে গেছে নদী আর সড়ক। যেন, উল্টো পাঁচের মতো জায়গাটার নিচে একটা লেজ লেগে মানুষের পাকস্থলীর আকার নিয়েছে। ওয়াল্টার আর. লরেঞ্জ'র বর্ণনায় কাশ্মীর হলো, 'কালো পর্বতমালার মধ্যে একখণ্ড জমিন সাদা পায়ের ছাপের মতো'[১]।
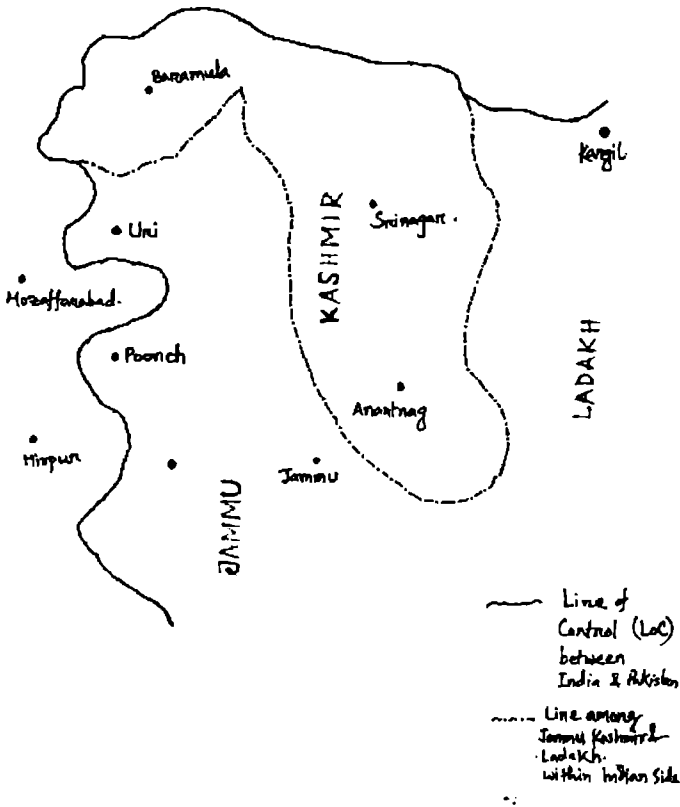
চিত্র ২.১: কাশ্মীর উপত্যকার মানচিত্র

খেচর হয়ে যখন আমরা দেখি কাশ্মীর, তখন সে নীরব, শুভ্র। তুলার বলের মতো আকাশে উড়ে চলা মেঘ, আর পর্বতের চূড়ায় জমাটবাঁধা বরফ একে অন্যের সঙ্গে এমনভাবে মিশে যায় যেন আলাদা করাই দায়। আকাশ থেকে মাটিতে নামলে, যতদূর চোখ যাবে, দেখা মিলবে ফার, পপলার অথবা দেওদার গাছের সারি। মাঝেমধ্যে দু-একটা চিনার গাছ। চারপাশে তুষারে ঢাকা ঝিকিমিকি পর্বত আর পাহাড়ি ঝরনার পানি জমা উপত্যকা– সব মিলে মনোমুগ্ধকর!

সমতল কাশ্মীরে দাঁড়িয়ে দেখবেন চারদিকেই পর্বত। কিন্তু, সেগুলো ততটা কাছে নয়। কাশ্মীরের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩৫ কিলোমিটার। বানিহাল থেকে বারামুলা। আর প্রস্থে হলো ৪২ কিলোমিটার। দুপুরের রোদে সমতলে দাঁড়িয়ে তাকান দূরের পর্বতের দিকে। সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে পর্ব থেকে পর্বান্তর। প্রথমে সবুজ সারিবদ্ধ গাছের জঙ্গল। তার পেছনে দৃষ্টির আড়ালে হয়তোবা বিশাল জলাশয়। তার পিছে, রোদের আলোয় কালচে হওয়া শ্যামল গাছের মাদুর জড়ানো ঊর্ধ্বমুখী পর্বতের ঢাল। আরও পেছনে খাঁড়া উঠে যাওয়া কালো-ল্যাংটা পর্বত। তার চূড়ায় তুষারের সাদা টুপি আলিঙ্গন করছে উড়ন্ত মেঘের সঙ্গে। ধাপে ধাপে আঁকা এই বিরাট ছবিটির ক্যানভাস হলো মস্তবড় নীল আকাশ। যেখানে আকাশের সঙ্গে পর্বতের চূড়ার মিলন হয়েছে সেটাই হলো পর্যটকের পরম আরাধ্য গন্তব্য। তাই তো, যে কেউ ছুটে চলেন চূড়ার পানে। আপনি জানতে চান, কাশ্মীরের কোথায় যাবেন বেড়াতে? আমি বলব, যেকোনও দিকে সমতল থেকে পর্বতের চূড়ার দিকে ধাবিত হন। সর্বত্র দেখবেন একই রূপ। শ্রীনগর হলো কেন্দ্র। কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই এগিয়ে যান। ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরিয়ে বলি। উত্তর-পূর্ব (উত্তর থেকে ডান) দিকে সোন্‌মার্গ হয়ে লাদাখ, তারপর কোলহাই পর্বতের চূড়া, দক্ষিণ-পূর্বে পেহেলগাম, আরও নিচে কোকরনাগ, ডাকসুম, সিনথেন টপ, ভেরি নাগ, আচ্ছাবাল হয়ে সর্ব দক্ষিণে বানিহালের জওহর টানেল। দক্ষিণ-পশ্চিমে অ্যাহারবাল, মানসারওয়ার লেক, পীর কি গলি, মোগল রোড। ক্রমে পশ্চিম দিক হয়ে উত্তরে উঠলে মিলবে ইউসমার্গ, চারার-ই-শরীফ, দুধপত্রি। উত্তর-পশ্চিমে এসে গুলমার্গ, উলার আর গুরেজ হয়ে মানসবাল লেক। ঘুরলেন? এবার থামুন। থিতু হন শ্রীনগরে। কাশ্মীরিরা যাকে উচ্চারণ করেন শিরিনগর। গ্রামীণ কাশ্মীরি ভাষায় বলে 'শহর'।

পাঁচ হাজার বছরের পুরনো ঐতিহ্যের শহর শ্রীনগর। তাকে দেখে নিতে পারেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। শহরের বুক চিরে বয়ে গেছে বিখ্যাত ঝিলাম নদী।[২] পাশেই রয়েছে সুবিশাল ডাল লেক। দক্ষিণ থেকে উত্তরে রয়েছে অগণন প্রত্ননিদর্শন। মোগলদের প্রকৃতি আর প্রকৌশলের মিশেলে গড়ে তোলা বাগান-বিলাস আর আসর-বাসরগুলো।

উপরের এই বর্ণনায় কাশ্মীরকে কেমন মনে হলো? গামলার মতো– যার চারপাশে পর্বতের দেয়াল, আর মধ্যখানে সমতল? ঠিক গামলার মতো নয়, কিছুটা বাথটাবের মতো, লম্বাটে। তবে, পর্বতে ঘেরা কাশ্মীরের মাঝের জমিন তেমন মসৃণ নয়। উঁচু-নিচু। আসলে, পর্বতের ঢাল সবসময় মসৃণ হয় না। তা হয় এবড়ো-খেবড়ো। বড় পর্বতের পাশে থাকে বাচ্চা পর্বত, তারপর আরও ছোট্ট টিলা। তারপর যখন সমতল শুরু হয় তারও বুকের ওপর থাকে ঢেউ খেলানো। কাশ্মীরও তাই। কাশ্মীরের জমিনটাও নদী ও নারীর মতো ঢেউ খেলানো। কোথাও আবার সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে উঁচু থেকে নেমে যাওয়া নিচে। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রলয়ঙ্কারী বন্যা

চিত্র ২.২: কাশ্মীরের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানের মানচিত্র
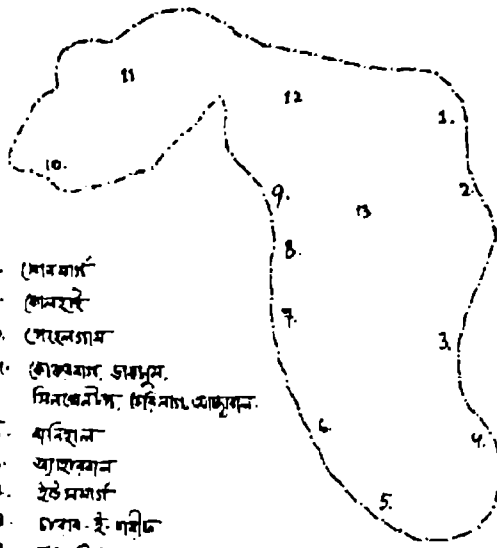
হয়েছিল কাশ্মীরে। গত এক শতাব্দীর মধ্যে ভয়ঙ্করতম বন্যা ছিল তা। তখন দেখেছি, চোখের সামনে শ্রীনগরের বাজার-ঘাট, মানুষের ঘর পানিতে তলিয়ে গেছে। রাস্তার ডান পাশে ডাল লেকের তীরে অবস্থিত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এনআইটি) পানিতে ডুবে গেল। হাজার হাজার এনআইটি পড়ুয়া শিক্ষার্থী ডুবে যাওয়া হোস্টেল ছেড়ে রাস্তার এপাশে এসে ভিড় করেছিল। অন্য

চিত্র ২.৩: ডাল লেক, শ্রীনগর, কাশ্মীর

পাশেই কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে আমরা ছিলাম নিরাপদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন খুলে দেওয়া হলো বন্যার্ত মানুষের আশ্রয়ের জন্য।

বলছিলাম পর্বতের সৌন্দর্যের কথা। কাশ্মীরের প্রকৃতির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হলো অপূর্ব লীলাময়ী পর্বতের মায়া। আর তার বুক থেকে সিঞ্চিত হয়ে কলকল রবে বয়ে চলা স্বচ্ছ পানির ঝরনাধারা; কোথাও স্রোতস্বীনী আর কোথাও মৃদু-মন্দ গতিতে সাপের মতো এঁকেবেঁকে যাওয়া সেই ঝরনা। পার্বত্য এলাকার সুন্দরের আরেক রহস্যের নাম 'উপত্যকা'; দুই পাহাড়ের খাঁজ। তার সামনে দাঁড়ালেই কেবল বোঝা যায়, কবি ও শিল্পীরা নারীকে কেন প্রকৃতির সঙ্গে মেলায় সবসময়। সে এক অদ্ভুত স্নিগ্ধতা। সে যেন সুখজাগানিয়া অসীম আলিঙ্গনের আমন্ত্রণ। সে বয়ে আনে দুই পাহাড়ের মধ্যখানে হারিয়ে যাওয়ার উচ্ছ্বাস। যেকোনো দিকে একটি পাহাড়ের চূড়ায় উঠুন। আপনার চোখজোড়া সমান্তরাল হয়ে উপরে উঠতে থাকবে; পক্ষান্তরে পাহাড়ের দেয়াল নামবে নিচে। অকস্মাৎ! আপনার দৃষ্টি পড়বে সামনের বিস্তীর্ণ উপত্যকায়। আপনার চোখে একটা প্যানারমিক ভিউ এসে হাজির হবে। আপনার যদি সুন্দর একটি হৃদয় থাকে তাহলে এই দৃশ্য দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি বলে

উঠবেন, ওয়াও!! খোদায় বিশ্বাস যার আছে তার মুখে জিকির উঠবে 'সুবহানাল্লাহ'!! এবার বিপরীত দিকের ঢাল বেয়ে নামুন উপত্যকায়। বিচরণ করুন। হয়তো দেখবেন সেখানেও আছে জীবন। মানুষের বসবাস আছে সেখানে। একটি সবুজ উপত্যকার মধ্য দিয়ে সুতীব্র বেগে বয়ে চলা ঝরনার বারিধারা মানুষকে যে কতটা উদ্বেলিত করে তা অনুভব করা যাবে কাশ্মীরে। স্পষ্টতই, বাংলাদেশিদের কাছে সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জন যেমন চেনা-জানা; কাশ্মীরিদের কাছে তেমনি হলো পার্বতী ঝরনাধারার রিমঝিম শব্দ, আঁকাবাঁকা ঢেউ। এই দুয়ের মধ্যে মিল হলো, উভয়ই জীবন্ত, সর্বদা সচল-চঞ্চল। মনে হবে এই উপত্যকার ওপারে বুঝি আবার নেমে যাওয়ার পথ। এখানেই হলো সুন্দরের শেষ। এগিয়ে যান। দেখবেন, রীতিমতো চমকে উঠবেন! ওপাশে গেলে আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠবে আরও সুন্দর, মনোহর প্রকৃতির দৃশ্যাবলী। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'সুখের আড়ালে' উপন্যাসের একটি উদ্ধৃতি এখানে বলতে হয়। তিনি লিখেছিলেন, 'একটা সূর্যডোবার যে রঙ তার সব সৌন্দর্য কি লেখায় আসে? লিখতে গিয়ে তাই বড্ড দুর্বল লাগে। দেখেছি, অনুভব করেছি, আনন্দিত হয়েছি। সেটা আর পাঁচজনকে বোঝাই কী করে? কেবল সুন্দর, মনোহর, অতীব চমকপ্রদ– এ আর কত লেখা যায়?'[৩] কাশ্মীরের সুন্দরের মাহাত্ম লিখে বোঝাতে না পারার অসহায়ত্বে হয়তো সব লেখকই ভুগেছেন। অনেকেই ওই সুন্দরের বর্ণনা করতে গিয়ে ভুলে গিয়েছেন সেই সব মানুষের কথা, যারা হাজার হাজার বছর ধরে ওই প্রকৃতির লালন পালন করেছেন, কিংবা এখনও করছেন। যারাই ওখানে গিয়েছেন, ওই প্রকৃতির প্রেমে পড়েছেন; দখল করতে চেয়েছেন। ভুলে গিয়েছেন, ওটা যে অন্যের সম্পদ। তারাই কাশ্মীরের নাম দিয়েছেন, 'ভূ-স্বর্গ'। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আকুল আকাঙ্ক্ষা ছিল কাশ্মীরের তৃণভূমিতে মৃত্যুবরণ করার। তিনি ফার্সি ভাষায় বলেছিলেন, 'আগার ফেরদৌস বে-রোহী যামীন আস্ত্, হামীন আস্ত্, হামীন আস্ত্, হামীন আস্ত্–যদি পৃথিবীতে কোনো বেহেশত থেকে থাকে তাহলে তা এখানে, এখানে, এখানে।'[৪]

যারা ওই মাটির সন্তান এই সুন্দরের প্রতি তাদের অনুভূতি কী– তা জানার জন্য চেষ্টা চালিয়েছি নিরন্তর। এমনই একটি ঘটনা বলি। যাচ্ছিলাম পেহেলগাম। হিমালয়ের গা বেয়ে নেমে আসা বরফ-ঠাণ্ডা পানি পাথরের ছোঁয়া লেগে ঘূর্ণি তুলে এগোয়। সেখানে জেগে ওঠে সাদা ফেনা। স্বচ্ছ পানির বুকে ঢেউ খায় আকাশের নীল। মন্ত্রমুগ্ধ করে দেয় মানুষের হৃদয়-মন। যতই সামনে যাই, শুনি আরও বাকি আছে দেখার। নিচে বহতা নদী, পাশে পর্বতের দেয়াল জুড়ে সবুজ গাছ, দূরে তুষারের মুকুট পরা শৃঙ্গ, আরও দূরে নীল আকাশ। অনিন্দ্য সুন্দরের এই সজ্জা দেখে আমি ছিলাম নির্বাক। আমার কাশ্মীরি বন্ধু জানতে চাইল, কেমন লাগছে পেহেলগাম? ওর দিকে তাকালাম। বললাম, সুন্দর! মনোহর!! 'বারিয়া আসল'!!! গর্বে ওর বুক ফুলে উঠল। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'কাশ্মীর হামারা হ্যায়'।[৫]

ওর দুই চোখের কোণ দিয়ে বেরিয়ে এলো দু'ফোঁটা জল। দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বলল, 'হাম কেয়া চাহতেহে?/আজাদি; হক হামারা/আজাদি; ছিন কে লেঙ্গে/আজাদি'। একদিন বন্ধুদের সামনে গাইছিলাম, 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি/সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি'। ইংরেজি তরজমা করে বুঝিয়ে দিলাম কাশ্মীরি সহপাঠীকে। বলল, 'মাতৃভূমির প্রতি সবার দাবি এমনই। আমার কাছেও কাশ্মীর তাই।'

এতক্ষণ বলা হলো প্রকৃতির কথা। একজন দর্শকের দৃষ্টিতে বর্ণিত হলো কাশ্মীর। দর্শক যখন দেখে কোনো কিছু তখন তার বর্ণনা দেয় ভাষায়। কিন্তু, গবেষক যখন দেখে তখন সে শুরু করে মাপ-জোক। দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা, জনসংখ্যা আর আয়তন না বললে; ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক বিন্যাস না বললে সাহিত্যের বর্ণনা চলে, গবেষণা চলে না। তাই এখানে তুলে ধরা যাক সেই সব কথা। আমি কাশ্মীরে ছিলাম—এমনটি জানার পর প্রায় সবসময়ই একটি প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি। কোনো কাশ্মীর– জম্মু না আজাদ? বাংলাদেশের মানুষের ধারণা, 'জম্মু' আর 'আজাদ' শব্দ দুটি কাশ্মীরের দুই উপমা। একটি কাশ্মীরের ভারত-শাসিত অংশের জন্য, অন্যটি পাকিস্তান-শাসিত অংশের জন্য প্রযোজ্য। আসলে বাংলাদেশিরা 'জম্মু' শব্দটিকে জিম্মির অপভ্রংশ মনে করেন। ফলে তাদের কাছে ভারত-শাসিত কাশ্মীর হলো 'জম্মু কাশ্মীর'। আসল ব্যাপার হলো, 'জম্মু' এবং 'কাশ্মীর' দুটি আলাদা অঞ্চল। জম্মু হলো হিমালয়ের পাদদেশে সমতল থেকে শুরু করে ছোট-ছোট পাহাড় অধ্যুষিত এলাকা। অন্যটি হিমালয়ের মধ্যে মাঝারি পর্বতসমূহ দিয়ে বেষ্টিত কাশ্মীর উপত্যকা। দুইটি অঞ্চলের মধ্যখানে অবস্থিত ওই মাঝারি পর্বতমালাকে বলা হয় পীরপাঞ্জাল। দুই অঞ্চলের রয়েছে ভৌগোলিক আর সাংস্কৃতিকভাবে ব্যাপক বৈপরীত্য। ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশদের কাছ থেকে অমৃৎসরে এক চুক্তির মাধ্যমে এই দুই এলাকাসহ লাদাখ, পুঞ্চ, গিলগিত ও বালতিস্তানের জমিদারি পান জম্মুর রাজা গুলাব সিং। তখন থেকেই গুলাব সিংয়ের গোটা জমিদারিকে একসঙ্গে কাগজে কলমে বলা ও লেখা শুরু হয় 'জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর' রাজ্য।

যদিও মহারাজার উত্থান হয়েছিল জম্মু থেকে। কিন্তু, প্রায় সবসময়ই রাজ্যটির সংক্ষিপ্ত নাম 'কাশ্মীর' হিসেবেই পরিচিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে এখনও 'কাশ্মীর সমস্যা' বলা হয়[৬] মূলত, 'জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর' রাজ্যকে কেন্দ্র করে বিদ্যমান সমস্যাকে বোঝাতেই। ১৯৪৭-এ দেশ ভাগের সময় এই রাজ্যের অধিকার দাবি করে ভারত ও পাকিস্তান উভয়ই। এ নিয়ে চলতে থাকে জটিল রাজনীতি।[৭] ওই ডামাডোলে জম্মুর কয়েকটি জেলা, কাশ্মীরের সামান্য অংশ, গিলগিত ও বালতিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নেয় পাকিস্তান। পাকিস্তানের অধীনের ওই অংশ থেকে পরে গিলগিত ও বালতিস্তানকে আলাদা করে 'নর্দার্ন এরিয়া'র সঙ্গে যুক্ত করা হয়, তাকে পাকিস্তানের অধীনে নেওয়া হয়। অবশিষ্ট অংশের নাম দেওয়া হয় 'আজাদ জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর' বা 'আজাদ কাশ্মীর'। পাকিস্তানের সংবিধানে ওই অংশের কোনো

উল্লেখ নেই। অর্থাৎ, রাজনৈতিকভাবে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে তাদের শাসনাধীন 'জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর' অংশকে বলা হয় 'আজাদ'। আবার তারা ভারত শাসনাধীন অংশকে বলে 'মকবুজা' বা পরাধীন। পাকিস্তানের অংশে 'জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর'-এর রয়েছে আলাদা প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যান্য ব্যবস্থা। তবে, পররাষ্ট্রনীতিসহ নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তারা ব্যাপকভাবে পাকিস্তাননির্ভর। মূলত, ওখানকার শাসন ব্যবস্থা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পাকিস্তানের কঠোর নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যেই পরিচালিত। এ কারণেই, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ওই এলাকাকে 'পাকিস্তান শাসিত কাশ্মীর' বলে চিহ্নিত করা হয়। পাশাপাশি, সেখানকার জনসাধারণের মধ্যে পাকিস্তানের প্রতি এক ধরনের সম্পর্কবোধ আছে। ফলে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে পাকিস্তান শাসিত কাশ্মীরের লোকদের কোনো 'সশস্ত্র বিরোধ' নেই। হয়তো ক্ষোভ আছে।

পক্ষান্তরে ভারতের পক্ষ থেকে তাদের নিজেদের শাসনাধীন অংশকে 'জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর' নামে একটি রাজ্য হিসেবে শাসন করা হয়। ভারতের সংবিধানে ওই রাজ্যের জন্য রয়েছে বিশেষ ধারা (নম্বর ৩৭০)। ভারত থেকে প্রকাশিত সকল মানচিত্রে মহারাজার অবিভক্ত 'জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর'কে ভারতের অংশ হিসেবে প্রকাশ করা হয়। সংবিধানের ওই ধারার অধীনে সম্পর্ণ জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরকেই ভারত নিজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে দাবি করে। এবং কাশ্মীরের যে অংশ পাকিস্তানের অধীনে আছে তাকে পাকিস্তান দখলকৃত (Occupide) বলে দাবি করা হয়। ভারত শাসিত এই 'জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর' রাজ্যের তিনটি প্রশাসনিক অঞ্চল আছে। জম্মু (আয়তন ২৬ শতাংশ), কাশ্মীর (১৬ শতাংশ) ও লাদাখ (৫৮ শতাংশ)। অর্থাৎ, লাদাখ বৃহত্তম এলাকা জুড়ে আছে। তবে, লাদাখে জনবসতি খুবই কম। আর রাজ্যের নামের সঙ্গেও লাদাখের নাম যুক্ত নেই। এই তিনটি অঞ্চলের মধ্যে কাশ্মীর উপত্যকায় রয়েছে জনঅসন্তোষ। উপত্যকার সিংহভাগ লোক ভারতের শাসন থেকে আলাদা হতে চায়। কাশ্মীরের জনসংখ্যা প্রায় ৬০ লাখ। পুরো জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের মোট জনসংখ্যা এক কোটি ২৫ লাখ। লাদাখ হলো হিমালয়ের সুউচ্চ পর্বতসারির মধ্যে অবস্থিত। ওই পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি আলাদা। তিব্বতিদের সঙ্গে মিল আছে তাদের। সেখানে দুটি জেলা। কারগিল ও লেহ। কারগিলের বাসিন্দারা শিয়া মুসলিম। লেহ-এ বৌদ্ধরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। পুরো প্রদেশের সিংহভাগ জমি লাদাখের অন্তর্ভুক্ত। জনসংখ্যা মাত্র ২.৩ শতাংশ। মহারাজার সময় থেকেই জনমানবহীন ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বহীন বলে প্রদেশের নামের সঙ্গে লাদাখের নামটি কখনোই সংযুক্ত হয়নি। এখন সেখানে শিক্ষার প্রসার ঘটছে। মানুষের সচেতনতা বাড়ছে। সেখানকার বৌদ্ধ সংগঠনগুলো লাদাখকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল (Union Territory) হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি করছেন। জম্মু হলো প্রদেশের শীতকালীন রাজধানী। গ্রীষ্মকালের রাজধানী হলো কাশ্মীর ভ্যালির শ্রীনগর শহর। জম্মু হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ। জম্মুতে এখন প্রায় ৬৫ শতাংশ হিন্দু, মুসলিম ৩১ শতাংশ। কাশ্মীরে প্রায় ৯৮ শতাংশ মুসলিম। ১৯৯১-৯২

সাল পর্যন্ত প্রায় ৫ শতাংশ হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলেন কাশ্মীরে। যারা হাজার হাজার বছরের কাশ্মীরি। কিন্তু, সশস্ত্র সংঘাত শুরুর পর একযোগে প্রায় সবাই কাশ্মীর ত্যাগ করেছিল।[৮] সামান্য কয়েকটি ব্রাহ্মণ পরিবার অবশ্য এখনও অবস্থান করছে সেখানে। তারাই এখনও টিকিয়ে রেখেছে কাশ্মীরের অসাম্প্রদায়িকতার ঐতিহ্য। শত সংঘাতের পরও ভিটে ছাড়েন নি তারা। তারা সেখানকার মুসলিম পরিবারগুলোর সঙ্গেই দুঃখে-সুখে কাটাচ্ছে জীবন-মরণ।

এখানেই শেষ নয়। মহারাজার আমল থেকেই অবিভক্ত 'জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর' রাজ্যের উত্তর দিকের সীমান্ত নিয়ে বিরোধ ছিল চীনের সঙ্গে। সেই বিরোধের জের ধরে চীনের নিয়ন্ত্রণেও রয়েছে 'অবিভক্ত রাজ্যের' কিছু অংশ। চীনের অধীনে থাকা

চিত্র ২.৪: মহারাজা গুলাব সিংয়ের জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর রাজ্য

ওই অংশ মূলত গিলগিত, বালতিস্তান ও লাদাখের। আর সেখানে জনবসতিও সামান্য। ফলে ওই বিরোধ তেমন একটা আলোচনায় আসে না। মূল কাশ্মীর উপত্যকার আলোচনায় ঘুরে ফিরে ভারত পাকিস্তানই সামনে আসে। মহারাজা শাসিত বৃহত্তর জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর রাজ্যের মোট ভূমি হলো ২ লাখ ২২ হাজার ২৩৬ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে এখন ভারতের নিয়ন্ত্রণে আছে প্রায় এক লাখ বর্গ কিলোমিটার, যা মোট এলাকার ৪৫ শতাংশ। পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে আছে ৭৮

হাজার বর্গ কিলোমিটার, যা প্রায় ৩৬ শতাংশ। আর চীনের অধীনে ছিল ৩৭ হাজার বর্গ কিলোমিটার, যা প্রায় ১৬ শতাংশ। পরে ১৯৬৪ সালে চীন-পাকিস্তানের মধ্যে সীমান্তসংক্রান্ত সমঝোতার প্রেক্ষিতে পাকিস্তান আরও ৫ হাজার ৮০০ বর্গ কিলোমিটার চীনের কাছে হস্তান্তর করে। সেটুকু যুক্ত করলে চীনের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা প্রায় ১৯ শতাংশ।

নোট/সূত্র

১. Walter R Lawrence; *The Valley of Kashmir* (1895); Srinagar: Gulshan Books. P1.

২. জাকারিয়া পলাশ; *ঝিলাম নদীর মূলে* (২০১৫), ntvbd.com

৩. শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়; *ত্রিনয়নী* (১৪০১ বাং), পৃষ্ঠা: ৭৮-৭৯

৪. Niyaz Ilahi; *Current News Servies* (2013), Srinagar.

৫. জাকারিয়া পলাশ; *কাশ্মীরের পেহেলগামে একদিন* (২০১৫); ntvbd.com

৬. Mridu Rai; *Hindu Rulers, Muslim Subjects* (2014); P36.

৭. বিস্তারিত পড়ুন ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায়ে

৮. বিস্তারিত পড়ুন ১১শ অধ্যায়ে

৯. আরও দেখুন জাকারিয়া পলাশ; 'কাশ্মীরঃ তুষার ঢাকা উপত্যকা'; মানবজমিন ঈদ সংখ্যা (২০১৪)।

৩

উপত্যকায় যেভাবে সভ্যতার বিকাশ

কিভাবে সৃষ্টি হলো রূপময় এই উপত্যকা? এখানে মানুষ বসতি গাড়ল কখন? কিভাবে? এই প্রশ্ন একেবারেই মৌলিক। এর উত্তরে অনেকেই আশ্রয় নেন রূপকথা আর মিথের। হিন্দু মিথোলজি অনুসারে 'কাশ্যাপ' নামের এক সাধু দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তরমুখী তীর্থযাত্রা করছিলেন। পথিমধ্যে তিনি জানতে পারলেন 'স্বতিস্বর' নামে বিশালাকার এক জলাশয়ের কথা। ওই জলাশয় ছিল ভূতের (Demon) দখলে। তখন সাধুর ইচ্ছায় দেবী 'সারিকা' মস্তবড় এক পক্ষীর আকারে সেখানে আবির্ভূত হন। পক্ষীদেবী তার চঞ্চুতে এক স্বর্গীয় বিরাট পাথর খণ্ড আনেন। এরপর তা ভূতগুলোর দিকে নিক্ষেপ করেন। ফলে ধ্বংস হয়ে যায় ভূতসকল। ওই পাথরটি নিজেই একটি পাহাড়ে পরিণত হয়ে যায়। ওই পাহাড়ের নাম হয় 'হরি পর্বত'[১]। কাশ্মীরি ভাষায় 'হর' মানে পাখি। এ থেকে 'হরি' শব্দের উৎপত্তি বলে ধারণা করা হয়[২]। পরে, কাশ্যাপ ঋষি ওই জলাশয়ের পশ্চিম দিকে একটি নালা কেটে পানি অপসারণ করেন বলে কথিত আছে।

কিন্তু, এ কি সম্ভব? ভ্যালি সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কী? এটা জানার জন্য চেষ্টা করেছি ভূ-তত্ত্ব ও ভূগোল নিয়ে খানিকটা অধ্যয়নের। আলাপ করেছি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে। অধ্যাপক এম শফি ভাটের মতে, একজন মানুষের পক্ষে এত বড় একটা লেকের পানি নালা কেটে সরিয়ে বাসোপযোগী করা অসম্ভব। মূলত কাশ্মীর উপত্যকা সৃষ্টির ভূ-তাত্ত্বিক গল্প হিমালয় পর্বতমালার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। বৈজ্ঞানিক ধারণা মতে, পৃথিবীর বয়স ৪.৬ বিলিয়ন বছর। আর ৩০ মিলিয়ন বছর আগে হিমালয় পর্বতমালা সৃষ্টি হয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠের বিকাশের অনেক অধ্যায় রয়েছে। যেমন, বরফ যুগ (আইস এইজ), প্রস্তর যুগ (স্টোন এইজ)। অধ্যাপক শফি বলেন, শেষ আইস এইজ সমাপ্ত হয়েছে এখন থেকে ১০ হাজার বছর আগে। সেই সময় একটি আবদ্ধ, পর্বত বেষ্টিত উপত্যকা বরফ গলা পানির মাধ্যমে জলাশয়ে পরিণত হয়। রাশিয়ান প্লেট ও ইন্ডিয়ান প্লেটের মধ্যে কোনো সংঘর্ষের ফলে এই উপত্যকা সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। পরে আবদ্ধ পানির হাইড্রোলিক প্রেসার, ভূ-তাত্ত্বিক কোনো বিবর্তন (আপহিলস) অথবা বড় কোনো ভূমিকম্পের ফলে ওই আবদ্ধ উপত্যকার পশ্চিম দিকটা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে আবদ্ধ পানি সরে গিয়ে বসবাস উপযোগী ভ্যালি সৃষ্টি হয়। ইতিহাসবিদদের ধারণা, এখানে মানববসতি শুরু হয় খ্রিষ্টপূর্ব

৩০০০ বছর আগে। অর্থাৎ, এখন থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে। সম্ভবত, নূহের (আ.) মহাপ্লাবনের[৩] কাছাকাছি সময়ে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, প্যালিওলিথিক, নিওলিথিক ও মেগালিথিক সকল যুগের প্রত্নর্নিদর্শনেরই সন্ধান মিলেছে কাশ্মীর ভূ-খণ্ডে। অর্থাৎ, খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ সাল থেকে জনবসতির ধারণা ভুল নয়[৪]।

কাশ্মীরের আদি বাসিন্দাদের তিনটি গ্রুপের পরিচয় ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন। যথাঃ নাগ (Naga), পিশাচ (Pisacha) ও ইয়াক্ষা (Yaksha)। এসব গোষ্ঠী লেক বা নালার পাশে বাস করত। কাশ্মীরের ভাষায় পানির পাহাড়ি নালাকে (Spring) বলা হয় 'নাগ'। আদি ওই গোষ্ঠীগুলো বন্যপশু ও সাপের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকত। বন্য জীবজন্তুকে তারা ভয়ও পেত, পূজাও করত। এরপর আর্যরা আসে সেখানে[৫]। আদি বাসিন্দাদের এই নামকরণের পেছনেও রয়েছে দারুণ গল্প। আর্যরা ভারতীয় উপমহাদেশে আসার পর স্থানীয় ওই বাসিন্দাদের মধ্যে একটি পক্ষ তাদের মেনে নেয়। তাদের নাম হয় 'হনুমান' এবং 'বানর-জাতি'। আর আরেক পক্ষ কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ওই সব হিংস্র প্রতিরোধের কারণে তাদের নাম হয় নাগ (সাপ) এবং পিশাচ (শয়তান)। যাইহোক, সমগ্র উত্তর পশ্চিম ভারতে আসন গাড়তে ওই নাগ ও পিশাচদের মোকাবিলা করে আর্যরা। তাতে সফল হওয়ার পরই আদি বাসিন্দারা হয়ে পড়ে নিচু আর আর্যরা প্রতিষ্ঠা পায় উঁচু (ব্রাহ্মণ) হিসেবে। এভাবেই হিন্দু সমাজে জাত-ব্যবস্থার শুরু হয় বলে অনেক ইতিহাসবিদ লিখেছেন[৬]। নচিকেতা গেয়েছেন, 'বিজয়ীরা বরাবর ভগবান এখানেতে/পরাজিতরাই পাপী এখানে; রাম যদি হেরে যেত/রামায়ণ লেখা হতো/রাবণ দেবতা হতো সেখানে।' এ শুধু রামায়ণের গল্পের ক্ষেত্রেই সত্য নয়। কাশ্মীরের ইতিহাসেও বিজয়ীরা বরাবর ভগবান বনে গেছেন। ইতিহাসের রচনাও ভগবানসমদের হাতেই হয়েছে। পরবর্তীতে আর্যদের বর্ণনামতে, কিছু কালের মধ্যেই আদি বাসিন্দাদের কেউ আর বেঁচে ছিল না। তাদের দাবি, যেসব নিম্নবর্ণের লোক সমাজে ছিল তারাও মূলত আর্যদেরই বিভিন্ন বর্ণ। আমার নেপালি বন্ধু বিষ্ণু পোখরেল এ বিষয়ে তার মতামত দিয়েছিল এভাবে, 'আর্য সমাজের রীতি অনুসারে কেউ নিজের বোনের সঙ্গে মিলনের মতো গুরুতর অপরাধ করে বসলে তাদের করা হতো একঘরে। তারাই পরে হয়ে পড়ত অচ্ছুত, নিম্নবর্ণ। এভাবে আর্যদের মধ্যেও অনেকে নিম্নবর্ণ হয়ে পড়ে।' ওইসব বর্ণনায় যদিও বলা হয়েছে নাগ ও পিশাচেরা ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু, অনেক ঐতিহাসিক বলেছেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ পরবর্তীতে ফের হয়েছে শাসক। অনেকেই ধারণা করেন, কাশ্মীরের ব্রাহ্মণরা (পণ্ডিত) ছাড়া অন্য মানুষেরা আসলে ওই আদি বাসিন্দাদেরই বংশধর।

এবার ফিরে আসি নামকরণের গল্পে। জায়গাটির নাম কেন হলো কাশ্মীর? এ নিয়েও নানাবিধ বর্ণনা পাওয়া গেছে। স্থানীয় ভাষায় কাশ্মীরকে বলা হয় 'কাশীর'। এর

মানে হলো, যেখানে 'কশুর' লোকেরা বাস করে। আর 'কশুর' অর্থ 'যারা মাংস খায়'। নামটির প্রথম অংশ 'কাশ'। ইতিহাসবিদ ফিদা এম হাসনাঈন আরও লিখেছেন, নূহের (আ.) আমলে মহাপ্লাবনের (খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০-২০০০-এর মধ্যে কোনো এক সময়) পর তার তিন সন্তান ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় বসতি বিস্তার করে। তাদের একজনের নাম ছিল হাম। 'হাম'-এর সন্তানের নাম ছিল 'কাশ', যার নামে একটি বিরাট উপজাতির বিস্তার হয়। এই 'কাশ' উপজাতির অবস্থান মেলে বিভিন্ন স্থানে। তারা বিভিন্ন নদী, পাহাড়, গ্রাম ও শহরের নামকরণ করে। বাগদাদ শহরের পাশের একটি গ্রামের নাম 'কাশ'। ইরাকের একটি নদীর নাম 'কাশানা'। ইরানের নিশাপুরের একটা গ্রাম 'কাশ-মার'; শহরের নাম 'কাশান', 'কাশাফ' ও 'কাশাই'। মধ্য এশিয়ায় মেরভ শহরের গ্রামের নাম 'কাশ-মোহরা'। বুখারার একটি গ্রামের নাম 'কাশ'। সমরখন্দে দুটি গ্রামের নাম 'কাশ-বান্দ' ও 'কাশ-আনিয়া'। চায়নিজ তুর্কিস্থানের (জিংজ্যাং) একটি জায়গা 'কাসগার'। আফগানিস্তানে এই উপজাতির লোকেরা গড়ে তোলে কাশকার, কাশহিল, কাশেক ও কশু গ্রাম। তারা আরও দক্ষিণে হিন্দু কুশ পর্বত পেরিয়ে এক এলাকায় বসতি গড়ে, যার নাম দেয় 'কাশ-মর'। ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর তার স্মৃতি থেকে এটি চিহ্নিত করেন যে, 'কাশ' উপজাতি থেকেই কাশীরের বাসিন্দাদের নামকরণ হয়েছে। এই লোকেরা প্রথমে কাশতাওয়ার (কিশতোয়ারঃ জম্মু অঞ্চলের একটি জেলা) এলাকায় বসতি গড়ে। পরে পীরপাঞ্জাল পর্বতমালা পেরিয়ে কাশ্মীরে বিস্তৃত হয়। এছাড়াও কাশ্মীর ভ্যালির পুলওয়ামা জেলার 'কুশতওয়ার' গ্রাম, অনন্তনাগ জেলার 'কাশনাগ' ঝরনা এবং আরও কিছু গ্রামের নাম ওই উপজাতির চিহ্ন বহন করে[৭]। মোদ্দাকথা, একটি বর্ণনা অনুসারে নূহ (আ.) নবীর বংশধর 'কাশ' উপজাতি থেকে নামকরণ করা হয়েছে কাশ্মীরের। এই হিসেবে, কাশ্মীরের বাসিন্দারা বনী-ঈসরাইলের (ঈহুদি) বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া কোনো উপজাতি বলেও ইতিহাসবিদরা ধারণা করেন। অনেক নৃবিজ্ঞাণী ও ঐতিহাসিক কাশ্মীরের মানুষের আচরণ, চেহারা, গায়ের রং এবং মুখের দাঁড়ি ইত্যাদি বিশ্লেষণ করেও দাবি করেন, কাশ্মীরিরা ইহুদিদের বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন উপজাতি। বনী ইসরাইলের ১২টি গোত্রের মধ্যে নানা সংঘাতের বর্ণনা মুসলিম ও হিব্রু ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায়। ওই সংঘাতের ফল হিসেবে তারা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ওইসব ইহুদি সিরিয়া ও ব্যাবিলনের দিকে যায়। কিন্তু, সেখানেও তারা হয় নিহত অথবা বন্দি হয়। পরে, ইন্দো-গ্রীক (আলেকজাণ্ডারের বিজয়ের পর) রাজাদের সময় বন্দি ইহুদিদের মধ্যে যারা শিল্পকর্মে দক্ষ ছিল তাদের স্থানান্তর করা হয় আফগানিস্তান, ব্যাকট্রিয়া, গিলগিত, চিত্রালসহ বিভিন্ন পাহাড়ি এলাকায়। এভাবে কোনো এক সময় তারা কাশ্মীরের আশেপাশে চলে আসে।[৮] সে হিসেবে ওইসব বিচ্ছিন্ন উপজাতির কাশ্মীরে আসার সময় হলো খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম থেকে দ্বিতীয় শতক।

কিন্তু, এটিই একমাত্র বর্ণনা নয়। হিন্দু রূপকথা অনুসারে কাশ্যাফ-ঋষি নিজ হাতে

জলাবদ্ধ জায়গার পানি সেঁচ করে একে বাসযোগ্য করেছেন। তাই এ উপত্যকার নাম কাশ্মীর। এর আগে ওই লেকের নাম ছিল 'স্বতিস্বর' বা 'স্বতিস্বরাস'। অপর এক মতে, আদি প্রাকৃত ভাষায় 'কাশ' মানে হলো নালা আর 'মীর' মানে হলো পর্বত। সেখান থেকেও নামকরণ হয়ে থাকতে পারে কাশ্মীর[৯]।

বোঝা গেল, আর্য সমাজ আর আদি বাসিন্দাদের মধ্যে নানা সংঘাতের মাধ্যমেই কাশ্মীরি সভ্যতার বিকাশ হয়েছে। এর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষের আনাগোনা ছিল অব্যাহত। এছাড়াও এশিয়ার পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত হাজার মাইল দীর্ঘ বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক 'সিল্করুটে'ও সংযুক্ত ছিল কাশ্মীর। ওই রুট ধরে চায়নিজ সিল্ক, রাশিয়ান গ্লাসওয়ার, ভারতীয় মসলা আর মধ্য এশিয়ার ঘোড়া-চামড়ার আমদানি-রপ্তানি হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে স্থানান্তরিত হয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন। অর্থাৎ, কাশ্মীর ছিল অনেক সভ্যতার মিলনস্থল। স্পষ্টতই, পারস্য, মধ্য এশিয়া, চীন ও ভারতীয় সভ্যতার মিলন হয়েছে সেখানে।[১০] এসবের মধ্যে ইরান আর মধ্য এশীয় সভ্যতার প্রতিফলন দেখা যায় সবচেয়ে বেশি। ঐতিহাসিকরা বলেন, প্রতিটি সভ্যতাই পর্বতবেষ্টিত কাশ্মীর উপত্যকার সীমানায় এসে থমকে গেছে। কেউ এসে এককভাবে একে দখল করতে পারেনি। শীতল ও নিরিবিলি হওয়ায় ধ্যান-জ্ঞান সাধনায় এলাকাটি ছিল উপযোগী। ফলে কাশ্মীর ছিল জ্ঞানের কেন্দ্র। ভারতীয় সভ্যতার অগণিত তথ্য ও উপাখ্যান লিখিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে কাশ্মীর থেকে। যুগান্তকারী সব জ্ঞানের বিকাশ হয়েছে। বৈদিক যুগের পাঞ্জাবের তক্ষশীলা বিদ্যাকেন্দ্র ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিল কাশ্মীরের জ্ঞান দ্বারা। বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ পানিনির ব্যাকরণের ব্যাখ্যা 'মহাভাষ্য' লিখেছিলেন যিনি তার নাম পাতাঞ্জলি। তিনি ছিলেন কাশ্মীরি। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকেই এমন অসংখ্য জ্ঞান সাধকের উপস্থিতি পাওয়া যায়। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ আয়ুরবেদের চরকসংহিতার রচনায় কাশ্মীরি পণ্ডিত দৃধাবালার ভূমিকা আছে বলে জানা যায়। সেটাও হয়েছিল বৈদিক যুগে। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের সেই সময় পাঞ্জাবের তক্ষশীলা ছিল জ্ঞানের কেন্দ্র। আর কাশ্মীরও ছিল বৃহত্তর উত্তর-পশ্চিম ভারতের অন্যান্য এলাকার মতো ওই কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। ধারণা করা হয় নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতা ভারতমুণীও ছিলেন কাশ্মীরি পণ্ডিত। দক্ষিণ ভারতে অদ্যাবধি জনপ্রিয় শেভিক, তান্ত্রিক ধর্মচর্চারও মূল উৎসস্থল হলো কাশ্মীর।[১১] সম্ভবত এসব কারণেই কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে এখনও পণ্ডিত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। প্রাগৈতিহাসিক এই ভিত্তি পেরিয়ে ঐতিহাসিকরা একমত হয়েছেন, লিখিত ইতিহাস সংরক্ষণেও কাশ্মীর অনবদ্য। খ্রিষ্টপূর্ব ১১৮৪ সাল থেকে পরবর্তী সময়ের কাশ্মীরের প্রায় সকল শাসকের বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়।[৯]

সেই হিসেবে কাশ্মীরের লিপিবদ্ধ ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিয়েছেন পারভেজ দেওয়ান। তিনি উল্লেখ করেছেন, মহাভারতের যুদ্ধের[১২] আগে রাজা

প্রথম গোনানডা ২০ বছর শাসন করেছেন। এর পর অজ্ঞাত সময় থেকে পাণ্ডু রাজবংশ শাসন করে খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক পর্যন্ত। সেখান থেকে খ্রিষ্টযুগের শুরু পর্যন্ত শাসন করে মৌর্য বা মৌরিয়ান (Mauryans) রাজবংশ। কুশান রাজবংশ ছিল ১৭৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। তারপর শুরু হয় গোনানডা (দ্বিতীয়) রাজবংশের শাসন। পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী ছিল তা। হোয়াইট হুন শাসকরা ছিলেন ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। পরের ৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিলেন কারকোটা রাজবংশের শাসকরা। বিচ্ছিন্ন কয়েকজন রাজা শাসন করেন কিছুকাল কাশ্মীরকে। তারা কোনো রাজবংশের প্রতিনিধি ছিলেন না। ১১০১ সাল থেকে শুরু হয় লোহারা রাজবংশের শাসন। দ্বিতীয় লোহারা রাজবংশের শাসন শেষ হয় ১৩৩৯ সালে। সেখান থেকে শুরু হয় সুলতান শাসনামল। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া শাহ মীর রাজবংশই মূলত সুলতান আমল। এরপর ধারাবাহিকভাবে মীর্জা হায়দার দৌলত কাসগরী (১৫৪১-১৫৫১), চাক রাজবংশ (১৫৬১-১৫৮৯), মোগল (১৫৮৯-১৭৫২), আফগান (১৭৫২-১৮১৯), শিখ (১৮১৯-১৮৪৬, পাঞ্জাব) ও ডোগরা (১৮৪৬-১৯৪৭) শাসনের অধীনে ছিল কাশ্মীর উপত্যকা। ১৯৪৭-এর পর থেকে শুরু হয় বর্তমানের জটিল এক জাতীয়তাবাদী আলো-আঁধারি খেলা।

প্রচলিতভাবে রাষ্ট্র বা শাসকদের দৃষ্টিকোণ থেকেই রচিত হয়ে আসছে ইতিহাস। উপরের তালিকাও তার ব্যতিক্রম নয়। বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে, ক্ষমতাকাঠামোর বাইরে সামাজিক জীবনের গতিধারা এবং জনগণের মতামত ইতিহাসে তেমন একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসের গবেষণা এখন বেশ জনপ্রিয়। কাশ্মীরিদের ধর্মীয় ও আঞ্চলিক পরিচিতি নিরূপণের লক্ষ্যে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্রলেখা জুৎসি (Chitralekha Zutshi) রচিত Language of Belongings গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। তিনি তুলে ধরেছেন, দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তর জনগণের সঙ্গে কাশ্মীরিদের 'ধর্মীয়' ও 'আঞ্চলিক' পরিচিতির স্বাতন্ত্র্য ও সামাঞ্জস্য। আর্থিক শ্রেণিভেদ গড়ার পেছনে শতবর্ষের ঔপনিবেশিক শাসনের ভূমিকা বর্ণনা করেছেন তিনি। আর, কাশ্মীরিদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি গঠনে ইসলামের ভূমিকা কতখানি তাও আলোচনা করেছেন। পরবর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায়ে সংক্ষেপে এটুকুই বলা প্রয়োজন যে, কাশ্মীরি জনগণের কাছে পর্বতবেষ্টিত হিমালয়ান ওই উপত্যকা আপন ভূমি। কারও কাছে মায়ের সমান। কাশ্মীরি ভাষায় 'মো'জ কাশীর'। কেউ বলে 'কাশ্মীর হামারা হ্যায়'। ভূ-প্রাকৃতিক আলোড়ন, মহাপ্লাবন কিংবা কাশ্বাপ ঋষির আধ্যাত্মিকতা বা ক্যারিশমার যেটাই হোক না কেন, ইতিহাসের কোনো এক সময় থেকে মানুষের বসবাস শুরু হয়েছিল সেখানে। কালক্রমে ওই বসতি হয়ে ওঠে সভ্যতার সংযোগস্থল। মানুষের আনাগোনা বাড়ে। চিন্তা, বিশ্বাস ও পণ্যের লেনদেন হয়। শাসন-শোষণের প্রশ্ন আসে। আপন-পরের বিভেদ সৃষ্টি হয়। গড়ে ওঠে জাতিসত্ত্বা, জাতীয়তাবাদ।

নোট/সূত্র

১. শ্রীনগর শহরের মধ্যে হরিপর্বত এখন একটি দর্শনীয় স্থান হিসেবে পরিচিত। মুসলমান বাসিন্দারা একে বলে 'কোহ্-এ-মারান'। ওই পর্বতে একটি আদি দুর্গ রয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে মকদুম শাহ (র.) নামে এক বুজুর্গের মাজার। অসংখ্য মানুষ সেখানে যায় কল্যাণের আশায়।

২. Parvez Dawan; *A History of Kashmir* (2008); New Delhi: Manas Publication. P11.

৩. নূহ ছিলেন প্রথম মানব আদমের দশম বংশধর। তিনি ছিলেন নবী (আ.)। তার আহ্বানে খুব কম সংখ্যক মানুষ খোদার পথের অনুসারি হয়েছিল। বিপথগামী মানুষদের ধ্বংসের জন্য আল্লাহ এক মহাপ্লাবন নাজিল করেন। তার আগে আল্লাহর নির্দেশে নূহ (আ.) নির্মাণ করেন এক বিশাল নৌকা। একটানা বৃষ্টি হয় চল্লিশ দিন। প্রায় দেড়শ দিন পানিতে ডুবে ছিল পৃথিবী। সকল প্রজাতির জীবজন্তু, পশু-পাখি এবং খোদাভীরু মানুষদের নিয়ে নৌকা ভিড়ে এক পর্বতের গায়ে (আরবি/কুরআন ও হিব্রু ধর্মগ্রন্থে প্রায় একই রকম বর্ণনা পাওয়া যায়)। হিন্দু পুরাণ ও মহাভারতেও তেমন এক বন্যার কথা পাওয়া যায়। তবে একটু ভিন্ন বর্ণনায়। তাতে বলা হয়েছে, তিন জগতের সবকিছু একটি মৃত্যুর মহাসমুদ্রে পরিণত হয়। ভয়ঙ্কর সেই তুফানের মধ্য থেকে একটি পাত্র ভেসে ওঠে ভগবানের কৃপায়। তাতে আশ্রয় নেয় সকল বীজ ও জোড়া প্রাণি। সাতজন পবিত্র মানুষও। অবতার বিষ্ণু সেখানে হাজির হন একটি মাছ হিসেবে। তিনিই ওই পাত্রকে নিরাপদে ভাসিয়ে নিয়ে যান।

৪. Parvez Dawan; *A History of Kashmir* (2008); New Delhi: Manas Publication. Pp: 13-14.

৫. Fida M Hassnain; *Buddhist Heritage of Kashmir*; Journal of Kashmir Studies (2011), Pp: 144-159.

৬. Sheikh Showkat Hossain; *Facts of Resurgent Kashmir* (2008); Kashmir Institute; Srinagar; Pp: 2-3.

৭. Fida M Hassnain; *Kashmiris With Jewish Roots*; Journal of Kashmir Studies (2007); Pp: 17-30.

৮. প্রাগুক্ত

৯. Parvez Dawan; *A History of Kashmir* (2008); New Delhi: Manas Publication. P13.

১০. Subhash Kak; *The Wonder That Was Kashmir*; www.ece.lsu.edu/kak/wonder.pdf

১১. প্রাগুক্ত

১২. ধারণা করা হয় তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার বছর অতীতে মহাভারতের যুদ্ধ হয়।

৪

দুই সহস্রাব্দ: ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও মুসলিম কাশ্মীর

সভ্যতার বিকাশের ইতিবৃত্ত আলোচিত হয়েছে আগের অধ্যায়ে। এখানে প্রথম শতক থেকে শুরু করে নিকট অতীতের ঐতিহাসিক ধারাবর্ণনা প্রয়োজন। প্রথম এক শতক কাশ্মীরে মূলত ব্রাহ্মণবাদ ও বৌদ্ধ শাসনের আসা-যাওয়ার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। কুশান, হুন, কারকোটা, লোহারা এসব রাজবংশ প্রায় ১৩ শতকের শেষ অবধি শাসন করে কাশ্মীরকে। এছাড়া মাঝে মধ্যে রাজবংশের বাইরেও কেউ কেউ শাসকের আসনে বসেছেন। এর প্রায় সবটা সময়ই ব্রাহ্মণবাদ (শিবপূজারি) বনাম বুদ্ধবাদের মধ্যে টানাপোড়েনের ইতিহাস বললে ভুল হবে না। কালহানের রাজতারাঙ্গিনীসহ অধিকাংশ ঐতিহাসিক দলিল বলছে, মৌর্য আমলের সম্রাট অশোকের সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম সবচেয়ে বেশি প্রসারিত হয়েছে কাশ্মীরে। কাশ্মীর থেকে বৌদ্ধধর্ম ক্রমান্বয়ে লাদাখ ও চীনেও প্রসারিত হয়েছে।

কাশ্মীরে বৌদ্ধ ধর্ম প্রথম প্রবেশ করে বানারাসের এক মঙ্কের মাধ্যমে। তার নাম মাঝান্তিকা। তিনি আনন্দবর্ধনের সাগরেদ ছিলেন। সম্রাট অশোকের আমলে তৃতীয় বৌদ্ধ সম্মেলনের শেষে ওই মঙ্ককে কাশ্মীর ও গ্যান্ধারা অঞ্চলে পাঠানো হয় ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। শুরুতে তিনি কাশ্মীরের আদিবাসীদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন। পরে তাদের অনেককে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করতে সক্ষম হন। সে হিসেবে কাশ্মীরে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার হয়েছে খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে। সম্রাট অশোকের রাজধানী ছিল পাটালিপুত্র। কাশ্মীর সেখান থেকে দূরে ছিল। তবুও সব ধরনের সুবিধাদি ছিল কাশ্মীরে। তখন শ্রীনাগারি ছিল স্থানীয় রাজধানী। ওই শহরটিই এখনকার কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর। কেউ কেউ বলেছেন, বৌদ্ধ প্রচারক মধ্যান্তিকা ওই সময়েই কাশ্মীরে জাফরান চাষ চালু করেন। বৌদ্ধধর্ম ও শিবইজম অশোকের সময় পাশাপাশিই বিকাশ লাভ করে। সম্রাট উভয়কে সমসুযোগ দেন। কালহান লিখেছেন, অশোক দুটি শিবমন্দির তৈরি করেছিলেন বিজয়েশ্বর এলাকায় (এখনকার বিজবিহারা, অনন্তনাগ)। তিনিই আবার মধ্যান্তিকাকে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সুযোগ করে দেন।

অশোকের পরের প্রজন্ম ছিল জালুকা ও দামাদর। সেই আমলে বিরাট সংখ্যক বৌদ্ধ বোদ্ধারা তর্কে হেরে গিয়েছিল জালুকার গুরু আভাদূতের কাছে। ফলে শিবধর্ম বা ব্রাহ্মণবাদের পুনর্জাগরণ ঘটে। তবে, জালুকা সেখানকার আদি বাসিন্দা নাগদের সমর্থন করতেন। তিনি বৌদ্ধধর্মকে তেমন পৃষ্ঠপোষকতা দেননি। যদিও জালুকাও

কিছু বিহার নির্মাণ করেছিলেন। তবে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকে নাগাসিনা নামের এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে রাজা মাহেন্দ্রর আলাপ হয় বৌদ্ধদের বিশ্বাস সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। ওই আলাপে রাজা মুগ্ধ হন। ফলে বৌদ্ধধর্ম আবার প্রভাব ফিরে পায়।

কালহানার রাজতারাঙ্গিনীতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ থেকেই শুরু হয় ইতিহাসের বর্ণনা। ১৩৭০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। ১২৬০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে রাজা প্রথম গোনানডার অভিষেক হয় কাশ্মীরের শাসক হিসেবে। তার অনেক পরের শাসক হলেন সুরেন্দ্র। তাকে বলা হয় কাশ্মীরের প্রথম বৌদ্ধ শাসক। তিনি কাশ্মীরের সৌরায় (শ্রীনগরের একটি এলাকা) প্রথম বৌদ্ধ স্থাপনা নির্মাণ করেন। সম্ভবত, ওই স্থাপনার নাম ছিল সৌরাসা। সেখান থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে ওই জায়গার নাম হয়েছে সৌরা। জায়গাটি এখনও ওই নামে পরিচিত। পরে খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে (৫১৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) গ্রিকরা পার্সিয়া থেকে এসে গ্যান্ধারা দখল করে। আলেক্সান্ডার ৩২৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ভারতে আসেন। ওই আমলে গ্রিকরা উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু এলাকা নিয়ন্ত্রণে নেয়। যার মধ্যে কাশ্মীরও ছিল। দিমিত্রিয়াস বিশাল এলাকার সম্রাট হন তখন। তারপর সিংহাসনে বসেন মেনেন্দার। ওই মেনেন্দারই নাগাসেনার কাছে ধর্মীয় তর্কে হেরেছিলেন। এই তর্ক কাশ্মীরের কাছাকাছি কোনো স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অর্থাৎ, খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের দিকে বৌদ্ধ ধর্ম ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে, যা পরের কয়েক শতক পর্যন্ত ছিল।

চিত্র ৪.১: প্যাগোডা আকৃতির মসজিদ ও খানকাহ, চারার-ই-শরীফ, বাডগাম, কাশ্মীর

কাশ্মীরের বৌদ্ধ ধর্মের স্বর্ণযুগ বলা হয় কুশান রাজবংশের আমলকে (প্রথম ও দ্বিতীয় খ্রিষ্ট শতকে)। তখন অগণিত বৌদ্ধ স্থাপনা নির্মিত হয়। কুশান শাসনামলের অন্যতম রাজা ছিলেন কানুশকা (খ্রিষ্টপূর্ব ৭৮)। ৬৩ খ্রিষ্টাব্দে কানুশকা কাশ্মীর সফর করেন তার শাসক সত্যসিংহের আমন্ত্রণে, যিনি ক্ষমতারোহণের পর বৌদ্ধ মক্ষ হয়েছিলেন। তখন পর্যন্ত কানুশকা গ্রিক, পারস্য ও সুমেরিও দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। সত্যসিংহের সঙ্গে আলাপকালে কানুশকা বেশ কিছু কথায় বিমোহিত হন। ফলে তিনি বুদ্ধের শিক্ষার দীক্ষা নেন। ওই সময় সেখানে চতুর্থ বৌদ্ধ সম্মেলন অনুষ্ঠিত

হয়। হিউয়েন সাঙয়ের বর্ণনায় উল্লিখিত হয়েছে, চতুর্থ বৌদ্ধ সম্মেলনটি কাশ্মীরের শ্রীনগরের কাছাকাছি বুর্জহামা এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, ওই সম্মেলনটি হয়েছিল মূলত বৌদ্ধ ধর্মের ভিন্নমতগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে। সেখানে বিশেষজ্ঞ, মঙ্ক ও ভিক্ষু মিলে প্রায় দেড় হাজার বৌদ্ধ অংশ নেয়। ভারত, মধ্য এশিয়া, চীন ও তিব্বত থেকে বিশিষ্ট বৌদ্ধ মঙ্করা সেখানে যোগ দেন। তারপর ওইসব এলাকা থেকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাশ্মীর আসা যাওয়া বাড়তে থাকে। দক্ষিণ ভারতীয় বিশিষ্ট বৌদ্ধ দার্শনিক নাগর্জুনা কাশ্মীরে ছিলেন কুশান আমলের শেষ দিকে। কালহানের বর্ণনা অনুসারে, ওই দার্শনিকের সঙ্গে ধর্মতর্কে কাশ্মীরি ব্রাহ্মণরা (শেভাইট) পরাজিত হয়েছিলেন। ফলে সে সময়ে উপত্যকার প্রায় সব লোকই বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে। এতে সেখানকার প্রচলিত ধর্মচর্চা বদলে যায়।
মজার ব্যাপার হলো, কাশ্মীরি ব্রাহ্মণরাও তাদের ধর্মরক্ষায় বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। কাশ্মীরি ব্রাহ্মণরা ধীরে ধীরে প্রচার করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, লর্ড বুদ্ধা মূলত লর্ড বিষ্ণুর একটি দ্বিতীয় রূপ। ফলে, বিষ্ণুমূর্তির পূজার আদলে নতুন বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিতরা বৌদ্ধমূর্তির পূজা শুরু করে। বিশেষত তার জন্মদিনে। কানুশকার পরে চন্দ্রদেবের আমলে পাতাঞ্জলি নামের অপর এক পণ্ডিত শিবাইট দর্শনের পুনর্জাগরণ ঘটায়। ফলে পুনরায় শিবধর্মের প্রভাব বিস্তার করে। অবশ্য পরের গুপ্ত বংশের শাসক প্রতাপাদিত্যের ধর্মীয় সংযোগ সম্পর্কে তেমন কিছু পাওয়া যায় না।

পরবর্তীকালে হান রাজবংশের আমলে বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক সংকট ও বিপদ মোকাবিলা করে। বিশেষ করে হান শাসক মিহিরাকুলার আমলকে হিউয়েন সাং ও কালহানা বৌদ্ধধর্মের বিপর্যয়ের আমল বলে উল্লেখ করেন। মিহিরাকুলাকে মহান বৌদ্ধ হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত করেন হিউয়েন সাং। মিহিরাকুলার মৃত্যুর পর কাশ্মীরের শাসক হন মেঘবান (৬ষ্ঠ শতক)। তিনি কাশ্মীরের পুরাতন রাজবংশের সন্তান ছিলেন। তিনি আবার কট্টর বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি ক্ষমতায় এসে সব ধরনের পশু হত্যা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। কানুশকার পরই তাকে বৌদ্ধধর্মে প্রীত কাশ্মীরি শাসক ধরা হয়। মেঘবানের স্ত্রী অমৃতপ্রভা ছিলেন বর্তমান আসাম এলাকার মেয়ে। ওই নারী বিদেশি মঙ্কদের জন্য একটি সুবিশাল বিহার স্থাপন করেন কাশ্মীরে। ওই সময়ের একাধিক রানীর নাম পাওয়া যায়, যারা কাশ্মীরে অসংখ্য বিহার নির্মাণ করেছিলেন। এমনকি তাদের কারও কারও নামের সঙ্গে কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থানের নামের মিল লক্ষ্য করেছেন ইতিহাসবিদেরা। পরবর্তীতে ৯৫০-৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে রাজা কিসমাগুপ্ত ক্ষমতায় এসে অনেক বিহার ধ্বংস করেন।
দ্বিতীয় যুধিষ্ঠীরের মন্ত্রীরা আবার বিহার নির্মাণকে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। পরে রাজা রানাদিত্যের স্ত্রী মেঘবানের স্ত্রীর বানানো বিহারের উপর বুদ্ধের মূর্তি স্থাপন করেন। বিক্রমাদিত্যের আমলেও বিহার নির্মাণ হয়। কারকোটা রাজবংশের রাজা দুর্লভবর্ধনও (৬০০-৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দ) বিহার নির্মাণ করেন।

বিভিন্ন সূত্রমতে, রানী ডিডো (৯৮০-১০০৩ খ্রিষ্টাব্দ), লোহারা (১১০১-১৩৩৯) রাজবংশের আমলে জয়াশোহা, রাজদেব, রাজা উচালা প্রমুখ শাসক বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। যদিও ১৫ শতকের পর বৌদ্ধ ধর্মকে কাশ্মীরের সক্রিয় ধর্ম হিসেবে আর দেখা যায়নি কিন্তু, এখনও উপত্যকার জনগণের সংস্কৃতিতে এর প্রভাব বিদ্যমান। কাশ্মীরি মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই এ নিদর্শন মেলে। কাশ্মীরি ব্রাহ্মণরা এখনও অষ্টমিবার্তা পালন করে। প্রতি চন্দ্র মাসের পূর্ণিমার অষ্টম দিনে এই অষ্টমিবার্তা পালিত হয়। এটি একটি বৌদ্ধচর্চা। এমনকি এখনও অষ্টমিকে বুদ্ধাষ্টমি বলা হয়। কাশ্মীরি মুসলিম বুজুর্গদের মধ্যে ঋষি ধারাও বৌদ্ধ সংঘদের থেকে আসা বলে অনেকে মত দেন। কারণ, ঋষিদের অনেকে বিয়ে না করে সারা জীবন ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। আর তরুণ ঋষি যারা হতেন তারা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মতো চাঁদা সংগ্রহ করতেন। বৌদ্ধ স্থাপনাগুলোর স্থাপত্যশৈলী এখনও কাশ্মীরের মানুষের গৃহনির্মাণ সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। যে কেউ এখন কাশ্মীরে গেলে দেখতে পাবে সেখানকার পুরনো মসজিদগুলোরও আকৃতি অনেকটা প্যাগোডার মতো।[১] যদিও গত ২০-৩০ বছরে যেসব নতুন মসজিদ নির্মাণ হচ্ছে তার মিনারের আকারে আরবীয় প্রভাব লক্ষণীয়।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, সম্রাট অশোকের সময় থেকেই বারবার বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণবাদের মধ্যে তর্ক হয়েছে, প্রতিযোগিতা হয়েছে, দ্বন্দ্বও হয়েছে। ক্রমান্বয়ে এই দুটি বিশ্বাসের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল শত্রুতা; সংঘাতও। শাসকদের মধ্যে ক্ষমতার পালাবদল হচ্ছিল। এরই মধ্যে বৈষম্যে ভুগছিল সর্বসাধারণ। এমনই এক পরিবেশে সেখানে প্রবেশ করে জনপ্রিয় হয়েছিল ইসলাম, একেবারে নতুন একটি বার্তা নিয়ে। কাশ্মীরি ইতিহাসবিদরা লিখেছেন, ১৩৩৯ সাল পর্যন্ত লোহারা রাজবংশের শাসন ছিল সেখানে। তারপর থেকে শুরু হয় মুসলিম সুলতানী শাসনামল। যেকোনো সমাজের নিজস্ব সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে ইতিহাসের কিছু কিছু ঘটনা বা সময় খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কাশ্মীরের চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকের ইসলামী শাসনামল তেমনি।[২] কারণ, 'ত্রয়োদশ শতকের দিকে কাশ্মীরি সমাজ ছিল বহুধাবিভক্ত। সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ওপর শোষণ ও বৈষম্যের খড়গ তখন ছিল নৈমিত্যিক ব্যাপার। ঠিক সেই সময়ই ইসলামের আগমনের কারণে নতুন এক অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল কাশ্মীরি সামাজ। বৌদ্ধধর্ম আর ব্রাহ্মণবাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্র হয়েছিল। ফলে দুশ্চরিত্র ও বিবেকবর্জিত ছিল রাজা, রানী আর কর্মকর্তারা। হিন্দুবাদ যে শান্তি ও অহিংসায় বিশ্বাস করত, তা প্রত্যাশিত শান্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছিল।[৩]

কাশ্মীরে ইসলামের আগমন কোনো রাজার শোষণ বা দখল করার মাধ্যমে হয়নি। বরং পীর ও ঋষিদের হাত ধরে ইসলাম এসেছিল ও বিকশিত হয়েছিল কাশ্মীরে। ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ব আর সাম্যের বার্তা ছিল তখনকার সামাজিক সমস্যার মোক্ষম জবাব। সেই প্রেক্ষিতেই ইসলাম জোরপূর্বক দখলের পথে না এসে ক্রমান্বয়ে ধর্মান্তরের মাধ্যমে ধীরে ধীরে জনসংখ্যার সংখ্যাধিক্য অর্জন করেছিল।[৩] তবে,

কাশ্মীরে ইসলামের ভিত্তি গড়ে তোলাটা চতুর্দশ শতকে হলেও মুসলমানদের আনাগোনা বহু পুরনো। অধ্যাপক ফিদা এম হাসনাইন লিখেছেন, '৬২৮ সালে ইসলামের মুহম্মদ (সা.) তার দূত পাঠাচ্ছিলেন বিভিন্ন সম্রাটের কাছে। ৬৩০ সালে তিনি এশিয়ার বিভিন্ন রাজার কাছে দূত পাঠান। আবু হুযাইফা ইয়ামানকে দিয়ে একটি পত্র পাঠানো হয়েছিল চীনে। ওই আরব দূত সিল্করুট হয়ে চীনের দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তীব্র তুষারপাতের কারণে কাশ্মীরে আটকা পড়েন। যেহেতু কাশ্মীর সিল্করুটের গুরুত্বপূর্ণ একটা স্থলবন্দর ছিল, সেহেতু খোটাং, মিরান হয়ে সিয়ান (সম্ভবত চীন) যাওয়ার পথে তিনি কাশ্মীরে থেমেছিলেন। আরব ওই দূতকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন কাশ্মীরি রাজা ভীনাদিত্য। এমনকি তিনি আবু হুযাইফা ইয়ামানকে 'জালকার' উপাধি দেন। পরের বছর নবী (সা.) দু'জন দূত পাঠান কাশ্মীরের রাজার কাছে। সঙ্গে দেন কিছু উপহার।[৪]
এই তথ্যটির মাধ্যমে ধারণা করা যায় যে, ইসলাম কাশ্মীরে আসে সপ্তম শতকেই। সরাসরি আরব থেকেই আসে। কিন্তু, এর মাধ্যমে প্রমাণ হয় না কাশ্মীরিরা তখনই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। বরং, পরের শতকে, ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে আরবরা সিন্ধ বিজয় করে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়। তারা সিন্ধ ও মুলতান থেকে কাশ্মীরে আসার চেষ্টা চালায়। ললিতাদিত্য মুক্তাপিদ তখন কাশ্মীরের শাসক। ললিতাদিত্য চীনা রাজার কাছে আবেদন করেছিলেন ওই আরবদের মোকাবিলায় সামরিক সাহায্যের জন্য। পরে, আরবদের সামরিক অভিযান অবসান হয়। এ তথ্যটিও প্রমাণ করে রাজনৈতিক বা সামরিক পথে কাশ্মীরে ইসলাম বা মুসলমানরা আসেনি। এবং সরাসরি আরবদের হাত ধরে ইসলাম কাশ্মীরে আসেনি।
কাশ্মীরি ইতিহাসবিদ আবদুল আহাদ লিখেছেন, ইসলাম আরব থেকেই কাশ্মীরে এসেছে তবে তা মধ্য এশিয়ার ভায়া হয়ে।[৫] মনজুর ফাজিলির[৩] বর্ণনামতে, দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার বহিঃআক্রমণগুলো ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। তবে, ললিতাদিত্যের উত্তরসূরিরা এমন সব চর্চা শুরু করেন যা হিন্দু শাসনকে দুর্বল করে। হিন্দু শাসনের দুর্বলতা কাশ্মীরের সমাজে সিন্ধ ও মুলতান থেকে আগত মুসলমানদের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ করে দেয়, যা তারা ললিতাদিত্যের সময়ে বা তার আগে পারেনি। তবে, ইসলাম কাশ্মীরিদের হিন্দু থেকে মুসলমান বানিয়ে দিল কিন্তু না কাশ্মীরের স্বাধীনতা বিনষ্ট করল আর না করল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থাবলীর পরিবর্তন। ইসলামের আগমনে সাংস্কৃতিক অবস্থায় সংস্কার সাধন হয়েছিল, তবে রাতারাতি বিপ্লব সাধন হয়নি।
ইতিহাস বলে, ললিতাদিত্য কাশ্মীরের শাসক ছিলেন ৬৯৭-৭৩৮ খ্রিষ্টযুগে। অর্থাৎ, ইসলাম কাশ্মীরে তার গভীর প্রভাব নিয়ে আসে অষ্টম শতকের পরে। ইতিহাস গবেষকদের মতে, হজরত বুলবুল শাহ কলান্দার (রহ.)-এর আগমন ছিল কাশ্মীরের ইতিহাসে একটা যুগান্তকারী ঘটনা। তার হাতেই বৌদ্ধ রাজা রিনচানা সপরিবারে মুসলমান হন। এটা ছিল একক ও নীরব পরিবর্তন। এর ফলে সর্বসাধারণও তাদের

শাসকের সঙ্গে সর্বোচ্চ শান্তিপূর্ণভাবে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যায়। রিনচানা কাশ্মীরের শাসক হন ১৩২০ সালে।[৪] মঙ্গলীয়দের আক্রমণে রাজা সুহাদেব তার সিংহাসন ছেড়ে পালিয়েছিলেন। মঙ্গল আক্রমণকারী জুলচো বিহার, মন্দির ও উপাসনালয়ে ঘিরে থাকা এবং বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংসাবশেষে পরিণত করেছিল[৬]। সেই জুলচো কাশ্মীর থেকে চলে যাওয়ার পর ধ্বংসস্তূপের ওপরই রিনচানা ক্ষমতাসীন হন। রিনচানা লাদাখের অভিজাত পরিবারের সদস্য। সুতরাং, তিনি চেয়েছিলেন সর্বাধিক লোকের সমর্থন। ফিদা হাসনাইন লিখেছেন, তিনি ছিলেন বিশ্বাসের দিক থেকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। কিন্তু, উপত্যকায় তাদের সংখ্যা সর্বোচ্চ ছিল না। অধিকাংশ কাশ্মীরি ছিল ব্রাহ্মণ তখন। ফলে, তিনি দেবস্বামী, ব্রাহ্মণ সমাজের প্রধানকে অনুরোধ করেছিলেন তাকে তাদের সম্প্রদায়ে গ্রহণ করতে। কিন্তু, তার আবেদন অগ্রাহ্য করা হলো। কারণ, হিন্দু বর্ণ ব্যবস্থায় কেউ উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণবাদ গ্রহণ করতে পারে না, যত যোগ্যতাই তার থাকুক না কেন। এটা জন্মগতভাবে পাওয়া যায় কেবল। ওই অবস্থায় তিনি পরিবারের সবাইকে নিয়ে ইসলামের দিকে ধাবিত হলেন ১৩৩৯ সালে। তার নাম হলো শামসুদ্দীন। তখন থেকেই নিরবচ্ছিন্নভাবে ইসলাম কাশ্মীরি সমাজ, সংস্কৃতিতে অবদান রেখে আসছে। শামসুদ্দীনের (রিনচান) পর নিরবচ্ছিন্নভাবে দুই শতক কাশ্মীর মুসলমানরা শাসন করে। তাদের মধ্যে অনেক শাসক ছিল জনদরদী, অনেকে আবার ছিল নিষ্ঠুর। অনেকে ছিল কাশ্মীরে জন্ম নেওয়া, অনেকে আবার ছিল বহিরাগত। কার্যত, মুসলিম শাসনামলও ছিল অস্বাভাবিক। শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর ছিল খুবই কম। দখল-প্রতিদখল নিয়মিতই ঘটেছে। মোগলরা কাশ্মীরে আসে ১৫৮৫ সালে। মোগল শাসনামলও ছিল মুসলমান শাসনামল। তারা মঙ্গোলিয়া থেকে মধ্য এশিয়া হয়ে ভারতে এসেছিল। মোগলদের আগের দুই শতকের মুসলিম শাসনামলে কাশ্মীর ব্যাপকভাবে মধ্য এশিয়ার সুফি ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থাও ব্যাপকভাবে মধ্য এশিয়া দ্বারা প্রভাবিত হয়। শামসুদ্দীনের পরের শাসক ছিলেন সুলতান শিহাবউদ্দীন (১৩৫৫-১৩৭৩)। ফার্সি বর্ণনা মতে, সুলতান শিহাবউদ্দীন আরও কিছু এলাকা কাশ্মীরের সঙ্গে যুক্ত করেন। তিনি পাহলি, সোয়াত এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিলেন। পরে তিনি সিন্ধের শাসককে পরাজিত করেছিলেন। তিনি কাবুল, কান্দাহার, বাদাখস্থান ও খোরাসান একের পর এক বিজয় করেন। তিনি অধীনে নেন গিলগিত, বালতিস্তান, লাদাখ, কিশতওয়ার ও জম্মু। রাজনৈতিক ও সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার শাসনামল মুসলিম শাসনের মধ্যে সবচেয়ে স্বর্ণোজ্জ্বল। পরের শাসক ছিলেন সুলতান সিকান্দার শাহ (১৩৯৩-১৪১৩)। তিনি সুফি সাইয়্যেদ আলী হামদানীর (রহ.) মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি কাশ্মীরি ব্রাহ্মণদের প্রতি ছিলেন নিষ্ঠুর। তিনি হিন্দুদের উপাস্য মূর্তিগুলো ভাঙচুর করেছিলেন। ওই সময়ে তৈমুর লঙ মধ্য এশিয়া থেকে তার সীমানা বিস্তার করছিলেন ভারতমুখে। সিকান্দার শাহ কাশ্মীরকে

তৈমুর লঙের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা করেছিলেন কূটনৈতিক পদক্ষেপের মাধ্যমে। তিনি তৈমুরের সঙ্গে সমঝোতা এবং মধ্য এশিয়ার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন। সুলতান জাইনুল আবেদীন বাদশাহ (১৪২০-১৪৫৯) ছিলেন কাশ্মীরের ইতিহাসে সকল মুসলিম শাসকের মধ্যে উদারতম। তিনি অলঙ্কার ও বয়ন শিল্পীদের সমরখন্দ, বুখারা, খোরাসান থেকে নিয়ে এসেছিলেন প্রশিক্ষক হিসেবে। পাথরের কাজ, কাচের ওপর নকশা, কাগজ তৈরি, সেলাই ও বুনন, এবং সোনার কারিগরি তখন থেকে শুরু হয় কাশ্মীরে। জাইনুল আবেদীনের পর তার ছেলে অমুসলিমদের সেভাবে মূল্যায়ন করেনি। কিন্তু, পরের সুলতান হাসান শাহ (১৪৭২-১৪৮৪), যিনি জাইনুল আবেদীনের নাতি, তিনি দাদার মতো উদার ও অসাম্প্রদায়িক মননে বিকশিত ছিলেন। পরে ছিলেন ফতেহ শাহ (১৪৮৭-১৪৯৯)। তারপর সোমাচন্দ্র, যিনি মীর শামসুদ্দিন ইরাকির অনুসারী হয়ে মন্দিরের পুরহিতদের বন্দি করেছিলেন। ১৫১৬ সালে সুলতান মোহাম্মদ শাহ বাইরে থেকে এসে ক্ষমতায় বসেন। সম্ভবত, তিনি মধ্য এশিয়া থেকেই এসেছিলেন। তিনি ছিলেন উদার ও ক্ষমাপ্রবণ। ১৫৪০ সালের মধ্যে চাক শাসনামল শেষ হয় হায়দার মির্জা কাসগরির হাতে। হায়দার মির্জাও ছিলেন অপর একজন মধ্য এশিয়ার যোদ্ধা।

তখন সুলতান নাযুক শাহ ছিল নামকাওয়াস্তে শাসক। হায়দার মির্জা ছিলেন সর্বেসর্বা। তিনি ছিলেন কট্টর হানাফি-সুন্নী অনুসারী। তিনি অন্য সকল সম্প্রদায়ের ওপর গণহত্যা চালিয়েছিলেন। অ-হানাফি মুসলমানদেরও ছাড় দেননি। এমনকি, তিনি শামসুদ্দীন ইরাকির কবর খুঁড়ে সেখানে একটা শৌচাগার নির্মাণ করেছিলেন। ১৫৫০ সালে এক কাশ্মীরি নাগরিক তাকে হত্যা করে। সেখান থেকে খানিকটা বিরতির পর সুলতান মো. গাজী শাহ চাক শাসক হন। তিনি কাশ্মীরে মোগল সৈন্যদেরও পরাজিত করেছিলেন। পরের জন ছিলেন পাদ শাহ গাজী হুসাইন শাহ চাক (১৫৬৫)। তিনি ছিলেন জনদরদী। আইনের শাসন, ন্যায়বিচার ও সুশাসন 'বিরাজ করেছিল' তার সময়ে। ইতিহাসে তাকে খসরু আদিল (ন্যায়পরায়ণ শাসক) বলা হয়। মজার ব্যাপার হলো, ইতিহাসবিদরা তাকে বর্ণনা করেছেন এভাবে, 'রাজা নতুন শ্যারাব পিলেন। নারীদের সঙ্গে বিনোদন করলেন এবং খেললেন'। তার পরেই মোহাম্মাদ আলী পাদ শাহ গাজী ক্ষমতায় এলেন। তিনি ১৫৭০ সালে জহির উদ্দীন উপাধি ধারণ করেছিলেন। শ্রীনগর শহরের জামে মসজিদে তার অভিষেক অনুষ্ঠান হয়েছিল। অভিজাত লোকেরা সেখানে গিয়েছিল। এটা ছিল একটা শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর, যা কাশ্মীরের ইতিহাসে খুবই কম ঘটেছে। তার অধীনে জনগণ সুখী ছিল। তিনি জোরপূর্বক শ্রমের ব্যবস্থা (বেগার বা Begar) ও নিষ্ঠুর শাস্তিগুলো বিলুপ্ত করেন। তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। ধর্মের বিষয়ে মাজহাব বা তরিকা নিয়েও তিনি ছিলেন নিরপেক্ষ। তিনি নিজে শিয়া মুসলিম ছিলেন। কিন্তু, সুন্নীদের শত্রুর চোখে দেখেননি।

মুসলিম শাসনামলে কাশ্মীরের ইতিহাসের পরিক্রমায় শুধু শেষ তিনজন শাসকের মধ্যে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছে। এর আগে প্রতিটি ক্ষেত্রেই সংঘাত আর রক্তপাত হয়েছে। সহযোগিতা, সমঝোতা ও উদারতার নিদর্শন দেখা গেছে অনেকের মধ্যে। আবার ধর্মীয় বা গোষ্ঠীগত কট্টরপন্থাও অনেকের মধ্যে ছিল। কাশ্মীরের মুসলিম ইতিহাস কৃষি, বাণিজ্য, শিক্ষা, ভাষা, সংস্কৃতি ও যোগাযোগের

চিত্র ৪.৩: ঝিলাম নদের মূল ভেরিনাগ। সেখানে মোগলদে

ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। কিন্তু, সেখানে ছিল সংঘাত, দখল-প্রতিদখল আর রক্তপাতের ঘনঘটা।

শেষ শাসক ছিলেন সুলতান মোহাম্মদ ইউসুফ শাহ গাজী (১৫৭৯)। তিনি ছিলেন বিজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষক। ধার্মিক ও বুজুর্গদের বড় আপন ছিলেন। তার বেশ কজন রানী ছিল। সর্বশেষ জনের নাম ছিল হাব্বা খাতুন। এই সুলতান মোগল সাম্রাট আকবরের হেরেমের সঙ্গেও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু আকবরের কাছেই প্রতারিত হয়েছিলেন তিনি। উদার মনের ওই শাসক হিন্দু প্রজাদের ওপর আরোপিত জিজিয়া মওকুফ করে দিয়েছিলেন। তিনি গরু জবাই ও গাছকাটা নিষিদ্ধ করেছিলেন। কাশ্মীরি ইতিহাসবিদরা তাকে সর্বশেষ স্বাধীন কাশ্মীরের শাসক হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[৭]
তার শাসনের সমাপ্তি এবং মোগলদের কাশ্মীর দখলের ঘটনাকে ঐতিহাসিক ফিদা এম হাসনাইন উল্লেখ করেছেন 'শঠতা' হিসেবে। কলামনিস্ট জাভেদ ইকবালের ভাষায় ছল-চাতুরি (Wile and guile)'। আকবর তখন দিল্লির সাম্রাট। কাশ্মীর দখলের পাঁয়তারা করছেন। অন্তত দুইবার তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। পরে ১৫৮৬ সালে ইউসুফ শাহ চাকের কাছে একটি সমঝোতার প্রস্তাব পাঠালেন। এজন্য তাকে আমন্ত্রণ জানালেন লাহোর। সেখানে আকবর তার প্রতিনিধি ভগবান দাসকে পাঠালেন। ইউসুফ শাহকে তার জনগণ বলেছিলেন আকবর বিশ্বস্ত লোক নন। তবুও তিনি গেলেন। তাকে আটক করা হলো। তাকে বিহার রাজ্যে নির্বাসনে[৮] পাঠানো হলো। তবে, কাশ্মীরের দখল তখনই শেষ হয়নি। ইউসুফ শাহের ছেলে ইয়াকুব শাহ দক্ষিণ দিকে কিশতোয়ার এলাকায় তার বাহিনীর বেইস স্থাপন করেন। আকবর বাহিনীকে প্রতিরোধ করেন। তিন বছর চলে এভাবে। অবশেষে পরাজিত হন ১৫৮৯ সালে।
কাশ্মীরি লেখক, বাশারাত পীর তার কারফিউড নাইট উপন্যাসে লিখেছেন–[৭]

> 'It is a tragic story.... Yusuf Shah's imprisonment and betrayal by Akbar has become a metaphor for the relationship between Delhi and Srinagar'.

পরবর্তী ১৫৮৯ সাল থেকে ১৭৫২ সাল পর্যন্ত কাশ্মীরকে শাসন করেছেন মোগলরা। কাশ্মীরের এখনকার পর্যটন কেন্দ্রগুলো সিংহভাগ গড়ে তোলা তাদের। ওই সময়ের ইতিহাস মোগল হেরেমের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এগিয়েছে। মোগলদের ক্ষমতার জোর যখন দুর্বল হতে থাকে তখন কাশ্মীর দখল করে আফগান পাঠানরা। ১৭৫২ সাল থেকে ১৮১৯ সাল পর্যন্ত কাশ্মীরে চলে পাঠান শাসনামল। আফগান শাসক আহমদ শাহ আবদালীসহ কাবুলের সুলতানরা কাশ্মীরে তাদের বিভিন্ন গভর্নর নিয়োগ করতেন। আবদুল্লাহ খান, নূরুদ্দীন বামজায়ী, বুলন্দ খান বামজায়ী, জান

মোহাম্মদ খান, খুররম খান, ফকির উল্লাহ খান, করিম দাদ খান, মিরদাদ খানসহ বেশ কিছু পাঠান শাসক সেখানে গভর্নর হিসেবে আসেন। কাশ্মীরে ৬৭ বছরের পাঠান শাসনামলকে বলা হয় চরম নিপীড়ন, নির্যাতনের সময়।
পরে ১৮১৯ সালে লাহোরের খালসা দরবারের রাজা রঞ্জিত সিং আফগানদের পরাজিত করে কাশ্মীরকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নেন। বীরবল ধর নামে এক কাশ্মীরিকে আফগানদের ওই পরাজয়ের পেছনে খলনায়ক হিসেবে মনে করেন অনেকে।[৯] শিখরা কাশ্মীর শাসন করেছে একজন গভর্নরের মাধ্যমে। ১৮৪৬ সালে ব্রিটিশরা পরাজিত করে শিখ শাসককে। পরে তারা কাশ্মীরকে বিক্রি করে জম্মুর হিন্দু জমিদার গুলাব সিংয়ের কাছে। গুলার সিংয়ের পরিবার জম্মু-কাশ্মীরকে শাসন করে পূর্ণ একশ' বছর। এই সময়কে কাশ্মীরের শ্রমিক-কৃষক শ্রেণির মানুষের জন্য ইতিহাসের সবচেয়ে নিষ্ঠুরতম অমানবিক শাসনামল হিসেবে কাশ্মীরি ইতিহাসবিদরা উল্লেখ করে থাকেন। এবং এই জনসংখ্যার সিংহভাগ ছিল মুসলিম। তবে, ডোগরা আমলকে কাশ্মীরের পণ্যের আন্তর্জাতিক খ্যাতির দিক বিবেচনায় ধরা হয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ই ইউরোপে কাশ্মীরি শালের ব্যাপক বাজার তৈরি হয়। কথিত আছে, নেপোলিয়ন বেনাপোর্টের গার্লফ্রেন্ড জোসেফাইন নিয়মিত কাশ্মীরি শাল গায়ে জড়িয়ে ফ্যাশন শোতে অংশ নিতেন।[৯]

নোট/সূত্র

১. কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ও লেখকের সহপাঠী শারমিন তামান্না ২০১৫ সালে তার শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে 'কাশ্মীরের বৌদ্ধধর্মের বিকাশ' বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করেন একটি নিবন্ধে। অপ্রকাশিত ওই নিবন্ধ থেকে এই অধ্যায়ের ওপরের তথ্যাবলী নেওয়া হয়েছে। শারমিন তামান্নার প্রতি লেখক কৃতজ্ঞ। লেখক নিজে 'কাশ্মীরে ইসলামের বিকাশ ও মধ্য এশিয়া' শীর্ষক বিষয়ে কাজ করেছেন একই শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে। ইংরেজিতে লেখা অপ্রকাশিত সেই নিবন্ধটি থেকে পরের তথ্যবলী সংযোজিত হয়েছে।
২. G M. Khawaja (Meem Hai Zaffar); *Editorial of The Journal of Kashmir Studies*, Volume III; 2009.
৩. Manzoor Fazili; *Key note address of The Journal of Kashmir Studies*, Volume III; 2009; P: 1-5.
৪. Fida M Hassnain; *The Impact of Muslim Rule on the Kashmiri Society;* Journal of Kashmir Studies (Vol: III), 2009, Pp: 6-36.
৫. Abdul Ahad; *Replenishing Kashmir's Civilizational Stocks;* Journal of Kashmir Studies, Vol: V, 2011; Pp: 12-18.

৬. G. N Gauhar; *Kashmir: Insurgency at Charar-e-Sharief* (2001); New Delhi: Mans Publications; P5.
৭. Greater Kashmir; Sep 21, 2015, P1.
৮. সেখানেই পরে মারা যান ইউসুফ শাহ চাক। বিহারের নালন্দা জেলায় তার কবর রয়েছে। জেঅ্যান্ডকে সরকার ইউসুফ শাহ চাকের দেহাবশেষ ফিরিয়ে নিতে বিহার সরকারের কাছে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু করেছিল ২০১৫ সালে। সে সময় গণমাধ্যমে এ বিষয়ে বিস্তারিত খবর প্রকাশিত হয়। শেখ আবদুল্লাহর নেতৃত্বে এর আগে তার কবরের ওপর একটি গম্বুজ নির্মাণ করা হয় (গ্রেটার কাশ্মীর, ২০১৫)।
৯. Zaved Iqbal; *Zaldagar 1865*; Greater Kashmir; May 2, 2015; P9.
১০. বিভিন্ন শাসক ও শাসনামলের নাম উচ্চারণের বৈচিত্র্যের কারণে ভিন্ন মনে হতে পারে। আবার, কাশ্মীরের ইতিহাসের ধারাবাহিকতার সবটুকু ভারতীয় ইতিহাসের সঙ্গে মেলে না। এর কারণ হলো, মাঝে মধ্যেই মধ্য এশিয়া থেকে অনেকে এসে কাশ্মীর শাসন করেছে। স্থানীয় শাসকরাও ছিলেন।

৫

অমৃৎসরে কেনাবেচা: আজন্ম বঞ্চিত এক হতভাগ্য জাতি

কাশ্মীরের দখলে মোগলদের কথা আগেই বলেছি। মোগল শাসনামলের পরে কাশ্মীরের দখল নেয় আফগানরা। তারপর শিখ (১৮১৯-১৮৪৬)। শিখদের মূল দরবার ছিল লাহোরে (খালাসা দরবার)। শিখ সাম্রাজ্যের রাজা ছিলেন রঞ্জিত সিং। ওই সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল অনেক প্রশাসনিক প্রভিন্স। এর মধ্যে জম্মু, লাদাখ, বালতিস্তান, গিলগিত ও কাশ্মীর আলাদা আলাদা অঞ্চল হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। কাশ্মীর সংকট আলোচনার জন্য এই অঞ্চলগুলো খুবই জরুরি। শিখ সাম্রাজ্যের অধীনে জম্মুর ডোগরা (হিন্দু বর্ণবিশেষ) জমিদার ছিল গুলাব সিং। তিনি ছিলেন লাহোর শিখ সাম্রাজ্যের প্রিন্স হিসেবে জম্মুর অধিকর্তা। পরে তিনি জম্মুর পাশাপাশি ইন্দাস (সিন্ধু) নদীর দুই পাড়ের লাদাখ ও বালতিস্তানকে তার অধীনে নেন। অর্থাৎ, লাদাখ ও বালতিস্তান হয়ে পড়ে গুলাব সিংয়ের জম্মু রাজ্যের অধীন। কাশ্মীর ছিল লাহোর রাষ্ট্রের আলাদা প্রদেশ। গিলগিত ছিল পাঞ্জাবি মুসলিম কমান্ডার সাঈয়েদ নথু শাহের অধীনে আলাদা।

শিখ রাজার সাম্রাজ্যের অধীনস্থ অবস্থায়ই ওই ডোগরা জমিদার তোষামোদি শুরু করে ব্রিটিশদের। ভারতের অধিকাংশ এলাকায় তখন ব্রিটিশ শাসন বিস্তৃত। উপনিবেশের সীমানায় পাঞ্জাবকে যোগ করার জন্য তারা তখন পেয়ে যায় এক বড় সুযোগ। অপেক্ষা করতে থাকে রঞ্জিত সিংয়ের মৃত্যুর। ১৮৩৯ সালে রঞ্জিত সিংয়ের মৃত্যুর পর দুর্বল হয়ে পড়ে শিখ সাম্রাজ্য। ১৮৪৫ সালের ১৩ ডিসেম্বর ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল হেনরি হার্ডিঞ্জ শিখদের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেন যুদ্ধ। শিখদের সাম্রাজ্যের অধীনস্থ হয়েও গুলাব সিং কোনো সাহায্যে এগিয়ে যাননি ওই যুদ্ধে। অবশেষে ১৮৪৫-৪৬ সালে প্রথম ব্রিটিশ-শিখ যুদ্ধে পরাজিত হয় শিখেরা।[১] ৯ মার্চ, ১৮৪৬ ব্রিটিশদের কাছে শিখ সাম্রাজ্যের পরাজয়ের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় লাহোরে। সে চুক্তি অনুসারে, সিজ-সাতলেজ টেরিটরিজ, বেইস-সাতলেজ ডোব, হাজারা ও কাশ্মীর এলাকা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হস্তগত হয়। এভাবে পাঞ্জাব, কাশ্মীরসহ উত্তর ভারতের গোটা শিখ সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণে আসে ব্রিটিশদের। তার এক সপ্তাহ পর (১৬ মার্চ, ১৮৪৬) গুলাব সিংয়ের পুরস্কারস্বরূপ অমৃৎসরে আরেকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তিতে ৭৫ লাখ রুপির বিনিময়ে গুলাব সিংকে কাশ্মীরসহ পাহাড়ি কয়েকটি জেলার সার্বভৌম মালিকানা দেয় ব্রিটিশরা।

চুক্তি অনুসারে,[২] ওখানকার মানুষগুলোও হয়েছিল কেনাবেচা। প্রথম ধারা

অনুসারে, ইন্দাস (সিন্ধু) নদীর পূর্বদিক এবং রাভি নদীর পশ্চিম দিকের জায়গা ব্রিটিশদের কাছ থেকে গুলাব সিংকে হস্তান্তর করা হয়েছিল। নবম ধারা অনুসারে, ব্রিটিশ সরকার যেকোনো বহিস্থ আক্রমণে সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয় মহারাজাকে। দশম ও শেষ ধারাটি সবচেয়ে মজার এবং গোলামির চিহ্নবাহী। তাতে বলা হয়, ব্রিটিশ সরকারের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেবেন মহারাজা। এর স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতিবছর একটা ঘোড়া, ১২টা ছাগল (৬টি মাদী এবং ৬টি মর্দা) এবং তিন জোড়া কাশ্মীরি শাল ব্রিটিশ সরকারকে প্রদান করবেন মহারাজা।

> Article 10: Maharajah Gulab Singh acknowledges the supremacy of the British Government and will in token of such supremacy present annually to the British Government one horse, twelve shawl goats of approved breed (six male and six female) and three pairs of Cashmere shawls.

হতভাগা কাশ্মীরিদের এই কেনাবেচাকে ১৯৪৭ সালে মহাত্মা গান্ধী 'ডিড অব সেল' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন[৩]। বিখ্যাত কবি আল্লামা ইকবালও কাশ্মীরকে উপমিত করেছিলেন 'বিক্রীত জাতি' হিসেবে।[৪] তার কবিতায় বলেন, 'হায়! ফসলের মাঠ, পানির ছড়া, উপত্যকার কৃষকদেরও ওরা বেচে দিল! বেচতে বাদ রাখেনি কিছুই'। এ নিয়ে হাফিজ জালান্দারি তার বিখ্যাত উর্দু কবিতার শিরোনাম দিয়েছিলেন '৭৫ লাখ কা সওদা'। সাংবাদিক আর এস গুল লিখেছেন, "ডাচদের কাছে নিউ ইয়র্ক সিটি বিক্রি হয়েছিল ১৬১৪ সালে ২৪ ডলারে। রাশিয়ানদের কাছ থেকে ১৮৬৭ সালে আমেরিকানরা কিনেছিল 'রাশিয়ান আমেরিকা' ৭.২ মিলিয়ন ডলারে। পরে তার নাম রেখেছিল আলাস্কা। কিন্তু, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ১৮৪৬ সালে কাশ্মীরকে বিক্রির ঘটনা কোনো জাতির বিক্রি হওয়ার সর্বাধিক আলোচিত বিষয়। ১৭০ বছর পরও ৭৫ লাখ রুপির এই ক্রয় চুক্তি, যা কাশ্মীর থেকে ৫০০ কিলোমিটারেরও বেশি দূরে অমৃতসরে স্বাক্ষরিত হয়েছিল, এখনও কাশ্মীরি জাতিসত্তার সমস্যার মূল হিসেবে সামনে আসছে।"[৫]

তবে, কেনাবেচার পর কাশ্মীরের মানুষ সহজেই গুলাব সিংয়ের মালিকানা মেনে নেয়নি। শিখ শাসকদের নিযুক্ত কাশ্মীরের গভর্নর ছিলেন শেখ গোলাম মহিউদ্দীন। তিনি তখন মৃত্যুশয্যায়। তার পুত্র শেখ ইমামুদ্দিন তখন গভর্নরের দায়িত্ব নেন। তিনি উপত্যকাকে ডোগরা রাজার কাছে হস্তান্তর করতে অস্বীকার করেন। ফলে সেখানে গভর্নর ও রাজার মধ্যে সংঘটিত হয় আরেক যুদ্ধ। পরাজিত হয় ডোগরা রাজা। তখন তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে ব্রিটিশ সৈন্য।[৬] সেখানে ব্রিটিশদের বিজয়ের পর গুলাব সিং কৃতদাসের (gold-boughten Slave) মতো, কাশ্মীরি ভাষায় যাকে বলে *'জার খরিদ গোলাম'*, কৃতজ্ঞতা জানান ব্রিটিশ

প্রভুদের।[৭] তারপরই মহারাজা তার বিনিয়োগ করা অর্থ আদায়ের জন্য চালু করেন ট্যাক্স। এমন কিছু বাকি ছিল না যার জন্য ট্যাক্স দিতে হয়নি। পরের এক শতাব্দীতে ডোগরা পরিবার বিনিয়োগের চেয়ে বহুগুণ বেশি সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়। ১৯ শতকের প্রতি বছরে কাশ্মীর থেকে গড়ে তাদের আদায় করা ট্যাক্সের পরিমাণ ছিল ২৫ লাখ রুপি। উদাহরণস্বরূপ, শুধু ১৮৬৮ সালে উপত্যকায় রেভিনিউ আদায় হয়েছিল ১৮ লাখ ৩৬ হাজার ৩১৮ রুপি।[৮]

তারপরের ইতিহাস আরও নির্মম। আরও ভাগ্যাহতকর। হিন্দু জমিদারের শোষণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, খোদ ব্রিটিশ কর্মকর্তা লর্ড কিম্বারলি ১৮৮৪ সালে তখনকার ভাইসরয়ের কাছে লিখেছিলেন, 'যদিও হিন্দু পরিবারকে রাজ্যের সার্বভৌমত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল, তবুও মহামেডান জনগণের পক্ষে ব্রিটিশ সরকারের হস্তক্ষেপ করতে ইতোমধ্যেই বেশি দেরি হয়ে গেছে'[৯]। কিন্তু, সেটি বাস্তবায়িত হয়নি। যদি ১৮৮৪ সালে কাশ্মীরকে ব্রিটিশরা কিম্বারলির ওই পরামর্শ অনুসারে নিজেদের দখলে ফের নিয়ে নিত তাহলে এর ভাগ্য হয়তো একটি গণভোটের মাধ্যমে অন্যরকমভাবে নির্ধারিত হতো। যেমনটা হয়েছে নর্থ-ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্সের ক্ষেত্রে।

যাই হোক, ব্রিটিশরা লাহোর বিজয়ের পর জম্মুর প্রিন্সকে (গুলাব সিং) স্বাধীনতা দেয়। পাশাপাশি কাশ্মীর দিয়ে দেয় পঁচাত্তর লাখ রুপির বিনিময়ে। কাশ্মীরের মতো আরেক আলাদা প্রশাসনিক অঞ্চল ছিল গিলগিত। এর শাসক ছিলেন পাঞ্জাবি-মুসলিম কমান্ডার সাঈয়্যেদ নথু শাহ। তিনি ব্রিটিশদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় কাশ্মীরে দখলের দৃশ্য দেখে গুলাব সিংয়ের অনুগত হন। সুতরাং, মহারাজা তখন জম্মু-কাশ্মীর-লাদাখ-গিলগিত-বালতিস্তান মিলে বিশাল সাম্রাজ্যের নিরাপদ 'মালিক' হয়ে যান। এর নাম দেন 'জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর'। এভাবেই ব্রিটিশদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় গুলাব সিংহের 'জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর' প্রদেশের অংশ হয় কাশ্মীর উপত্যকা।[১০]

কাশ্মীরি ইতিহাসবিদ ফিদা এম হাসনাইন লিখেছেন, ললিতাদিত্য (৬৯৭-৭৩৮ খ্রি) আর সুলতান শাহাবুদ্দিনের (১৩৫৫-১৩৭৩) সময় কাশ্মীর ছিল একটি বিজয়ী জাতি। গত ছয় শতকে সেই জাতি ক্রমে গোলামে পরিণত হয়েছে।[১১].

তবে, গিলগিতের নথু শাহ গুলাব সিংকে মেনে নিলেও গিলগিতবাসীরা মেনে নেয়নি। ১৮৫২ সালে গৌর আবদুর রহমানের নেতৃত্বে গিলগিতবাসী বিদ্রোহ করে। তারা মহারাজার 'জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর' থেকে স্বাধীন হয়ে যায়। ১৮৫৭ সালে গুলাব সিংয়ের পুত্র রণবীর সিং ফের গিলগিত 'জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের' অধীনে আনার উদ্যোগ নেন। আফগানিস্তানসহ মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের জন্য গিলগিতের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল খুবই বেশি। সুতরাং, স্বাধীনতার আট বছর পর ব্রিটিশদের আধুনিক অস্ত্রের সহায়তায় ফের ডোগরা রাজ্যের অধীন হয়ে পড়ে গিলগিতবাসী।[১২] এখান থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট, ঐতিহাসিকভাবে জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর এক ছিল না। অমৃতসর চুক্তির পর এক

মহারাজার অধীনে শাসিত হয়েছে একাধিক অঞ্চল। কিন্তু, সেখানে ঐক্যের কোনো লক্ষণ কখনই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কাশ্মীরিরা কখনও জম্মুকে নিজেদের ভাবতে পারেনি। জম্মুবাসীও কাশ্মীরিদের নয়। গিলগিতের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

যেভাবে উত্থান মহারাজার

গুলাব সিং শিখ রাজা রঞ্জিত সিংয়ের সৈন্য বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন একজন তুচ্ছ ঘোড়সওয়ারী হিসেবে। ১৮১০ সালে। কিছু দিনের মধ্যে গুলাব সিংয়ের বাবা কিশোর সিং, ভাই ধিয়ান ও সুচিত সিং লাহোর দরবারে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ১৮২০ সালে এই ডোগরা পরিবারটি জম্মু অঞ্চলকে তাদের একটি বিশেষ জায়গীর হিসেবে পেয়ে যায়। শিখ রাজার বিরুদ্ধে জম্মুতে বেশ কিছু ডোগরা বিদ্রোহীকে দমন করা ছিল এর পেছনে শর্ত। পাশাপাশি, কিশতোয়ারের (বর্তমানে জম্মু অঞ্চলের একটি জেলা) রাজা টেগ সিংকেও একটা উচিত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল। কারণ, টেগ সিং ভয়ঙ্কর আফগান রাজা শাহ সুজাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। ১৮২১ সালে গুলাব সিং কিশতোয়ার আক্রমণ করে সেখানকার রাজাকে আটক করে লাহোরে পাঠান। ১৮২২ সালে গুলাব সিং ত্রিকোটা পাহাড় এলাকায় বৈষ্ণু দেবীর মন্দিরের সামনে ডিডো নামে একজনকে হত্যা করেন, যিনি লাহোরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। ডিডোকে হত্যার খবরে রঞ্জিত সিং খুশি হয়ে লাহোর থেকে জম্মু চলে আসেন। তিনি গুলাব সিংয়ের কপালে বিজয় তিলক পরিয়ে দেন। এবং তাকে জম্মুর প্রিন্স ঘোষণা দেন। এভাবে গুলাব সিং হয়ে যান লাহোর রাজার কাছে আকাশচুম্বি প্রভাবশালী। এরপর সেই লাহোর দরবারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে তার দেরি হয়নি খুব বেশি। মাত্র দুই দশক পরই ব্রিটিশদের সঙ্গে ওই প্রিন্স গড়ে তোলেন সখ্য।[১৩]

মহারাজার জটিল রাজ্যের জটিল সীমানা

মহারাজা নেই। রাজ্য আছে এখনও। বিভক্ত তিন অংশ তিন দেশের দখলে। এখনও আছে সীমানা নিয়ে সেই পুরনো জটিলতা। মহারাজার রাজ্যের একপাশে ছিল রাশিয়ার জার সাম্রাজ্য, অন্যপাশে ব্রিটিশ ভারত, আরেক দিকে ছিল চীন। তার মধ্যে ব্রিটিশদের প্রতিরক্ষার প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রিন্সলি স্টেট হিসেবে শাসন করতেন মহারাজা। ব্রিটিশ ভারতের বিভাজনের পরও সেই জটিল হিসাব জটিলই রয়ে গেছে। শুধু খেলোয়াড় বদলে গেছে। এশিয়ার তিন পারমাণবিক সুপারপাওয়ার ভারত, পাকিস্তান ও চায়নার মিলনস্থল হিসেবে জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর আজও হয়ে আছে এক উত্তপ্ত রাজনৈতিক বাহাসের ইস্যু। এ অধ্যায়ের শুরুতে অমৃতসর চুক্তির বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। সেই চুক্তি অনুসারে ইন্দাস নদীর দুই পাশের এলাকা গুলাব সিংয়ের অধীনস্থ হয়েছিল। কিন্তু, ইন্দাস নদীর উত্তর ও পূর্বদিকের সীমানার

বিষয়টি তখনও নির্দিষ্ট ছিল না। এ কারণে চুক্তির দ্বিতীয় ধারায়[১৪] মহারাজাকে হস্তান্তরকৃত জমির পূর্বদিকের সীমানা পরবর্তী জরিপের পর নির্ধারিত হবে বলে উল্লিখিত ছিল। এছাড়া মহারাজার শাসিত পূর্বতন জম্মু স্টেটের (কাশ্মীর সংযুক্তির আগে) লাদাখ প্রদেশের সঙ্গে পূর্ব তুর্কিস্তান (বর্তমান জিংজ্যাং) এবং তিব্বতের সীমানাও ছিল অনির্ধারিত। উনবিংশ শতকের শেষার্ধে তিব্বত, পূর্ব ও পশ্চিম তুর্কিস্তানসহ চয়না ও রাশিয়ার নিয়ন্ত্রিত গোটা এলাকায় ছিল নানা যুদ্ধবিগ্রহ। এই অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে মহারাজার ছেলে রণবীর সিং ১৮৬৪ সালে ওই অমীমাংসিত সীমানার কারাকোরাম[১৫] পর্বত অতিক্রম করে শহিদুল্লাহ (জাইদুল্লাহ) নামক স্থানে একটি ঘাঁটি স্থাপন করেন। আর ব্রিটিশ সার্ভেয়ার ডব্লিউ এইচ জনসন সে অনুসারে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মানচিত্রে লাদাখের সীমানা কারাকোরাম পর্বতমালা ছাড়িয়ে সেখান থেকে ১০০ মাইল বেশি যোগ করে নেন। কিন্তু, কলকাতার ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এটা জানার পরই কড়াভাবে তিরস্কার করেন রণবীর সিং ও সার্ভেয়ারকে। চুক্তির চতুর্থ ধারা অনুসারে ব্রিটিশ রাজ্যের সীমান্ত বিস্তারের মতো সামরিক উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষমতা মহারাজার ছিল না। এরকম উদ্যোগ নিয়ে মহারাজা মূলত ফাউল খেলছেন এমনটাই ছিল কলকাতার[১৬] প্রতিক্রিয়া। সুতরাং, তারা ওই বর্ধিত মানচিত্র অনুমোদন না করে সেখানে দৃষ্টি রাখার জন্য একজন ব্রিটিশ এজেন্ট নিয়োগ করে। ফলে রণবীর সিংয়ের সামরিক জেটি তুলে নিতে হয়। মূলত ব্রিটিশ সরকার পাহাড়ি এই এলাকার জমি নিয়ে চাইনিজ প্রতিবেশীর সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়াতে আগ্রহী ছিল না। নীতিগতভাবে ব্রিটিশ সরকার ওই ম্যাপে অন্তর্ভুক্ত অবৈধ দখল অনুমোদন না দিলেও নতুন কোনো সার্ভেও করেনি। ফলে, পরবর্তী অনেক বছর ধরেই জনসন ম্যাপ ছিল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার প্রচলিত ম্যাপ। ১৮৮৫ সালে গুলাব সিংয়ের নাতি প্রতাপ সিং হন মহারাজা (রণবীর সিংয়ের পর)। তিনি ১৯৮৮ ও ১৮৯২ সালেও ওই বর্ধিত এলাকার সীমানায় ফের সৈন্য মোতায়েনের প্রস্তাব দেন ব্রিটিশ রাজ্যের কাছে। কিন্তু, একই যুক্তিতে তা প্রত্যাখ্যান করে ব্রিটিশ সরকার। ১৮৯৯ সালের ১৪ই মার্চ ব্রিটিশ ভারত সরকার চায়নিজ কর্তৃপক্ষের কাছে একটি প্রস্তাব পাঠায় কারাকোরাম এলাকার সীমান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য। এতে কিছু সমঝোতার প্রস্তাব দেওয়া হয়। এ প্রস্তাব অনুসারে, কারাকোরাম পর্বতমালাকে দুই সাম্রাজ্যের বিভাজক হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু, চায়নিজ সরকার এর কোনো জবাব দেয়নি তখন। ১৯১৩ সালে ব্রিটিশ, তিব্বতীয় এবং চায়নিজ কর্তৃপক্ষ এক সমঝোতায় বসে শিমলায়। সেই সমঝোতা অনুসারে 'অক্ষয় চীন' তিব্বতের মধ্যে রাখা হয়। ওই সমঝোতা বৈঠকে প্রণীত ম্যাপে চায়নিজ প্রতিনিধি স্বাক্ষর করলেও পরে সেটি পিকিংয়ে তার সরকার মেনে নেয়নি। সুতরাং, ওই সমঝোতা কার্যকর হয়নি। ফলে, ব্রিটিশ সরকার ১৮৯৯ সালে প্রস্তাবিত সীমানাই 'জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর' ও চীনের সীমানা হিসেবে সর্বশেষ অমীমাংসিত সীমানা। এরপর অবশিষ্ট সময়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সীমান্ত সমাধানের আর সুযোগ পায়নি। ফলে, মানচিত্রে সীমানা নির্ধারিত হয়নি। ওই এলাকাটি

আনডিফাইন্ড সীমানা হিসেবেই উল্লিখিত থেকে যায়। দেশ ভাগের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে যখন জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরও ভাগ হয় তখন, কারাকোরাম পর্বতমালা বরাবর ওই সীমানা অমীমাংসিতই রয়ে যায়। পাকিস্তান শাসিত অংশে হাঞ্জা এলাকা এবং ভারত শাসিত অংশে লেহ থেকে উত্তর-পূর্ব অঞ্চল নিয়ে চায়নিজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সেই বিবাদ অব্যাহত থেকে যায়। ১৯৬৩ সালের ৩ মার্চ পাকিস্তান ও চীন এক চুক্তির মাধ্যমে হাঞ্জা এলাকার সীমান্ত সমস্যার একটি আপাত সমাধান করে। তবে, সেখানে উল্লেখ করা হয়, কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হলে সীমান্ত সংক্রান্ত বিষয়ের পুনরালোচনা হবে। সে অনুসারে পাকিস্তান ৫৮০০ বর্গকিলোমিটারের মতো জমি চীনের কাছে হস্তান্তর করে। ওই জমি 'অক্ষয় চীন' হিসেবে পরিচিত। ওই অঞ্চল দিয়ে চীন ও পাকিস্তান একটি বাণিজ্যিক মহাসড়কও নির্মাণ করেছে। চায়না-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর হিসেবে এটি বেশ পরিচিত। অবশ্য, ভারতের অভিযোগ, পাকিস্তান জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের জমিন চীনকে অন্যায়ভাবে উপহার দিয়েছে। অন্যদিকে, ভারতের সঙ্গে চীনের সমস্যা এখনও রয়েছে অমীমাংসিত। আশিক হোসেন ভাট আরও উল্লেখ করেন, দেশ ভাগের পর ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার মহারাজার পূর্ণ 'জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর' রাজ্যকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে একটি মানচিত্র প্রকাশ করে। অক্ষয় চীনকেও ওই মানচিত্রে জেঅ্যান্ডকের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখ করা হয়। ইতোমধ্যে চায়নিজ কর্তৃপক্ষ সিংকিয়াঙ এবং তিব্বতকে সংযোগ করে ওই এলাকা দিয়ে একটি সড়ক নির্মাণ করেছে যা ভারত সরকার অবগত ছিল না। ১৯৫৭ সালে ভারত সরকার চায়নিজ কর্তৃপক্ষের প্রকাশিত একটি ম্যাগাজিনে প্রকাশিত ছবি থেকে বিষয়টি জানতে পারে। ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বরে জওহরলাল নেহরু ফের চিঠি লেখেন চায়নিজ প্রেসিডেন্টকে। তারও কোনো উত্তর আসেনি। মোদ্দাকথা, চীন ও জেঅ্যান্ডকে'র সীমান্ত রয়েছে এখনও অমীমাংসিত। লেহ জেলা ছাড়িয়ে কারাকোরাম বরাবর হিমালয়ান ওই রেঞ্জে কোনো জনবসতি নেই বলেই সেই অমীমাংসিত সীমান্ত তেমন আলোচনায় আসে না। কেবল কৌশলগত কারণে দুই দেশের কাছে রয়েছে এর গুরুত্ব। তবে, কাশ্মীর বিরোধের সমাধানের জন্যও চায়না কোনো পার্টি এখানে নয়। কারণ, চায়না কাশ্মীরের জমিন ও জনগণের মালিকানা দাবি করে না। ঐতিহাসিকভাবে সীমানা অনির্ধারিত থাকার কারণে সেখানে অস্পষ্টতা ও বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে মাত্র।

অবশ্য, এ নিয়ে চীন, ভারত ও পাকিস্তানের বক্তব্যের কোনো মিল নেই। কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলের অধ্যাপক এম শফী ভাট উল্লেখ করেন (৩১ জুলাই, ২০১৫), চায়নিজ ম্যাপ অনুসারে শুধু জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের বিরাট এলাকাই নয়, অরুণাচল প্রদেশ, সিকিম, হিমাচল প্রদেশ চায়নার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। চায়না দাবি করে এসব এলাকা ব্রিটিশ সরকার অবৈধভাবে ভারতের অধীনে দিয়েছে। অবশ্য, বর্তমানে সীমান্ত সংক্রান্ত এই বিষয়াবলী এড়িয়ে দুই দেশ অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক স্বার্থে কাজ করেছে। পাকিস্তানের মানচিত্রে সম্পূর্ণ জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরকে দেখানো

হয় তাদের অধীনে। আবার ভারতের মানচিত্রেও তাই। অধ্যাপক শফি ভাট এ বিষয়ে ভারতের কৌশলকে উল্লেখ করেন দ্বিমুখী হিসেবে। তিনি মনে করেন, এক্ষেত্রে পাকিস্তানের প্রতি ভারতের নীতি আগ্রাসী কিন্তু চীনের প্রতি ভারতের নীতি নমনীয়।

নোট/সূত্র

১. Prem Nath Bazaz; *History of Independent Movement of Kashmir* (1954); P121.
২. The Treaty of Amritsar; *The Kashmir Life*; March 17, 2013; http://www.kashmirlife.net/treaty-of-amritsar-25679/ (accessed on 10/05/2015); চুক্তির সবগুলো ধারা পরিশিষ্টে সংযোজিত।
৩. A. G Noorani; *The Kashmir Dispute (1947-2012)*; Volume1; New Delhi: Tulika Books; 2013; P5.
৪. Mridu Rai; *Hindu Rulers Muslim Subjects*; P19.
৫. R S Gull; *The Man who Purchased Kashmir*; Kashmir Life, June 29, 2015; http://www.kashmirlife.net/the-man-who-purchased-kashmir-issue-15-vol-07-81400/
৬. Walter R Lawrence; *The Valley of Kashmir* (1895), P201.
৭. Joseph Davey Cunningham (An East India Company official); *History of Sikhs* (1974); P16
৮. Ashik Hossain Bhat; *The Day Kashmir Was Sold*; Kashmir Life; March 17, 2013; http://www.kashmirlife.net/the-day-kashmir-was-sold-25669/ (Accessed 10/05/2015)
৯. A. G Noorani (2013); P5.
১০. Ashik Hossain Bhat; *The Day Kashmir Was Sold*; Kashmir Life; March 17, 2013.
১১. Fida M Hasnain; Journal of Kashmir Studies; 2009; 14.
১২. Ashik Hossain Bhat; *The Day Kashmir Was Sold;* Kashmir Life; March 17, 2013.
১৩. প্রাগুক্ত।

১৪. Ashik Hossain Bhat; *The Dragon Myths*; Kashmir Life; May 5, 2013;

http://www.kashmirlife.net/the-dragon-myths-30008/ (Accessed in 10/05/2015).

১৫. কারাকোরাম হিমালয়ের একটি বৃহৎ পর্বতমালা। গিলগিত, বালতিস্তান, লাদাখসহ জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের গোটা উত্তরাঞ্চল মূলত কারাকোরাম পর্বতমালা পেরিয়ে যেতে হয়। ১৯৪৭ সালের পর কারাকোরাম অঞ্চলের গিলগিত বালতিস্তান অংশ রয়েছে পাকিস্তানের অধীনে। আর লাদাখ রয়েছে ভারতের নিয়ন্ত্রণে। ভারত নিয়ন্ত্রিত লাদাখ এবং চীনের নিয়ন্ত্রণে থাকা অংশের মধ্যবর্তী এলাকায় রয়েছে সুবিস্তৃত কারাকোরাম পর্বতমালা।

১৬. তখন ব্রিটিশ সরকারের রাজধানী ছিল কলকাতায়।

চিত্র-৫.১: শিখ সাম্রাজ্যের সম্রাট রঞ্জিত সিং ও ডোগরা মহারাজা গুলাব সিং

৬

১৯৪৭: বিভাজনের দ্বিধা

ইমামুদ্দীনের নেতৃত্বে কাশ্মীরিরা মহারাজার বাহিনীকে প্রতিরোধ করেছিল ১৮৪৬ সালে। কয়েক মাস কাশ্মীর ছিল স্বাধীন। কিন্তু, ব্রিটিশ সৈন্যের সহায়তায় মহারাজার বাহিনী হয়েছিল সফল। এরপর নিষ্ঠুর শোষণের বিরুদ্ধে বারবার বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল রাজ্যের নাগরিকরা। দ্বিতীয় দফায় মহারাজার সৈন্যবাহিনী থেকে মুসলিম সৈন্যদের নিরস্ত্রীকরণের এবং জম্মুতে মুসলিম হত্যার ঘটনায় পুঞ্চ এলাকায় বিদ্রোহ শুরু হয়। তৃতীয় প্রতিরোধ হয় শাল (চাদর) শ্রমিকদের দ্বারা। অতিরিক্ত কর আরোপের প্রতিবাদে ১৮৬৫ সালে শাল তাঁতিদের সেই বিদ্রোহে ২৮ জনের মৃত্যু হয়। ১৯২৫ সালে রেশম চাষিরা বিদ্রোহ করেন। এসব বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ ছিল বিভিন্ন অঞ্চলে সীমিত। কিন্তু, এসব প্রতিরোধের চেতনা প্রজন্মান্তরে প্রবাহিত হয়, যা পরে দানা বাঁধে এক ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনে। ১৯৩১ সালে রাজ্যব্যাপী গণআন্দোলন শুরু হয়। প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল জম্মুতে মহারাজার এক জওয়ানের হাতে কুরআন পোড়নোর ঘটনা থেকে। পরে, সেটা ছড়িয়ে পড়ে শ্রীনগরে। জনতা শুরুতে দাবি করে ওই জওয়ানের বিচার। কিন্তু, পরে আবদুল কাদির নামে এক ব্যক্তি মহারাজার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। জনতা মুক্তি চায়। পুলিশের গুলি চলে। অনেকের প্রাণ যায়। শ্রীনগর জামে মসজিদে লাশ কাঁধে নিয়ে হয় গণমিছিল।[১]

লক্ষণীয়, আন্দোলনের এই পর্যন্ত চিত্র ছিল, হিন্দু কর্তৃত্ববাদী এক রাজার বিরুদ্ধে মুসলিম প্রজাদের বাঁচা-মরার লড়াই। ধর্মীয় স্বাধীনতার, খাওয়া পরার, নিরাপত্তার জন্য লড়াই। আর প্রজাদের এই ন্যায্য দাবির সঙ্গে সুর মিলিয়েছিল অন্যান্য সম্প্রদায়েরও অনেকে।[১] দ্বিতীয়ত, সেখানকার জনগণের আন্দোলন ছিল, নিজেদের নিপীড়ক শাসকের বিরুদ্ধে এক ন্যায্য শাসনের দাবিতে লড়াই। সেই শাসকও ছিলেন, রাজ্যের ভেতর থেকেই (জম্মু থেকে)। এখানে বহিরাগত ব্রিটিশরা ছিল কেবল সীমিত পরিসরেই দৃশ্যমান।

এমনি গণআন্দোলনের পাশাপাশি বদলে যায় বিশ্বব্যবস্থা। ব্রিটিশরা লেজ গোটায় উপমহাদেশ থেকে। বিভাজনের বাদ্য বাজে। প্রশ্ন আসে কোথায় যাবে জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষ? ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৪৭ অনুসারে ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ৫৬২টি প্রিন্সলি স্টেটকে (আংশিক স্বায়ত্তশাসিত) হয় ভারত অথবা পাকিস্তানে যোগ দিতে হবে। ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্যে থাকা প্রায়

সব স্টেট ভারতে যোগ দেয়। পাকিস্তানের মধ্যে থাকা বেশ কিছু প্রিন্স যোগ দেন পাকিস্তানে। তিনটি স্টেট স্বাধীন থাকার ইচ্ছা পোষণ করে। হায়দারাবাদ, জুনগর এবং জেঅ্যান্ডকে। ভারতের দক্ষিণের হায়দারাবাদ এবং পশ্চিমের জুনগরের প্রিন্স ছিলেন মুসলিম। প্রজাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল হিন্দুদের। উভয় এলাকায় হিন্দু জনগণ বিক্ষোভ করে ভারতে যুক্ত হওয়ার পক্ষে। ভারতীয় বাহিনী অ্যাকশনে যায়। ফলে উভয় প্রিন্সলি স্টেট ভারতের অংশ হয়। পরে, গণভোটের মাধ্যমে ভারতীয় অ্যাকশনের বৈধতা নিশ্চিত করা হয়।[২]

বিপরীতক্রমে, জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের প্রিন্স ছিলেন হিন্দু, জনগণ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। ভৌগোলিকভাবে এর অবস্থান পাকিস্তান ও ভারতের উত্তর সীমান্তে। ভারতীয় আইনবিদ এজি নূরানী লিখেছেন, 'গণভোট কাশ্মীরের কেবল একটি বিকল্প বা পছন্দের বিষয় নয়, এটা ছিল গণতান্ত্রিক প্রয়োজন। এটা ছিল নৈতিক দাবি। সকল মৌসুমে শ্রীনগরের সঙ্গে বাকি বিশ্বের যোগাযোগের একমাত্র রাস্তা ছিল পুরাতন রাওয়ালপিন্ডি রোড। এবং এখনও সেটি আছে (তবে অচল)। কাশ্মীরের নদীগুলো বয়ে চলে গেছে পাকিস্তানে। সকল ভৌগোলিক ব্যবস্থায় কাশ্মীর পাকিস্তানের সঙ্গে মেলে। গণতান্ত্রিক ফ্যাক্টরও তাই'।[৩] জুনগর ও হায়দারাবাদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে যার মাধ্যমে সে অঞ্চলগুলো 'ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে'। কিন্তু, কাশ্মীরের ক্ষেত্রে গণভোটের সুযোগ জনগণকে কখনোই দেওয়া হয়নি।[৩] ফলে, কাশ্মীরের ভাগ্য নির্ধারণের প্রশ্নটি জুগনর ও হায়দারাবাদের মতো হলো না।

চিত্র ৬.১: মহারাজা হরি সিং

ঘটনাপ্রবাহ

কাশ্মীরের হিন্দু শাসক মহারাজা হরি সিং শুরুতে স্বাধীন শাসক হিসেবে থাকার চেষ্টা করছিলেন।[৪] তিনি নেহরু এবং জিন্নাহর সঙ্গে দেনদরবারও করছিলেন। কাশ্মীরকে তার অধীনে পাওয়ার ব্যাপারে জিন্নাহ ছিলেন যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। কাশ্মীর তার পকেটে রাখা 'ব্ল্যাঙ্ক চেক' বলে তিনি ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু, নেহরুর উদ্বেগ ছিল সীমাহীন। এ কারণেই স্বাধীনতার আগে আগে কাশ্মীরের বিষয়ে জিন্নাহর চেয়ে

নেহরুকে বেশি তৎপর দেখা যায়। মহারাজার ওপর নেহরুর আস্থা ছিল কম। তিনি শেখ আবদুল্লাহর মুক্তি (যিনি ছিলেন মহারাজার কারাগারে বন্দি) চাচ্ছিলেন। নেহরু কাশ্মীরে যাওয়ার জন্য উদ্যোগ নিলেন। ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন নেহরুকে না পাঠিয়ে নিজেই গেলেন ১৮ই জুন। কিন্তু, মহারাজা মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করেননি। সুতরাং, ভাইসরয় ফিরে গেলেন। নেহরুর উদ্বেগ আরও বাড়ল। মাউন্টব্যাটেনের মিশনের সদস্য ক্যাম্পবেল জনসনের মন্তব্য ছিল, 'গান্ধী ও নেহরু উভয়ই উদ্বিগ্ন ছিলেন যে ফাঁকে মহারাজা আবার স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়ে না বসে'। নেহরু নিজে কাশ্মীর যেতে চাইলেন। এবার সরদার প্যাটেল বাধা দিলেন। তিনি চাইলেন গান্ধীজিকে পাঠাতে। স্বাধীনতার ১৩ দিন আগে গান্ধীজির সঙ্গে হরি সিংয়ের দেখা হলো।[৫] পাক-ভারত স্বাধীনতার ৩/৪ দিন আগে ১২ই আগস্ট কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রীর (হরি সিংয়ের নিযুক্ত) পক্ষ থেকে একটি টেলিগ্রামে উভয় দেশকে স্ট্যান্ডস্টিল চুক্তি স্বাক্ষরের অনুরোধ জানানো হয়।

এর মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হওয়ার আগে জম্মু-কাশ্মীর দুই দেশের কারও অধীনে যাচ্ছে না এমনটি প্রস্তাব করা হয়। পাকিস্তান এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। কিন্তু, ভারত করেনি।[৫] অর্থাৎ, একদিকে ভারতের সক্রিয় তৎপরতা চলছিল, পাকিস্তান কিছুটা নিশ্চিন্ত ছিল যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল হাতছাড়া হবে না। অন্যদিকে স্ট্যান্ডস্টিল চুক্তি স্বাক্ষর করার কারণে, পাকিস্তানের পক্ষে কাশ্মীরকে আক্রমণের সুযোগ থাকল না। যে চুক্তিটি স্বাক্ষর না করে ভারত একটি সুযোগ বাকি রেখে দিল। স্পষ্টতই, এই ঘটনা জিন্নাহকে সংশয়াপন্ন করে থাকবে।

এরই মধ্যে ১৪/১৫ আগস্ট দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরের সীমান্তবর্তী পাঞ্জাব জুড়ে চলছে সংঘাত। হিন্দু-শিখ-মুসলিম হত্যা-অরাজকতা। জম্মুর মুসলিম এলাকাগুলোও একইভাবে সাম্প্রদায়িক টার্গেটের শিকার হতে শুরু করেছে। যার কিছুটা বিবরণ এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এসব ঘটনার ধারাবাহিকতায়, ২২ অক্টোবর, ১৯৪৭ পাকিস্তানের নর্থ ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স থেকে পাঠানরা কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ নিতে আসে। অনেকেই ব্যাখ্যা করেন, যেহেতু পাকিস্তানের নিয়মিত সেনাবাহিনীর পক্ষে স্ট্যান্ডস্টিল চুক্তির কারণে সরাসরি কাশ্মীরে আক্রমণের সুযোগ ছিল না তাই তারা নন-স্টেট উপজাতীয় মুসলিম বাহিনীকে পাঠিয়েছে। পাকিস্তানের নিয়মিত সৈন্যবাহিনী তাদের 'সহযোগিতা' করে। তারই প্রতিক্রিয়ায় মহারাজা ভারতের সহায়তা চান। সেই সময়ে মহারাজার জনসমর্থন ছিল সামান্যই। রাজ্যের ব্যাপক জনপ্রিয় নেতা তখন শেখ মুহম্মদ আবদুল্লাহ। সুতরাং, ভারত তার সমর্থন চায়। শেখের সমর্থন নিয়েই মহারাজা ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার 'চুক্তি' করেন। 'তারপরই' ভারতীয় সৈন্যবাহিনী কাশ্মীরের 'পুনরুদ্ধারে' এগিয়ে যায়।[২] ১৯৪৭ সালের ২৬শে অক্টোবর মহারাজা ও

লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের স্বাক্ষরিত ইন্স্ট্রুমেন্ট অব একসেশন থেকে এখানে কয়েকটি লাইন উধৃত করা জরুরি।

> 'আমি শ্রীমান ইন্দ্র মাহেন্দ্র রাজরাজেশ্বর মহারাজাধীরাজ শ্রী হরি সিংজী, জম্মু-কাশ্মীর নরেশ তথা তিব্বত আদি দেশাধিপতি, Ruler of Jammu and Kashmir state do hereby execute this my Instrument of Accession and I hereby declare that I accede to the Dominion of India... Nothing in this instrument affects the continuance of my sovereignty in and over this state, or, save as provided by or under this instrument, the exercise of any powers, authority and rights now enjoyed by me as Ruler of this State or the validity of any law at present in force in the state.'[(6)]

অর্থাৎ, মহারাজা ভারতে যোগ দিয়েছেন শর্তসাপেক্ষে। অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব মহারাজা ভোগ করবেন এমনটিই কথা ছিল। ১৮৪৬ সালে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে অমৃতসর চুক্তির আওতায় জম্মু-কাশ্মীরকে 'কিনে' নেয়ার সময় তিনটি ক্ষেত্রে মহারাজা পরাধীন ছিলেন। যথা, প্রতিরক্ষা, বিদেশ নীতি ও যোগাযোগ। বাকি সকল অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে মহারাজার স্বায়ত্তশাসন (Residuary sovereignty) দেওয়া হয়েছিল। মূলত ওই তিনটি ক্ষেত্রের কর্তৃত্ব ব্রিটিশদের কাছ থেকে ভারতের কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে এর মাধ্যমে।

উল্লেখ্য, ১৮৪৬ সালেও মহারাজার এই মালিকানা মেনে নেয়নি জনগণ। ১৯৪৭-ও বলে একই কথা। ১৮৪৬ সালে মাইনুদ্দীনের নেতৃত্বে কিশতোয়ারে প্রতিরোধ মোকাবিলা করতে হয়েছিল মহারাজাকে। ১৯৪৭ সালে তেমন কাউকে মোকাবিলা করতে হয়নি ভারতীয় সৈন্যদের। কারণ, 'জননেতা' শেখ আবদুল্লাহর অলিখিত সমর্থন আদায় করতে সমর্থ হয়েছিলেন নেহরু। স্পষ্টতই কাশ্মীর ভ্যালিতে শেখ আবদুল্লাহ ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী জনপ্রিয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, এক জনপ্রিয় জননেতার সমর্থন পেয়েও কার্যত জনগণের মন জয় করতে পারেনি ভারত। গণঅনিচ্ছার কথা জওহরলাল নেহরুর অজানা ছিল না। তিনি চুক্তি স্বাক্ষরের আগের দিন ২৫শে অক্টোবর বলেছেন,

> 'The question of aiding Kashmir in this emergency is not designed in any way to influence the state to accede to India.'[(৬)]

এছাড়াও, ভারত সরকার আন্তর্জাতিক মহলকে আশ্বস্ত করেছে একাধিকবার যে, মহারাজার সঙ্গে করা ব্যবস্থা ক্ষণস্থায়ী। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে একটা মুক্ত গণভোটের পর। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে নেহরু গণভোটের প্রকাশ্য ওয়াদা করেছেন।

ইতোমধ্যে মুজাফফারাবাদ (বর্তমান আজাদ কাশ্মীর) থেকে শুরু করে বারামুলাসহ জম্মু-কাশ্মীরের অনেক এলাকা মহারাজার হাতছাড়া হয়ে যায়। নর্থ ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টিয়ারের পাঠান গ্রুপগুলো প্রায় শ্রীনগরের কাছাকাছি চলে আসে। যখন অসংখ্য বিশৃঙ্খল মানুষ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র, বল্লম-ইত্যাদি নিয়ে আক্রমণ শুরু করে তখন পুরো এলাকায় বিরাজ করে অরাজকতা। মুজাফফারাবাদসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ পালাতে থাকে। কেউ কেউ আক্রমণকারীদের সমর্থন নিয়ে অবস্থান করে। তাদের মূল টার্গেট ছিল মহারাজার সরকারের উজির-আমলাসহ বিভিন্ন কর্মচারি। মহারাজার নির্দেশ ছিল, লোকদের মুজাফফারাবাদ ছাড়তে না দেওয়া। মুজাফফারাবাদের উজির সেই চেষ্টাই করেছিলেন।[৭] কিন্তু, তিনিই নিহত হন নিজের বাংলোতে আক্রমণকারিদের গুলিতে। সরকারি বাংলো পুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। মহারাজা তখন শ্রীনগরে ছিলেন। তিনি ও তার স্ত্রী সেখান থেকে আত্মরক্ষার জন্য জম্মু চলে যান।[৮] একই সময়ে জম্মুর বেশ কয়েকটি জেলায় ব্যাপক হারে মুসলিম নাগরিক

চিত্র ৬.২: জম্মুতে অবস্থিত মহারাজার প্রাসাদের সামনে লেখক

হত্যা ও বিতাড়নের ঘটনা ঘটে।

স্পষ্টতই, মুজাফফারাবাদে মহারাজার প্রশাসনের অসহায়ত্ব বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। মহারাজা প্রতিরক্ষার বিষয়ে সচেতন ছিলেন না বলেই মনে হয়। কারণ, তার রাজ্যের প্রতিরক্ষা ও বিদেশনীতিতো তার অধীনে ছিলই না। এর প্রমাণ মেলে কৃষ্ণা মেহতার বর্ণনায়। তিনি লিখেছেন, মুজাফফারাবাদ সীমান্তবর্তী এলাকা হলেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল খুবই নাজুক। মহারাজা ছিলেন অযত্নবান এ বিষয়ে। এমনকি মুজাফফারাবাদের উজিরের বাসায় জরুরি সময়ে কোনো খবর দেওয়ার জন্য একটি টেলিফোনও ছিল না। ওই উজির দুনি চাঁদ মেহতার স্ত্রী কৃষ্ণা মেহতা[৯] তার স্মৃতিকথায় তুলে ধরেছেন একজন রিফিউজি হিসেবে ওপাশের মুসলিম পরিবারগুলোর কাছ থেকে কেমন ব্যবহার পেয়েছেন। সেখানে মানবতা আর পাশবিকতার যুগপৎ চিত্র ফুটে উঠেছে। একজন মসজিদের ইমাম জীবন ও পরিবারের নিরাপত্তার ঝুঁকি নিয়ে ওই হিন্দু মহিলাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন, আশ্রয় দিয়েছেন। আবার, কেবল হিন্দু হওয়ার অপরাধে সশস্ত্র কোনো যুবকের ক্রোধের মুখোমুখি হয়েছেন ওই নারী। ওই মা রিফিউজি ক্যাম্পে তার কিশোরী কন্যাদের নিরাপত্তার আশঙ্কা করেছেন। একাধিকবার মেয়েদের কাছ থেকে কমিটমেন্ট নিয়েছেন যেন কেউ তাদের স্পর্শ করলে সঙ্গে সঙ্গে নদীতে ঝাঁপ দেয়। আবার, একজন পোশাকধারী মুসলিম জওয়ানের ঘরে কন্যাদের পাঠিয়ে দিয়ে নিরাপত্তা পেয়েছেন।

ইন্সট্রুমেমন্ট অব অ্যাকসেশনের 'পর' ভারতীয় সেনাবাহিনী কাশ্মীরে পৌঁছে। শক্ত অবস্থান নেয়। পাঠানরা ক্রমে পিছু হটে। অনেকে নিহত হয়। সেনা আক্রমণে পাঠানদের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদেরও অনেকে নিহত হয়। ১৯৪৭ সালে সেনাবাহিনী শ্রীগনর বিমানবন্দরে নামার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পার্শ্ববর্তী গোগো গ্রামে সহিংসতায় প্রায় ১২ জন মানুষের প্রাণহানি হয়। যাকে কাশ্মীর ভ্যালিতে ভারতীয় বাহিনীর প্রথম রক্তপাত হিসেবে রিপোর্ট করা হয়েছে ২০১৫ সালে।[১০] পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল জিন্নাহ্ তখন তার নিয়মিত সৈন্য পাঠান সহায়তার জন্য। ফলে স্বাধীনতার প্রথম বর্ষেই যমজ রাষ্ট্র দুটি জড়িয়ে পড়ে যুদ্ধে। ভারতীয় সেনাবাহিনী বারামুলা পুনর্দখল করে। মুজাফফারাবাদ রয়ে যায় পাকিস্তানের অধীনে।

তবে, এই যোগদান চুক্তি নিয়েও বিতর্কের শেষ নেই। ব্রিটিশ ভারতের সরকার নতুন স্বাধীন ভারত সরকারের কাছে জম্মু-কাশ্মীরের সার্বভৌমত্ব হস্তান্তরের জন্য একটি দলিল তৈরি করেছিল ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে। দিন ও স্বাক্ষরের জায়গা খালি রাখা হয়েছিল তাতে। ওই দলিলেরই আগস্ট কেটে দিয়ে অক্টোবর লিখে তাতে স্বাক্ষর করা হয়েছে বলে ভারতীয় এক শ্বেতপত্রের বরাতে উল্লেখ করেছেন আবদুল মাজীদ সিরাজ। প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫ এর নিউজের বরাতে তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, ওই চুক্তির দলিল রাষ্ট্রীয় আর্কাইভ থেকে খোয়া

গেছে। আমেরিকা, কিছু আরব ও ইউরোপীয় দেশের পক্ষ থেকে ওই দলিল দেখতে চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু, তার খোঁজ মেলেনি।[১১] তবে, অনেকে এই অভিযোগকে মিথ্যা মনে করে।

ভারতের জন্য এই ডকুমেন্টই সবচেয়ে বড় আইনি ডকুমেন্ট। কারণ, জম্মু ও কাশ্মীরের (ভারতের অধীনস্থ অংশ) প্রথম বিধানসভায় এটির বৈধতা দেওয়া হয়েছে। এবং এটিকে জেঅ্যান্ডকের সংবিধানের অংশ করা হয়েছে। অপরদিকে পাকিস্তানের অভিযোগ, মহারাজাকে চাপে ফেলে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করানো হয়েছে। তাছাড়া, চুক্তির স্বাক্ষরকারী মহারাজা হরি সিংয়ের কোনো গ্রহণযোগ্যতা ছিল না বলেও একে নাকচ করেছে পাকিস্তান। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের শুনানিতে পাকিস্তানের প্রতিনিধি স্যার এম জাফরুল্লাহ খান উল্লেখ করেছেন,

> The accession which Mahraja Hari singh signed with the government of India runs parallel to the accession between Maharaja of Junagadh and Govt. of Pakistan, which India has unilaterally set aside.[১২]

অর্থাৎ, জুনগরের মুসলিম মহারাজা পাকিস্তানের সঙ্গে একই ধরনের একটি যোগদান চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। কিন্তু, ভারতীয় কব্জা থেকে জুনগরকে মুক্ত রাখতে তা কোনো কাজে আসেনি। উপরন্তু, জাতিসংঘের পক্ষ থেকে ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ সালে একাধিক রেজ্যুলেশনে বলা হয়েছে,

> 'The question of the accession of the state of Jammu and Kashmir to India or Pakistan will be decided through the democratic method of a free and impartial plebiscite'.

যদিও জাতিসংঘ তার এই অবস্থানের পক্ষে শক্ত কোনো ভূমিকা নিতে পারেনি। বরং, ক্রমান্বয়ে জাতিসংঘের অবস্থান গুরুত্বহীন হয়েছে। সমস্যা সমাধানের জন্য জাতিসংঘে প্রথম নালিশ করেছিল ভারতীয় পক্ষ। পরে, সেই ভারতীয় পক্ষই জাতিসংঘের ভূমিকাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করেছে। পাকিস্তান এখনও আন্তর্জাতিকভাবে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে সমাধানের কথা বলে। কিন্তু, শিমলাচুক্তির আওতায় ভারত সেই দাবি সর্বদাই নাকচ করে এসেছে। পক্ষান্তরে, নানা পটপরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় আন্তর্জাতিক মহলকে ভারত এটা অনেকটাই বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে সমস্যাটা দ্বিপক্ষীয়। এখানে থার্ড পার্টি অপ্রত্যাশিত। এমনকি কাশ্মীরের বাসিন্দাদেরও বা তাদের কোনো প্রতিনিধিকেও ভারত কোনো পক্ষ হিসেবে মেনে নিতে বাহ্যত রাজি হয়নি।

১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে ব্রিটিশ কর্মকর্তা মাউন্টব্যাটেন লাহোরে জিন্নাহর সঙ্গে বৈঠক করেন। ৮ই ডিসেম্বর যৌথ প্রতিরক্ষা কাউন্সিলের সঙ্গে বৈঠকেও নেহরু এবং মাউন্টব্যাটেন উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু, কাশ্মীর ইস্যুর কোনো সমাধান তারা করতে পারেননি। ফলে, মাউন্টব্যাটেন ও নেহরু সমস্যাটি জাতিসংঘে উপস্থাপনের উদ্যোগ নেন[২]। ১ জানুয়ারি, ১৯৪৮ সালে ভারতীয় প্রতিনিধি পি পি পিল্লাই জাতিসংঘের নিরাপত্তা কাউন্সিলের কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করেন।

১৯৪৮ সালের ১৪ই মে ইন্দিরা গান্ধী তার বাবাকে কাশ্মীর থেকে এক চিঠি

চিত্র ৬.৩: জওহরলাল নেহরু ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

লিখেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন, They say that, only Sheikh Saheb is confident of winning the plebiscite।[৩] ২০১৫ সালের অক্টোবর মাসে জেঅ্যান্ডকে চিফ মিনিস্টার মুফতি সাঈদ বিধানসভায় বলেছিলেন, কাশ্মীরিরা দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করেছে'। এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় একজন কলামনিস্টের[১৩] মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছিলেন,

> 'More than a six decade of accession never means Kashmiris – as a people – have endorsed an enforced marriage with Delhi. When the people have not been asked at all, where does the question of rejection rise?'

এজি নূরানীর মূল্যায়ন,

> Nehru cared little for the people of Kashmir, still less did Mohammad Ali Zinnah and least of all, the British'

অনেক ঐতিহাসিকের দাবি, সরদার প্যাটেল জেঅ্যান্ডকে-এর ভারতে যুক্ত হওয়ার পক্ষে ছিলেন না। বরং, নেহরু ছিলেন অতি আবেগী। নাসিদ হাজারি 'মিড নাইটস ফিউরিস' নামক বইয়েও দাবি করেছেন, নেহরু তার পূর্বপুরুষের ভূমিকে ভারতে যুক্ত করতে প্যাটেলের চেয়ে বেশি ডেসপারেট ছিলেন। নেহরুই প্যাটেলকে রাজ্যটির ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব তুলে ধরে একে ভারতে যুক্ত করার ব্যাপারে রাজি করিয়েছেন। এমনকি, ১৯৪৭ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর নেহরু প্যাটেলকে এক চিঠিতে লিখেছেন যে, শেখ আবদুল্লাহ এবং তার দল কিভাবে ভারতের স্বার্থরক্ষায় অ্যাসেট হিসেবে ভূমিকা রেখে আসছে[১৪]। ১৯৪৭ পরবর্তী জেঅ্যান্ডকে-এর প্রথম মনোনীত নারী লোকসভা সদস্য কৃষ্ণা মেহতা[৯] তার বইয়ে লিখেছেন, নেহরু তার প্রতি এতটাই আন্তরিক ছিলেন যে তাকে বোন সম্বোধন করেছিলেন।

সব মিলিয়ে ১৯৪৭ এর আগস্ট থেকে অক্টোবর এর ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করলে দেখা যায়–

এক. ভারত এবং পাকিস্তান উভয় দেশই (বিশেষত নেহরু এবং জিন্নাহ) জম্মু-কাশ্মীরকে নিজ নিজ দেশে সম্পৃক্ত করতে মরিয়া ছিলেন।

দুই. মহারাজাও দুই পক্ষের সঙ্গে আলাপ চালিয়ে সময় পার করছিলেন। মহারাজা অনেকটা উপলব্ধি করেছিলেন যে স্বাধীন থাকা কঠিন। বস্তুত, তিনি কখনও স্বাধীন ছিলেন না। ছিলেন ব্রিটিশ প্রিন্স। তিনি হিসাব করছিলেন কোনো পাশে গেলে লাভ বেশি। তবে, অনেক সূত্র থেকেই মহারাজার পরিবারের সঙ্গে হিন্দুত্ববাদী বিভিন্ন গোষ্ঠীর অন্তরঙ্গ সম্পর্কের প্রমাণ মেলে। তা থেকে ধারণা করা যায়, স্বাধীন থাকতে চাইলেও মহারাজা 'হিন্দুরাষ্ট্রের' দিকেই ঝুঁকছিলেন। হিন্দুত্বের প্রতি মহারাজার এই ঝোঁকই হয়তো পাকিস্তানকে সন্দেহে ফেলে থাকবে। যা মুজাফফারাবাদ আক্রমণের একটি নেপথ্য কারণ।

তিন. মহারাজার বিরুদ্ধে আন্দোলন, কৃষকদের জন্য আশাব্যঞ্জক নয়া কাশ্মীর ম্যানিফেস্টোসহ বিভিন্ন কারণে শেখ আবদুল্লাহর প্রতি অনুগত ছিল (অধিকাংশই কাশ্মীর ভ্যালির) সহজ-সরল সাধারণ মানুষ। শেখ আবদুল্লাহ জনগণের ধর্মীয় আবেগ ও ভৌগোলিক বাস্তবতার চেয়ে নেহরুর সঙ্গে তার সুসম্পর্ক ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি কমিটমেন্টকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাছাড়া রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হিসেবে মহারাজার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা সত্ত্বেও তার দলের সঙ্গে মহারাজার একধরনের সমঝোতার সম্পর্ক ছিল।

চার. অন্য মুসলিম নেতারা (বিশেষত মুসলিম কনফারেন্স) পাকিস্তানের প্রত্যাশা করলেও তেমন কোনো শক্ত রাজনৈতিক সমর্থন এ পাশ থেকে দিতে পারেননি। বিশেষত, মুসলিম কনফারেন্সের মূল প্রভাব ছিল জম্মু এলাকার মুসলমানদের মধ্যে। কিন্তু, সেখানকার জনপ্রিয়তা রাজ্যের সার্বিক রাজনীতিতে কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি।

পাঁচ. ব্রিটিশ ভাইসরয় মাউন্ট ব্যাটেন কার্যত নেহরুর দ্বারা কনভিন্সড হয়েছিলেন। জিন্নাহ তাকে কনভিন্সড করতে পারেননি। ধারণা করা যেতে পারে, শেষমেশ মহারাজা ভারতে যোগ দিতে বাধ্য হবেন এমন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কাগজপত্র প্রস্তুত রাখা হয়েছিল ভাইসরয়ের দপ্তরে।

ছয়. পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম ফ্রন্টিয়ারের লোকেরা কাশ্মীরের মুসলিমদের উদ্ধারের জন্য ছুটে আসে। কিন্তু, তাদের স্বাগত জানানোর জন্য কাশ্মীরের শান্ত-ভদ্র মুসলমানেরা প্রস্তুত ছিলেন না। বরং, অন্য এলাকার উপজাতীয় লোকদের কাশ্মীর উদ্ধার বা দখল করতে আসা মহারাজাকে ভীত করেছে। যা তাকে ভারতে যোগ দিতে একটি পুশ-ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছে। এবং, এই ঘটনাই ভারতের দখলদারির বৈধতা দেওয়ার পেছনে একটা শক্ত যুক্তি হয়ে গেছে। এখনও যা আওড়ানো হয়।

তবে, শেষ পয়েন্টের একটু বিশদ বিবরণ আবশ্যক। সাধারণত, এটি ভারতীয় বয়ান। ভারতীয় অধিকাংশ বর্ণনাই নর্থ-ওয়েস্টার্ন ফ্রান্টিয়ারের লোকদের হামলার ঘটনাকে বিনা উসকানিতে দখল করতে আসা হিসেবে দেখানো হয়। লক্ষণীয়, মহারাজার শোষণের বিরুদ্ধে গোটা রাজ্যের লোকদের ক্ষোভ ছিল চরমে। শেখ আবদুল্লাহর জনপ্রিয়তার পেছনেও ছিল মূলত মহারাজার বিরুদ্ধে আন্দোলন। কিন্তু, ওই হামলার পেছনে কোনো ঘটনা কাজ করেছে কিনা তা খতিয়ে দেখা জরুরি ছিল। বিশেষজ্ঞরা বলেন, রাষ্ট্র সবসময়ই একই সঙ্গে দুটি চর্চা করে। Act of remembrance and act of forgetting. রাষ্ট্রের 'জাতীয় স্বার্থে' কিছু কিছু ঘটনাকে ভুলে যেতে চায় আর কিছু কিছু ঘটনাকে স্মরণ করতে চায়। সম্ভবত, ওই আক্রমণের পেছনের ঘটনাবলী 'ভুলে যাওয়া কর্মসূচির' অংশ হিসেবেই অনুল্লিখিত রয়েছে। তবে, কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামী পক্ষ এই ঘটনাগুলোকে 'স্মরণ রাখছে'। কারণ, এটা তাদের পক্ষের জন্য জরুরি। এ সংক্রান্ত বেশ কিছু বর্ণনা বিভিন্ন বরাতে পাওয়া গেছে। খালিদ বশির আহমদের[৮] লেখা একটি বিস্তারিত রিপোর্ট থেকে কিছু তথ্য এখানে তুলে ধরা যাক।

তিনি লিখেছেন, ১৯৪৭ সালের আগস্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সময়ে জম্মুর পূর্বদিকের উদমপুর, রাসি, কাঠুয়া জেলায় মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ চলেছে। আয়ান স্টেফারসের বরাতে নিহতের সংখ্যা প্রায় অর্ধমিলিয়ন উল্লিখিত হয়েছে। ১০ই আগস্ট ১৯৪৮ এর টাইমস অব লন্ডনের বরাতে তার উল্লিখিত তথ্য এখানে সরাসরি উল্লেখ করা যাক,

> "Forming 40 percent of the popultion of this whole area [Jammu Province], to the north and astride the Chenab Muslims were in a majority in the Reasi, Ramban and Kishtwar areas and nearly attained parity in Bhaderwah. In the remaining Dogra areas the 237,000 Muslims were

systematically exterminated – unless they escaped to Pakistan along the border – by all the forces of the Dogra State, headed by the Maharaja in person and aided by Hindus and Sikhs. This happened in October, 1947, five days before the first Pathan invasion and nine days before the Maharaja's accession to India. This elimination of two-thirds of the Muslims last autumn has entirely changed the present composition of eastern Jammu Province."

আহমদ ব্যাখ্যা করেছেন,

> The anti-Muslim violence in Jammu had two contributory factors– external and internal. The external factor was the arrival of large number of Hindu and Sikh refugees uprooted from areas that went to Pakistan and the areas of Jammu Province that later formed part of Pakistan Administered Jammu & Kashmir. ... Internally, the atmosphere against Muslims had been building up for some time. Arms were being distributed among Hindu communalist groups even as Muslims were ordered to deposit with the government all weapons they possessed. Muslim soldiers in the Maharaja's army too were disarmed. Arms training camp for Hindus and Sikhs was established in Jammu City. Preparations appeared in full swing for organizing bloodbaths in the Province. The Muslims as disempowered subjects, although numerically quite large, were fear stricken as they had no answer to the state sponsored violence. The elite among them were migrating to Pakistan and their leadership was in jail.

এছাড়া ওই রিপোর্টে জম্মু-কাশ্মীরের প্রথম মুসলিম সরকারি কর্মকর্তা কুদরতুল্লাহ, রাজনীতিক করণ দেবী শেঠী, সমাজকর্মী বলরাজ পুরী, জেঅ্যান্ডকে সিনিয়র আইনজীবী সাবির আহমেদ সালাহরিয়া, পশ্চিমা গবেষক অ্যালিস্টার ল্যাম্ব, কাশ্মীরি সাংবাদিক[১৫] জিকে রেডিসহ বিভিন্ন ব্যক্তির বরাতে উল্লেখ করা হয়, মহারাজার

সঙ্গে হিন্দু সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী আরএসএস এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সুতরাং, রাজ্যের জম্মু এলাকায় মুসলিম বিরোধী তৎপরতায় মহারাজার সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ১৯৪৭ সালের ১৮ই ডিসেম্বর সিভিল অ্যান্ড মিলিটারি গেজেটে ক্রিস্টোফার স্যাডেন রিপোর্ট করেন,

> October 20 near Kathua and Akhnoor Bridge, on October 22 at Samba, on October 23 at Maogaon, on November 5 and 6 at Jammu City and on November 9 near Suchetgarh. As many as 70,000 Muslims were reported to have been killed in these seven incidents alone.

কৃষ্ণা মেহতা তার স্মৃতিকথায় (প্রাগুক্ত) তুলে ধরেছেন, মুজাফফারাবাদে তার স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি যখন বিভিন্ন বাড়িতে ও ক্যাম্পে রিফিউজি হিসেবে ছিলেন তখন অনেকে তাকে বলেছেন, 'জম্মুতে মুসলমানরা গণহত্যার শিকার হয়েছে। তার প্রতিশোধ হিসেবে তারা হিন্দুদের বিরুদ্ধে ভূমিকা নিচ্ছেন।' যদিও তিনি সেই সব তথ্যকে বিশ্বাস করেননি। স্রেফ পাকিস্তানি প্রোপাগান্ডা হিসেবে মনে করেছেন। স্বভাবতই, মহারাজার উজিরের স্ত্রী হিসেবে মহারাজার শাসনের প্রতি আস্থা ছিল তার। তার স্বামী নিহত হয়েছিলেন মহারাজার নির্দেশ মান্য করতে গিয়ে। অনেক কর্মকর্তা সেখান থেকে নিরাপদে সরে গিয়েছিল। কিন্তু, তিনি (দুনি চাঁদ মেহতা) দায়িত্ব পালনের জন্য মুজাফফারাবাদে অবস্থান করেছেন। অথচ, মহারাজা নিজেও শ্রীনগর থেকে জম্মুতে আশ্রয় নিয়েছিলেন সস্ত্রীক। সে সময় মহারাজা কাশ্মীর থেকে ৮৫টি গাড়িতে করে জিনিসপত্র বহন করে জম্মুতে নিয়ে গিয়েছেন বলে একটি সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।[১০]

মোদ্দাকথা, সীমান্তের উভয় পাশে উত্তেজনা ও অস্থিরতা ছিল অবর্ণনীয়। জম্মুতে যেমন ছিল মুসলমানদের করুণ অবস্থা তেমন ছিল মুজাফফারাবাদে হিন্দুদের। সংখ্যাগত দিক থেকে মুজাফফারাবাদে হিন্দু ছিল কম। ফলে সেখানে বিরাট সংখ্যায় হত্যার খবর মেলে না। বিপরীত দিকে জম্মুর বিভিন্ন জেলায় হিন্দু-মুসলিম সংখ্যা ছিল প্রায় সমান। ফলে, সেখান থেকে মুসলিমবিরোধী সহিংসতায় নেমে এসেছিল ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়। অসংখ্য মুসলিম জম্মু থেকে মুজাফফারাবাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। অনেকে মুজাফফারাবাদ গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল বিভিন্ন ক্যাম্পে। বিভিন্ন রিপোর্ট অনুসারে দুই থেকে পাঁচ লাখ মুসলিম জম্মু প্রভিন্স থেকে মুজাফফারাবাদে রিফিউজি হয়েছে। হিন্দুরা আসছিল জম্মুতে ওপাশ থেকে। পাঞ্জাবের কুরুক্ষেত্র ক্যাম্পে প্রায় দুই লাখ রিফিউজি আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে কৃষ্ণা মেহতা উল্লেখ করেছেন (পৃ:১৬৫)। এরই মধ্যে অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে

পাকিস্তান জম্মু-মুজাফফারাবাদ ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। তার উদ্দেশ্য ছিল মহারাজাকে পাকিস্তানে যোগদানের বিষয়ে চাপ প্রয়োগ করা। ফলে, অনেক মানুষ আক্রমণকারীদের হাতে নিহত হয়।

অধ্যায়ের গোটা আলোচনায় উপলব্ধির বিষয় হলো, সীমান্ত, জমিন আর রাষ্ট্র মহাগুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছিল ভারত, পাকিস্তান ও মহারাজার কাছে। প্রত্যাশার কেন্দ্রে ছিল ক্ষমতা। মানুষ তাদের কাছে মৌলিক বিষয় ছিল না। উল্লেখ্য, গোটা ব্যাপারটাতে এক ধরনের পরস্পর বিরোধী বর্ণনা প্রচলিত। ভারত শাসিত অংশের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দেওয়া বর্ণনাগুলোতে মুজাফফারাবাদে উপজাতীয় লোকদের আক্রমণে হিন্দুদের হত্যা, নারীদের ধর্ষণ, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের কথা উল্লেখ করা হয়। বিপরীত দিক থেকে জম্মুতে মুসলিম গণহত্যার বিবরণকে স্মরণ করা হয়। এই দ্বিমুখী বর্ণনাগুলো কেবল সম্মিলিত সহিংসতার চক্র (Cycle of collective violence) তৈরি করছে। স্পষ্টতই, পাকিস্তান অধিকৃত মুজাফফারাবাদ অংশকে হিন্দুমুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, জম্মুকে করা হয়েছে মুসলিমমুক্ত করার চেষ্টা। এখানে কোনো একটি পক্ষের বর্ণনার মাধ্যমে বিপরীত পক্ষের বর্ণনাকে মিথ্যা প্রমাণ করা যায় না। কোনো পক্ষের হামলা আগে সংঘটিত হয়েছে তা তুলে ধরে অন্যপক্ষের হামলাকে বৈধতা দেওয়াও যায় না। সহজভাবে মনে হয়, মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দু আর হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের এক উন্মত্ত সংঘাতের দিকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর, একই সময় সদ্যভূমিষ্ঠ দুটি রাষ্ট্র একে অপরকে দেখতে শুরু করেছিল হুমকি হিসেবে।

নোট/সূত্র

১. Sheikh Showkat Hussain; *Facts of Resurgent Kashmir*, Srinagar (2008); Pp: 17-18
২. Sajad Padder; *India-Pakistan: Composite Dialogue Process, Issues and Actions* (2015); Kalpaz: New Delhi; P:17.
৩. A G Noorani; *The Kashmir Dispute* (2013); New Delhi: Tulika Books.
৪. Sajad Padder; *India-Pakistan: Composite Dialogue Process* (2015); P:18.
৫. Mahboob Makdoomi; *Kashmir Life* (Online), Nov 11; 2015; http://www.kashmirlife.net/1947-how-delhi-provoked-tribal-invasion-in-kashmir-89544/
৬. Abdul Majid Siraj; *Kashmir Case Law* (2006), UK: Scottspress Publishers Ltd; P282.

৭. Krishna Mehta; *Kashmir 1947: A survivor's Story* (2005); Penguin Books; Pp: 4-5.
৮. Khalid Bashir Ahmed; *Circa-1947: A long story* (2014); http://www.kashmirlife.net.
৯. কৃষ্ণা মেহতার স্বামী দুনি চাঁদ মেহতা ছিলেন মহারাজা হরি সিংয়ের অধীনে মুজাফফরাবাদ জেলার উজিরে ওয়াজারাত। ১৯৪৭ সালে উত্তর পশ্চিমের গিলগিত-বালতিস্তান থেকে আসা সশস্ত্র লোকেরা মুজাফফারাবাদ দখল করে। সে সময় ওই উজির তাদের গুলিতে নিহত হন। ৬/৭টি শিশু-কিশোর সন্তান নিয়ে কৃষ্ণা মেহতা বিভিন্ন ক্যাম্পে ক্যাম্পে কাটিয়ে শেষমেশ ভারতে ফেরেন। Kashmir 1947: A survivor's Story; Penguin Books, 2005.
১০. K L Handoo, *The First Blood Shade in Kashmir, 1947*; Kashmir Life; (November 1-7, 2015), P21
১১. Abdul Majid Siraj; *Kashmir Case Law* (2006); P281.
১২. Samir Ahmed; *Contextualizing Mosharraf's Four Point Formula*; Journal of Kashmir Studies (2012); Pp: 87-105.
১৩. Ajaz-Ul-Haque; Right Hand: Secular and A half; Greater Kashmir, October 8, 2015; P: 8.
১৪. Z G Mahmud; Burden of Geography; Greater Kashmir, August 10, 2015; P: 8.
১৫. জিকে রেডি কাশ্মীর টাইমস নামে এক পত্রিকার সাংবাদিক ছিলেন। তার পত্রিকা বন্ধ করে তাকে জম্মু-কাশ্মীর থেকে বহিষ্কার করা হয় ১৯৪৭ সালে। তিনি পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন। পরে তিনি আজাদ কাশ্মীরে গিয়ে রিফিউজি ক্যাম্প পরিচালনা করেন। কৃষ্ণা মেহতা তার স্মৃতিকথায় ক্যাম্পে মি. রেডির বদান্যতার কথা উল্লেখ করেছেন।

৭
স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা

১৯৪৭ সালের ২৬ অক্টোবর মহারাজা ভারতে যোগ দিলেন শর্তসাপেক্ষে। ভারতীয় সেনাবাহিনী শ্রীনগরে পৌছল পরের দিন। উপজাতীয় লোকেরা পিছু হটল। পাকিস্তান পাঠালো সৈন্যবাহিনী। বরামুলা পর্যন্ত ভারত ফের নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হলো। মুজাফফারাবাদ রইল পাকিস্তানের অধীনে। যুদ্ধ চলল ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাস নাগাদ। তারপর যুদ্ধবন্ধের চুক্তি (Cease fire) হলো ১৯৪৯ সালের জানুয়ারিতে।[১]

ভারতের অধীনেই রইল সিংহভাগ অংশ। কিন্তু, মহারাজা আর শাসনের কেন্দ্রে থাকতে পারলেন না। শেখ আবদুল্লাহকে বানানো হলো রাজ্যের ডিফ্যাক্টো রুলার। মহারাজা হলেন গভর্নর (সদর-এ-রিয়াসাত)। এরপর শুরু হলো শেখ আবদুল্লাহর সঙ্গে মহারাজার দেনদরবার। শেখ আবদুল্লাহর নেতৃত্বে জনগণের আন্দোলনের মূল দাবি ছিল, মহারাজার শোষণের বিরুদ্ধে একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক শাসন। মহারাজার শোষণ শেষ হলো। কিন্তু, 'স্বাধীনতা'র সুযোগ হলো না রাজ্যটির। পৃথিবীর 'বৃহত্তম গণতান্ত্রিক' দেশের 'বিশেষ' অংশ হলো জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর। এই বিশেষত্ব নির্ধারণের জন্য বহু দেনদরবার, দরকষাকষি হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে আর্টিকেল-৩৭০ যুক্ত করে তাতে জম্মু-কাশ্মীরকে বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হলো। ভারতীয় সংবিধানের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে।

> The Constitution applies to the State of Jamma and Kasmir with cartain exceptions and modifications as praided in atrticle 370 and the Constitutions (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954.

রাজ্যসভাকে 'সরদার-এ-রিয়াসাত' বা গভর্নর নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হলো। অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে যার নিয়োগ হয় ভারতের রাষ্ট্রপতির হাতে।[২] জম্মু-কাশ্মীরকে দেওয়া হলো আলাদা পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত। একারণেই, ভারতীয় পার্লামেন্টে গৃহিত সকল আইনও উল্লেখ থাকে, 'এই আইনটি জম্মু ও কাশ্মীরে প্রযোজ্য নয়, যতক্ষণ এটি সেখানকার রাজ্যসভায় পাশ না হয়।' ভারতীয় তিন রঙা পতাকার পরই শোভা পেতে শুরু করল রাজ্যের স্বতন্ত্র পতাকা। ভারতের সংবিধানে এই ধারা যুক্ত করার জন্য আবদুল্লাহ ও নেহরুর মধ্যে দেনদরবার চলেছে দীর্ঘ পাঁচ

মাসব্যাপী। ১৯৪৯ সালের ১৫ মে থেকে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত। এরপর সাংবিধানিক এসেম্বলি ১৯৪৯-এর অক্টোবরে এই ধারাটি ভারতীয় সংবিধানে যুক্ত করে।[৩]

স্বায়ত্তশাসনের শর্তে ভারতের ওপর, সম্ভবত ব্যক্তি নেহরুর ওপর বিশ্বাস করলেন শেখ আবদুল্লাহ। হলেন প্রধানমন্ত্রী। ভারতের সব রাজ্যের গণতান্ত্রিক প্রধানের নাম মুখ্যমন্ত্রী (সিএম)। কিন্তু জেঅ্যান্ডকের প্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী (পিএম)। আলাদা মর্যাদা, আলাদা পোর্টফোলিও নিয়ে তিনি ভারতের সঙ্গে ভালই শুরু করেছিলেন। এই শুরু হয়েছিল ২৪শে জুলাই ১৯৫২ সালের 'দিল্লি এগ্রিমেন্টের' মাধ্যমে।[২] মহারাজার ভারতে যোগদানের শর্ত ছিল বিদেশনীতি, যোগাযোগ ও প্রতিরক্ষা ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব। সেই সার্বভৌমত্বের সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা নির্ধারিত হলো 'দিল্লি এগ্রিমেন্টে'। তাতে জেঅ্যান্ডকে ভারতের অংশ হলেও উচ্চমাত্রার স্বায়ত্তশাসনের নিশ্চয়তা দেওয়া হলো।
কিন্তু, ব্যাপক স্বায়ত্তশাসনের সেই স্বচ্ছ কাঁচের দেয়াল বছরান্তেই ভেঙে খান খান হয়ে গেল। ৯ই আগস্ট ১৯৫৩ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহকে গ্রেপ্তার করা হলো। তার দল ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি) ওই দিনটিকে জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের কালো দিবস হিসেবে স্মরণ করে থাকে। দলটির বক্তব্য অনুসারে, 'জনপ্রিয় সরকারকে অবৈধভাবে ভেঙে দেয় করণ সিং (সরদার এ রিয়াসাত)। প্রধানমন্ত্রী আবদুল্লাহকে গ্রেপ্তার করে সেনাবাহিনী। একটি গভীর রাজনৈতিক চক্রান্ত হিসেবে বকসি গোলাম মোহাম্মদকে নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বসানো হয়। দিল্লি সরকার আর্টিকেল ৩৭০ বাতিল চেষ্টার বিরোধিতা করার কারণেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।' এনসির দাবি, 'বকসিকে পুতুল প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বসিয়েই ৩৭০ ধারাকে বাতিলের চক্রান্ত করা হয়।' বকসি তার প্রথম বক্তব্যেও বলেছিলেন, 'শেখ সাহেব একটি মুক্ত (free) রাষ্ট্র গঠন করতে চান যা তিনি কোনোভাবেই হতে দেবেন না।' বিএন মল্লিকের বক্তব্যের বরাতে এনসির পক্ষ থেকে আরও উল্লেখ করা হয়, 'জওহরলাল নেহরুও শেখ আবদুল্লাহকে গ্রেপ্তারের সমর্থন দিয়েছিলেন, কারণ, তিনি (আবদুল্লাহ) কাশ্মীরিদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাদের অধিকার ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনার জন্য একটি বিদ্রোহের পরিকল্পনা করছিলেন।' তাদের দাবি, '১৯৫২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যেই ৩৭০ ধারাকে শক্তিহীন করা হয়েছে'।[৪]

'দিল্লি এগ্রিমেন্ট' কাগজে কলমে কাশ্মীরকে স্বায়ত্তশাসন দিলেও কাশ্মীরের প্রতি দিল্লির মনোভাব কখনোই বিশ্বস্ত হয়নি। শেখ আবদুল্লাহ-ই কাশ্মীরকে নেহরুর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন নেহরুর বিশ্বস্ত। কিন্তু, সেই বিশ্বাস বারবারই ভেঙেছে। দিল্লি এগ্রিমেন্টের আগে শেখ আবদুল্লাহ বিভিন্ন সময় দেশি-বিদেশি পক্ষের কাছে স্বাধীনতার কথা প্রকাশ্যে বলেছেন। স্বাধীন জম্মু-কাশ্মীর প্রতিষ্ঠা তার

কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প হিসেবে ছিল।[২] বিধানসভার প্রথম বক্তব্যে তিনি বলেছিলেন,

> আমাদের (কাশ্মীরকে) প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিকল্প চিন্তা করতে হবে। উভয় (ভারত ও পাকিস্তান) দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখেই তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে। বর্তমানের অচলাবস্থায় এমন কৌশল পথপ্রদর্শক হতে পারে। এই পন্থা আকর্ষণীয়ও মনে হতে পারে। একটা পর্যটনভিত্তিক রাজ্য হিসেবে আমাদের জন্য, এটা আরও কিছু সুবিধা দিতে পারে। কিন্তু, স্বাধীনতার কথা ভাবতে গিয়ে আমাদের বাস্তবতা বিস্মৃত হলে চলবে না। প্রথমত, আমাদের রাজ্যের সুদীর্ঘ ও জটিল সীমান্ত এলাকা রয়েছে অনেক দেশের সঙ্গে, যা পাহারা দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত শক্তি আমাদের নেই। ফলে স্বাধীনতা রক্ষা করা এতটা সহজ নয়। দ্বিতীয়ত, আমরা ওই সব প্রতিবেশীর মধ্যে কোনো শক্তিশালী পক্ষ দেখি না যে আমাদের স্বাধীন থাকার নিশ্চয়তা দেবে।[৫]

অর্থাৎ, শেখ আবদুল্লাহ স্বাধীনতার আশা রাখলেও দুটি কারণে তা কঠিন বলে মানতেন। তথাঃ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং শক্তিশালী গ্যারান্টারের অভাব। এই দুই নিশ্চয়তা তার ছিল না বলেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটা বিকল্প বেছে নেওয়ার পক্ষে ছিলেন। সেক্ষেত্রে তিনি ভারতকে বাছাই করেছেন ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থার আশায়। কিন্তু, ভারতে যোগদানের পরও তিনি 'শক্তিশালী' গ্যারান্টার খোঁজার চেষ্টায় রত ছিলেন। ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫০ সালে তিনি ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাকে তিনি বলেন, শুধু তিনি নিজে নন। রাজ্যের অধিকাংশ জনগণ স্বাধীনতা চায়। এমনকি আজাদ কাশ্মীরও স্বাধীন কাশ্মীরে যোগ দেবে। ১৯৫২ সালে তিনি অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনারের সঙ্গেও দেখা করেন।
আবদুল্লাহর এই স্বাধীনতার প্রত্যাশা এবং তৎপরতার খবর দিল্লির জানা ছিল। ১৯৫২ সালের জুলাই মাসে দিল্লি এগ্রিমেন্টের পর ভারত মনে করেছিল সেই স্বাধীনতার প্রত্যাশার মুখে স্থায়ীভাবে কুলুপ আঁটা হয়েছে। কারণ, তখন আইনিভাবে ৩৭০ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে যথেষ্ট স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়েছে রাজ্যটিকে। কিন্তু, বছর যেতে না যেতেই আবদুল্লাহ ফের স্বাধীনতার কথা বলতে শুরু করেছিলেন। ১৯৫৩ সালের মে মাসে তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী আদলাই স্টিভেনশনের সঙ্গে সাক্ষাতে সেকথা বলেন। ভারতের জন্য এটা একটা মাথাব্যথার কারণ হয়।

অপরদিকে, দিল্লি এগ্রিমেন্টে দেওয়া স্বায়ত্তশাসনের সীমারেখা অনেকক্ষেত্রেই লঙ্ঘন করেছিল ভারত।[২] অর্থাৎ, 'দিল্লি এগ্রিমেন্ট' এর শর্ত কোনো পক্ষই মেনে চলেনি। এটাই ধীরে ধীরে আস্থার সংকট সৃষ্টি করেছে নেহরু ও আবদুল্লাহর মধ্যে। এরই মধ্যে জম্মুতে কিছু হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতা 'প্রজা পরিষদ'সহ বিভিন্ন ব্যানারে

আর্টিকেল ৩৭০ বাতিল করে জম্মু-কাশ্মীরকে সম্পূর্ণভাবে ভারতের সঙ্গে সংযুক্তির দাবি শুরু করে। এই দাবির পক্ষে শক্ত সমর্থন দেয় ভারতের হিন্দুত্ববাদী সংগঠন 'জনসংঘ' (প্রতিষ্ঠা ১৯৫১)। ১৯৫২ সালে প্রজা পরিষদের দুই নেতাকে আটক করে শেখ আবদুল্লাহর সরকার। ১৯৫৩ সালের ৮ মে জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী জম্মু-কাশ্মীরে ঢুকতে গেলে তাকেও আটক করা হয়। ওই হিন্দু নেতা কারাগারে মারা যান। এই ঘটনাগুলো স্বায়ত্তশাসন (আর্টিকেল ৩৭০) বিরোধী আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে[২]। এসব ঘটনার ধারাবাহিকতা হলো, ১৯৫৩ সালের অগাস্টে শেখ আবদুল্লাহকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া এবং কারাগারে পাঠানো।

শেখ আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে, তিনি পাকিস্তানের গুপ্তচরের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছেন যা রাজ্যের জন্য ক্ষতির কারণ। ভারতীয় ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র গুহকে এই লেখকের প্রশ্ন ছিল, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীর পাকিস্তানে না গিয়ে সেক্যুলার ভারতে আসল। তারপরই ১৯৫৩ সালে শেখ আবদুল্লাহর গ্রেপ্তারের মাধ্যমে সেই সেক্যুলার আস্থার পরাজয় হলো কি না? তিনি বলেছিলেন, 'এটা সেক্যুলারিজমের পরাজয় না হলেও আইনের শাসনের পরাজয়। নেহরু জম্মু-কাশ্মীরে আইনের শাসন দিতে ব্যর্থ হয়েছেন'।
এভাবেই শেখ আবদুল্লাহ স্বায়ত্তশাসনের প্রলোভনে ভারতের প্রতি আস্থা রেখেছিলেন। কিন্তু, সেই আস্থার অপমৃত্যু হয়। ন্যাশনাল কনফারেন্সসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কখনও দিল্লির পক্ষ থেকে যতটুকু ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট থেকেছে। কখনও আবার অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। তবে, ঘাড় ফুলিয়ে দাবি করতে পারেনি যে আর থাকবো না তোমাদের সঙ্গে। যেসব রাজনৈতিক দল স্বায়ত্তশাসনের চুক্তির অংশীদার ছিল না তারা সেই সময়ে (১৯৪৭) ছিল অজনপ্রিয়। ক্রমে তারাই জনপ্রিয় হয়। জাতিসংঘসহ নানা প্রতিষ্ঠান থেকে দেওয়া প্রস্তাব ও মন্তব্যগুলো তাদের জন্য দালিলিক সুযোগ বৃদ্ধি করে। ১৯৪৮-৪৯ সালের জাতিসংঘের প্রস্তাবে লেখা হয়েছিল,

> 'Accession of the state of Jammu and Kashmir to India or Pakistan will be decided through the democratic method of a free and impartial plebiscite'.

অর্থাৎ, সেখানে স্বাধীনতার কোনো সুযোগ ছিল না। কিন্তু, ১৯৫০-৫১ সালের প্রস্তাবে লেখা হয়, 'The final disposition of the state' যার মাধ্যমে সেলফ ডিটারমিনেশনের বা স্বাধীনতার সুযোগ উন্মুক্ত করা হয়।[২] এভাবে ক্রমান্বয়ে স্বায়ত্তশাসনের দাবি ম্রিয়মাণ হয়ে আজাদির দাবি হয়ে ওঠে জনপ্রিয়। মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে ধ্বনিত হতে শুরু করে স্লোগান–'হাম কেয়া চাতেহে?

আজাদি?/হক হামারা, আজাদি/ছিনকে লেঙ্গে, আজাদি'। তবে, ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি) ও পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টিসহ (পিডিপি; এনসি থেকেই গড়ে ওঠা) প্রো-ইন্ডিয়ান দলগুলো এখনও অটোনমি বা সেলফ রুলেই সন্তুষ্ট। তারা ভারতীয় বিধানের অধীনে রাজনীতি করছে। নির্বাচন করছে। ক্ষমতায় আসছে। আর কেন্দ্রের সঙ্গে দেনদরবার করছে স্বায়ত্তশাসন কিংবা সেলফ রুলের জন্য।

কাশ্মীরিরা ভারতবিরোধী কেন

একটা বিষয় প্রশ্ন আসতে পারে। শেখ আবদুল্লাহ মুসলিম নেতা হয়েও ভারতে যোগ দিতে রাজি হলেন কেন? প্রথমত, শেখ ছিলেন নেহরুর রাজনৈতিক বন্ধু। জিন্নাহর সঙ্গে ছিল তার আড়ি। কাশ্মীরকে তিনি আলাদা জাতিসত্তা মনে করতেন। মুসলমান সত্ত্বেও কাশ্মীরকে দ্বিজাতিতত্ত্বের অধীন বলে তিনি স্বীকার করেননি। দ্বিতীয়ত, কাশ্মীরে মহারাজার শোষণের বিরুদ্ধে ১৯৩১ সালে গণআন্দোলন শুরু হয়। তার মাধ্যমেই শেখ নেতা হয়ে ওঠেন। শেখের রাজনৈতিক দল মুসলিম কনফারেন্স জমিদারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনগণের শাসনের দাবিতে আন্দোলন করে আসছিল। ১৯৩৭ সালে নেহরু, গান্ধীসহ বিভিন্ন নেতার সঙ্গে যোগাযোগ হয় শেখের। তিনি উপলব্ধি করেন, মুসলিম কনফারেন্স নামে নেহরু-গান্ধীসহ ভারতীয় নেতাদের সমর্থন পাওয়া যাবে না। তিনি দলের কাউন্সিলে বিষয়টি তোলেন। ১৯৩৯ সালে দলের নাম বদলে রাখা হয় জেঅ্যান্ডকে ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি)।[৬] তখনও মুসলমানদের জন্য আলাদা ভূ-খণ্ডের দাবিতে পাকিস্তান প্রস্তাবই (লাহোর) হয়নি। এনসি হওয়ার পর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস সেই আন্দোলনে বরাবরই সমর্থন দিয়েছে। নেহরুসহ ভারতীয় নেতারা মহারাজার স্বৈরতন্ত্রের বিপরীতে গণতন্ত্রের দাবি করেছেন সবসময়। মহারাজার জমিদারির বিরুদ্ধে আন্দোলনের কারণে শেখ আবদুল্লাহ ও তার দল এনসি কাশ্মীরে জনপ্রিয় হয়। শেখ আবদুল্লাহ ছিলেন বাগ্মী। তিনি ছিলেন আলীগড়ের এমএ। দলে তার ছিল ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু, নাম পরিবর্তনের পরও সে অর্থে হিন্দুদের ব্যাপক সমর্থন পাননি শেখ আবদুল্লাহ।

লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাবিত হওয়ার পর উপমহাদেশের রাজনীতি বদলে যায়। কংগ্রেস বলে সর্বজনীন ভারত। মুসলিম লীগ বলে পাকিস্তান-পাকিস্তান। আবার কংগ্রেসের সর্বজনীনতার স্লোগানের মধ্যেও সরদার প্যাটেলসহ একটা গ্রুপের মনে হিন্দু ভারতের স্বপ্নও বিকশিত হয়। প্রশ্ন ওঠে, জম্মু-কাশ্মীর কোথায় যাবে? ১. হিন্দুস্থান বনাম পাকিস্তান; ২. জমিদারি শোষণ থেকে মুক্তি– এই দুটি ইস্যু তখন একত্র হয়ে কাশ্মীরের রাজনীতিতে হাজির। শেখের স্লোগান ছিল, যোগদানের আগে স্বাধীনতা (Freedom before Accession)।[৬] আগেই বলেছি, জিন্নাহ

আশাবাদী ছিলেন। তিনি কম সক্রিয় ছিলেন। নেহরু উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি ছিলেন সক্রিয়। একদিকে নেহরু ও গান্ধী মহারাজার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক শেখকে সমর্থন করেছেন। অন্যদিকে প্যাটেলসহ ভারতীয় কংগ্রেসের হিন্দুত্ববাদী নেতারা মহারাজার সঙ্গে নীরব যোগাযোগ রেখেছেন। প্রভাবিত করেছেন।[৭]

ভারতে যোগদানপত্র যদিও সই করেন মহারাজা। কিন্তু, তার আগে শেখ আবদুল্লাহকে নেহরুর অনুরোধে মুক্তি দিতে হয়। ২৬শে অক্টোবর ১৯৪৭ মহারাজা যোগ দেন। আর ১৯৪৮ সালের ৫ই মার্চ মহারাজার ইতি ঘটে। নেহরু জেঅ্যান্ডকে'র 'মুকুট' পরান শেখ আবদুল্লাহকে। বিশেষ মর্যাদার রাজ্য হিসেবে ঘোষিত জেকে প্রধানকে দেওয়া হয় 'প্রধানমন্ত্রী' পদ।

নেহরুর 'বৈচিত্র্যময় ভারতে'র ধারণার প্রতি আস্থা রেখেছিলেন শেখ আবদুল্লাহ। আবদুল্লাহ নিজেও ছিলেন বৈচিত্র্যময়। একদিকে তিনি উপমহাদেশের প্রথম নেতা যিনি মুসলিম রাজনৈতিক দলের নাম বদলেছিলেন অন্য ধর্মের অংশগ্রহণ পেতে। আবার তিনিই স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যাপকভাবে জড়িত ছিলেন। তার রাজনীতির শুরুই হয়েছিল খানকাহ-এ-মওলায়।[৮] সমাবেশে গিয়ে তিনি পড়তেন সুরা রাহমান মর্মভেদী সুরে। তবুও, শেখ ছিলেন নেহরুর দৃষ্টিতে 'অ্যাসেট ফর ইন্ডিয়া'।

তখন, ১. 'প্রধানমন্ত্রী' হিসেবে শেখের শাসন অভ্যন্তরীণভাবে ছিল কর্তৃত্ববাদী। ১৯৫১ সালে রাজ্যে নির্বাচন হয়। তাতে ৭৫টি আসনের প্রত্যেকটিতেই নির্বাচন হয় প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন। আবদুল্লাহর সমালোচক কেউ ছিল না। ২. ভারতে গান্ধীর প্রাণ গেল। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা সহিংস হয়ে উঠল। 'হিন্দুত্ববাদ' বিকশিত হচ্ছিল জম্মুতে। ৩. আবদুল্লাহ-নেহরুর মধ্যে দেখা দিল আস্থার সংকট। ভারত থেকে স্বাধীন হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন শেখ, এমন সন্দেহ চাউর হলো। ওদিকে আবদুল্লাহও বুঝতে পারছিলেন, 'প্রধানমন্ত্রী'র পদাসীন হলেও কাঠি নাড়ে অন্য কেউ। ১৯৫৩'র ৯ আগস্ট নেহরুই কঠোর হস্তে আদর করে আবদুল্লাহকে পাঠালেন জেলে। আবদুল্লাহরই শিষ্য বকসি গোলাম মোহাম্মদকে বসালেন দিল্লির মর্জিতে উঠতে বসতে। ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র গুহ যাকে বলেছিলেন, 'আইনের শাসনের ব্যর্থতা'। অনেকে আবার বলেছেন, বৈচিত্র্যময় সেক্যুলার ভারতই ব্যর্থ হয়েছে সেদিন।

ভারত বিরোধিতা মানেই কি পাকিস্তানপ্রীতি

ভারতের প্রতি নাখোশ কাশ্মীরিরা। তাহলে কি তারা পাকিস্তানের পক্ষে? এটা একটা বাইনারি। এই বাইনারির সৃষ্টি হয়েছে ব্রিটিশদের ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্ট অ্যাক্ট-১৯৪৭ এর মাধ্যমে। সেখানে বলা আছে, ব্রিটিশ ভারতের প্রিন্সলি স্টেটগুলো দুটি ডমিনিয়নের (ভারত অথবা পাকিস্তান) যেকোনো একটিতে যেতে পারবে। সেখানে

তৃতীয় বিকল্প-স্বাধীনতার কথা ছিল না। বিতর্ক ছিল, যোগদানের প্রক্রিয়া নিয়ে। কেউ বলেছে, শাসক নিজে যোগ দেবেন। কেউ বলেছে না, জনগণকে গণভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্তের সুযোগ দিতে হবে। তবে, সেখানেও গণভোটের ক্ষেত্রে জনগণের সামনে বিকল্প থাকবে ২টা। ভারত অথবা পাকিস্তান। স্বাধীনতার কোনো সুযোগ জনগণকে দেওয়া হয়নি ওই আইনে। পরে জাতিসংঘ অন্তত ২৭টি রেজ্যুলেশন পাস করেছে কাশ্মীর বিষয়ে। ওই সব রেজ্যুলেশনে নানাভাবে বলা হয়েছে, ভাগ্য নির্ধারণের সুযোগ দেওয়া উচিত জনগণকে। কিন্তু, সেখানে জনগণের সামনে গণভোটে কয়টি বিকল্প থাকবে? এখনও প্রায় সব বিশেষজ্ঞ মনে করেন, আইন ও ইতিহাস অনুযায়ী বিকল্প দুটি: ভারত বা পাকিস্তান। কিন্তু, জনগণের কাছে 'আজাদি'র চেয়ে বেশি উচ্চারিত আর কোনো শব্দ এখন কাশ্মীরে শোনা যায় না।
ভারত থেকে প্রায়ই অভিযোগ ওঠে, কাশ্মীরিরা আজাদির নামে পাকিস্তানের মদতে অস্থিরতা সৃষ্টি করছে। আজাদির স্লোগানের পেছনে পাকিস্তানের ভূমিকা কতখানি তা আলোচনার আগে স্পষ্ট হওয়া দরকার পাকিস্তানের প্রতি মানুষের সমর্থন কেমন? আমার একাধিক বন্ধু বলেছিলেন, পাকিস্তান আমাদের কাছে দ্বিতীয় কাবার মতো। অপেক্ষাকৃত উদারপন্থী বন্ধুরা বলত, পাকিস্তান দেশ হিসেবে নানাভাবে সংকটাপন্ন। কিন্তু, সকল সমস্যা মাথায় নিয়েও পাকিস্তানই একমাত্র দেশ, কাশ্মীরিদের অধিকারের কথা বলে আসছে সবসময়। পাকিস্তানই এখনও কাশ্মীরিদের জাতিসংঘ ঘোষিত 'গণভোটের' দাবি আন্তর্জাতিক ইস্যু হিসেবে বাঁচিয়ে রেখেছে। হোকনা সেটা বদ উদ্দেশ্যে! যদি বিশ্বের অন্যসব দেশের মতো পাকিস্তানও কাশ্মীরিদের ভুলে যেত তাহলে কী হতো? এমনকি ভারতপন্থী রাজনৈতিক দলও পাকিস্তানকে অস্বীকার করতে পারে না। এক রাজনীতিক একবার ঠাট্টা করে বলছিলেন, 'আমরা ভারতে থাকতে চাইলেও তিনটি বিষয়ে আমাদের পাকিস্তানের পক্ষেই থাকতে হবে। এক. ক্রিকেট, দুই. ঈদের চাঁদ এবং তিন. নারায়ে তাকবির স্লোগান। আমরা ভারতকে বলি, এই তিন বিষয়ে আমরা পাকিস্তান। এতে তোমরা নাখোশ হয়ো না।'

আগেই বলেছি, শেখ আবদুল্লাহর জনপ্রিয়তা ছিল অনেক। ভারতকেই নিজের দেশ মেনেছিলেন শেখ। পাঠানদের আক্রমণ ঠেকাতে শেখের অনুসারী কাশ্মীরিরাই প্রতিরোধ শুরু করেছিল প্রথম। প্রশ্ন হলো, তাহলে এই পাকিস্তানপ্রীতির জন্ম হলো কিভাবে। হঠাৎ করেই মানুষ পাকিস্তানের প্রতি ঝুঁকে পড়েনি। মনস্তাত্ত্বিকভাবে কাশ্মীরিদের পাকিস্তানাইজেশন হয়েছে ধাপে ধাপে। 'মুসলমানরা ভাই-ভাই'– এই স্লোগান হলো পাকিস্তানাইজেশনের প্রথম ধাপ। ১৯৩৯ সালে যখন শেখ আবদুল্লাহ মহারাজার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আন্দোলনকে 'সার্বজনীন' করার জন্য মুসলিম

কনফারেন্সের নাম বদলে ন্যাশনাল কনফারেন্স করেন তখন দলের সেক্রেটারি ছিলেন চৌধুরী গোলাম আব্বাস। তিনি ছিলেন জম্মুর মুসলমানদের প্রতিনিধি। মনে রাখতে হবে, মুসলমানরা কাশ্মীরে সংখ্যায় বেশি, জম্মুতে তারা কম। সংখ্যালঘু হিসেবে জম্মুর উত্তর দিকের জেলাগুলোর মুসলমানরা ছিল সবদিক থেকে সবসময় অবহেলিত। সেই বাস্তবতা মাথায় রেখে চৌধুরী আব্বাস ন্যাশনাল কনফারেন্স থেকে সরে যান। তিনি কাশ্মীরি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন না। ফলে, তার এই রাজনৈতিক অবস্থান কাশ্মীরের জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। তিনি জম্মুর মুসলমানদের কাছেই মূল্যায়ন পেয়েছেন। বিপরীতক্রমে, শেখ আবদুল্লাহর অসাধারণ বাগ্মিতা এবং কাশ্মীরের বিভিন্ন খানকায় ইসলামী বক্তৃতা ও তেলাওয়াত তাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রশ্নে জনগণ শেখ আবদুল্লাহর কথা অন্ধভাবে মেনেছে। আর যেহেতু রাজনীতির কেন্দ্রে ছিল কাশ্মীর সেহেতু আবদুল্লাহর ভারতে যোগদানে কাশ্মীরিরা নিমরাজি হয়েছে। জম্মুর মুসলমানদের মতামত সেখানে খুব একটা কাজে লাগেনি। তবে, লাহোর প্রস্তাবের পর চৌধুরী আব্বাসের উদ্যোগে মুসলিম কনফারেন্স পুনরায় উজ্জীবিত হয়। তারা দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রচারণায় যুক্ত হয়। কাশ্মীরেও মীরওয়াইজ (কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ ও ঈদগাহের ঐতিহ্যবাহী ইমাম) পরিবার সেই মতের সমর্থক ছিলেন। ব্যাপক জনপ্রিয় না হলেও মৌলিকভাবে মুসলিম জনসংখ্যার কাছে মীরওয়াইজ পরিবারের গ্রহণযোগ্যতা ছিল। আবদুল্লাহ তখন ৮-১০ বছরের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের অধিকারী হঠাৎ জনপ্রিয় হয়ে ওঠা নেতা। আবদুল্লাহর এই নেতা হয়ে ওঠা মীরওয়াইজ' পরিবারের সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় নেতৃত্বের অবস্থানকে দুর্বল করেছিল। এসব কারণে এখনও মীরওয়াইজ পরিবার কাশ্মীরের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর এবং তা ন্যাশনাল কনফারেন্সের বিরোধী। মোদ্দাকথা, নেহরু-গান্ধীর রাজনৈতিক দর্শনের যেমন প্রতিনিধি ছিল এনসি, তেমনি মুসলিম লীগেরও উপস্থিতি খানিকটা ছিল এমসির মাধ্যমে। ফলে, কাশ্মীর যখন ভারতে যোগ দেয়, যাতে শেখ আবদুল্লাহ সমর্থন দেন, তখন খোদ এনসি'র অনেক নেতা দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন। শেখ আবদুল্লাহকে তারা বোঝাতে চেয়েছেন বিপরীত ভাবনার জন্য। অর্থাৎ, ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান প্রশ্নে উপমহাদেশব্যাপী যে দ্বিধা ছিল তা কাশ্মীরকেও স্পর্শ করেছিল। কিন্তু, আবদুল্লাহর তেজস্বী নেতৃত্বের কারণে সেই দ্বিধা বিস্ফোরণ আকারে দেখা যায়নি। তবে, সেই দ্বিধাই পাকিস্তানাইজেশনের বীজ হিসেবে রয়ে গিয়েছিল। সেটিই ক্রমে বিকাশ লাভ করে নানাভাবে। দ্বিতীয় কারণটি হলো ভৌগোলিক। ভারতীয় আইনজীবী এ জে নূরানী লিখেছেন, সকল মৌসুমে শ্রীনগরের সঙ্গে বাকি বিশ্বের যোগাযোগের একমাত্র রাস্তা ছিল পুরাতন রাওয়ালপিন্ডি রোড। কাশ্মীরের নদীগুলো বয়ে গেছে পাকিস্তানে। সকল ভৌগোলিক ব্যবস্থায়

কাশ্মীর পাকিস্তানের সঙ্গে মেলে'। কাশ্মীর থেকে বর্তমান রাস্তায় ভারতের মুম্বই সমুদ্রবন্দরের দূরত্ব ৩৩০০ কিলোমিটার। আর করাচি বন্দরের দূরত্ব ছিল ১২০০ কি.মি.। ব্যবসা বাণিজ্যের জন্যও পাকিস্তানের রাস্তাই কাশ্মীরিদের জন্য ছিল সুবিধাজনক। এই রাজনৈতিক অর্থনীতিও কাশ্মীরিদের পাকিস্তানাইজেশনের অন্যতম কারণ। তৃতীয়ত, জম্মুর সংখ্যালঘু মুসলমানরা অনেকেই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানি অংশে চলে গেছেন। জম্মুতে চৌধুরীর আব্বাসের কন্যাও নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন। চৌধুরী আব্বাস পরে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী হন। পাকিস্তানের অধিকৃত এলাকায় শেখ আবদুল্লাহর ব্যক্তিগত প্রভাবও ছিল কম। মোটকথা, ওই এলাকায় পাকিস্তানাইজেশন সহজ হয়েছে। বিপরীতক্রমে, ভারতীয় অংশে 'ইন্ডিয়ানাইজেশন' প্রক্রিয়া বারবার নানা কারণে ব্যর্থ হয়েছে। পরম বিশ্বস্ত শেখ আবদুল্লাহকেই বিশ্বাসঘাতক হিসেবে যখন জেলে পাঠানো হয়েছে তখন কাশ্মীরিরা আর ভারতের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারেনি। ইন্ডিয়ানাইজেশনের ব্যর্থতা পাকিস্তানাইজেশনে গতি এনেছে। আর জম্মুর হিন্দু নাগরিকেরা আরও জোরে আওয়াজ তুলেছেন কাশ্মীরকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করতে। ফলে, জম্মু আর কাশ্মীরের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব মাত্র একটি পাহাড় হলেও বাস্তবিক দূরত্ব হয়েছে অসীম।

এতকিছুর পরও প্রশ্ন হচ্ছে, কী পরিমাণ কাশ্মীরি পাকিস্তানের পক্ষে? স্পষ্টতই, ভারতীয় গণমাধ্যমের একাট্টা প্রচারণা হলো, সব কাশ্মীরিই পাকিস্তানপন্থী। এই প্রচারের মাধ্যমে ভারতীয় অ্যাকশনের বৈধতা দেওয়া যায়। এমনকি শেখ আবদুল্লাহকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল পাকিস্তানের সঙ্গে গোপন বৈঠকের অভিযোগে। বিপরীতদিকে, পাকিস্তানি গণমাধ্যমও দাবি করে, সব কাশ্মীরিই তাদের। এই দ্বিধার মধ্যে, ২০১০ সালে লন্ডনভিত্তিক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উভয় পাশে চালানো জরিপ বলছে, '৪৩ শতাংশ কাশ্মীরি স্বাধীনতা চায়। ১৫ শতাংশ পাকিস্তান, ২১ শতাংশ ভারত এবং ৭ শতাংশ লোক চায় বর্তমান অবস্থা।'[৯] আর, গণভোটের ব্যালটে স্বাধীনতার সুযোগ না থাকলে স্বাধীনতার প্রত্যাশীরা পাকিস্তানের পক্ষে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, গণভোট আদৌ হবে কিনা।

নোট/সূত্র

১. Srinath Raghavan (2013); 1971: *Global History of the Bangladesh War*, P1.
২. Sajad Padder (2015), *India-Pakistan Composite Dialogue Process*; New Delhi: Kalpaz; P 22-23.

৩. A G Noorani; *A Worked Compact*; Greater Kashmir (Nov 1, 2015); P11. /পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য : article 370 & India Constantia
৪. Greater Kashmir; August 9, 2015, Page 6.
৫. Sajad Padder (2015) reproduced from Ajit Bahttacharjea (1996)
৬. Sheikh Abdullah; *Flames of The Chinar* (1993)
৭. Khalid Bashir Ahmed; (2014); *Circa-1947: A long story*; http://www.kashmirlife.net.
৮. Mridu Rai; *The Hindu Rulers Muslim Subjects*; Permanent Black (2005)
৯. UK Chatham House Pole result taken from '*Reality Check: Who actually cares about the Kashmiris*?' Mehdi Hasan's Reality Check; Al Jajeera, August 6, 2016.

৮

শের-এ-কাশ্মীর

ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি) নেতারা এখনও বলেন, আমাদের অস্তিত্ব টিকে আছে শেখ আবদুল্লাহর অবদানের ওপর। আবদুল্লাহর বড় ছেলে ফারুক আবদুল্লাহ কাশ্মীরের চিফ মিনিস্টার ছিলেন। তার ছেলে ওমর আবদুল্লাহও চিফ মিনিস্টার ছিলেন ২০০৯-১৪ সময়ে। বর্তমানে রাজ্যের বিরোধীদলীয় নেতা তিনি। আবদুল্লাহর আরেক ছেলে মোস্তফা কামাল যুগ্ম সম্পাদক এনসির। যদিও কাশ্মীরের সিংহভাগ মানুষের কাছে আবদুল্লাহ হলেন, হয় বিশ্বাসঘাতক অথবা বাস্তবতা বুঝতে না পেরে নেহরুর প্রতি আস্থা রেখে ভারতে যোগ দেওয়ার পর বারবার প্রতারিত হওয়া হতভাগা। স্বভাবতই, শেখ আবদুল্লাহকে বোঝার জন্য আরেকটু গভীর আলোচনা জরুরি।

একজন বাংলাদেশি হিসেবে শেখ আবদুল্লাহকে (১৯০৫-১৯৮২) বুঝতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুকেই (১৯২০-১৯৭৫) তার পাশে দাঁড় করিয়েছি। মনে রাখা দরকার, গবেষণায় তুলনা করা মানেই এক করে দেখা নয়। তুলনা মানে হলো মিল-অমিল উভয়ের পর্যালোচনা। আর সেটি করতে হয় একই মাপকাঠিতে রেখে। এই দুই নেতাকে নিয়ে একটি তুলনামূলক গবেষণার প্রচেষ্টা করেছিলাম কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে।

সেটা করতে গিয়ে মূলত বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বকে বাংলাদেশের জাতীয় সীমানার বাইরে দক্ষিণ এশীয়ার জ্ঞানজগতে পৌঁছে দিতে সচেষ্ট হয়েছি। পাশাপাশি, শেখ আবদুল্লাহর অবদান আর সীমাবদ্ধতাগুলোকে উপলব্ধি করতে পেরেছি স্পষ্টভাবেই। দুই নেতাকে নিয়ে সেই বিষদ আলোচনার কিয়দাংশই তুলে ধরছি এখানে।

দুজন নেতারই নামের প্রথম শব্দ শেখ। উভয়ই জন্মেছিলেন মধ্যবিত্ত-মুসলিম পরিবারে। তারা বেড়ে উঠেছেন অমুসলিম প্রতিবেশী ও সহপাঠীদের সঙ্গে। একদিকে যেমন সামাজিকভাবে বহু সাম্প্রদায়িক বৈচিত্র্যের অভিজ্ঞতা পেয়েছেন অন্যদিকে তারা পেয়েছেন অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর হিন্দুদের তুলনায় পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজকে। তবে, রাজনৈতিকভাবে ব্রিটিশ আমলে বাংলার যে পরিপক্বতা ১৮৫৭'র সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে শুরু হয়েছে তেমনটা কাশ্মীরের হয়নি। ফলে

শেখ আবদুল্লাহর বেড়ে ওঠার সময় কাশ্মীর ছিল সে অর্থে রাজনীতিশূন্য। শেখ আবদুল্লাহ মক্তবে ধর্মশিক্ষা নিয়েছেন, তারপর স্কুল-কলেজ পেরিয়ে রসায়ন শাস্ত্রে এমএ করেছেন আলীগড় থেকে। ২৫ বছর বয়সে ১৯৩০ সালে তিনি কাশ্মীর ফিরে গিয়ে দেখেন সেখানে মুসলমানরা বৈষম্যের শিকার। তিনি মুসলমানদের অধিকারের পক্ষে কাজ শুরু করেন। তার আগে মুসলমান যুবকেরা ছিল অশিক্ষিত। এবার নতুন সমস্যা হলো, মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষিত বেশ কিছু যুবক আছে। কিন্তু, দেখা গেল শিক্ষিত হলেও তাদের চাকরির ক্ষেত্রে নানা রকম শর্তের অধীনে বঞ্চিত করা হয়। শেখ আবদুল্লাহ নিজেও মেডিকেল কলেজে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন কেবল ধর্মীয় পরিচয়ের কারণেই। চাকরিতেও তিনি একই বঞ্চনার শিকার হন। সেই বাস্তবতায় ১৯৩১ সালে তিনি রিডিং রুম পার্টি নামে একটি যুবসংগঠন শুরু করেন। ওই বছরই মহারাজার বিরুদ্ধে প্রথম ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন শুরু হয়। সেখানে, উর্দু আর কাশ্মীরি ভাষায় পারদর্শী আবদুল্লাহ তার বাগ্মিতার বলে কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেন। প্রসঙ্গত, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, শেখ আবদুল্লাহ দেশ ভাগের আগেই নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন; বঙ্গবন্ধু ১৯৪৭ সালে ছিলেন কেবল উদীয়মান এক ছাত্রনেতা। আবদুল্লাহ তার দলের নাম বদল করেছিলেন ১৯৩৯ সালে। পক্ষান্তরে, শেখ মাজিবুর রহমান তাঁর দলের নাম পরিবর্তন করেন অনেক পরে ১৯৫৫ সালে, ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগেরও আট বছর পর। মূলত, অসাম্প্রদায়িক চেহারা প্রমাণের জন্যই উভয় নেতা তাদের দলের নাম পরিবর্তন করেছিলেন। সেক্ষেত্রে শেখ আবদুল্লাহর উদ্যোগ ছিল 'র‍্যাডিক্যাল'। বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রে সেটা ছিল 'গ্রাজুয়াল'। ফলাফল হলো বাংলাদেশে এখনও অমুসলিমরা আওয়ামী লীগের দুর্ভেদ্য ভোট ব্যাংক হিসেবে পরিচিত। পক্ষান্তরে আবদুল্লাহর ন্যাশনাল কনফারেন্স প্রতীকীভাবে কিছু হিন্দু নেতা পেলেও বস্তুত তার দল হিন্দুদের আস্থা পায়নি কখনোই। বিজেপি, বিএইচপির (বিশ্ব হিন্দু পরিষদের) মতো সংস্থাই সবসময় হিন্দুদের জন্য কথা বলেছে, আস্থা পেয়েছে। ওই সব সংস্থা শেখ আবদুল্লাহকে তার ব্যক্তিগত ধার্মিকতার কারণে সন্দেহের তীরবিদ্ধ করেছে। মজার ব্যাপার হলো শেখ আবদুল্লাহ শুরু থেকেই পাকিস্তানকে অস্বীকার করেছেন। নেহরুর রাজনৈতিক দর্শনের সমর্থক ছিলেন তিনি। পক্ষান্তরে শেখ মুজিবুর রহমান ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন জিন্নাহ,

চিত্র ৮.১: শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ

সোহরাওয়ার্দী ও মুসলিম লীগের দাবির পক্ষে মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশ, পাকিস্তান, প্রতিষ্ঠায় এক ত্যাগী ও উদ্যোমী কর্মী হিসেবে।

দেশভাগের পর দুজনের তুলনা আরও তাৎপর্যপূর্ণ। আবদুল্লাহ ভারতকে মেনেছিলেন তার দেশ হিসেবে। ভারতের অধীনে থেকেই জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসন ছিল তার সর্বোচ্চ চাওয়া। স্বায়ত্তশাসনের চর্চা করতে গিয়েই তিনি চক্ষুশূল হলেন নেহরুর। নিক্ষিপ্ত হলেন জেলে। তারপর ক্রমান্বয়ে আরও আপস করেছেন, বা করতে বাধ্য হয়েছেন। ১৯৭৫ সালে তিনি ইন্দিরার সঙ্গে দিল্লি এগ্রিমেন্ট করেন। তার আওতায় মূলত কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসন আরও সীমীত হয়। তিনি মুখ্যমন্ত্রী হন। আগে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এখন তো ৩৭০ অনুচ্ছেদকে অনেকে একটুকরা কাগজ ছাড়া কিছুই মনে করে না। আবদুল্লাহ তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'আমি অনুতপ্ত'।[২] এভাবে শের-এ-কাশ্মীর আজ কাশ্মীরের অধিকাংশ মানুষের কাছে গাদ্দার-এ-কাশ্মীর হয়ে পড়েছেন। বিপরীতক্রমে, শেখ মুজিবুর রহমান স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে ক্রমান্বয়ে স্বাধীনতার দিকে ধাবিত করতে পেরেছিলেন। হয়েছেন 'বঙ্গবন্ধু'। কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতির অধ্যাপক গুল ওয়ানি আমার এই তুলনার প্রেক্ষিতে বলেছিলেন, 'স্বৈরতান্ত্রিক পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শেখ মুজিব কেন আন্দোলন করেছেন তা স্পষ্ট। পাকিস্তান সাংস্কৃতিকভাবে বিপরীতমুখী বাঙালিদের সম্মান করতে পারেনি। স্বৈরতান্ত্রিক কাঠামোতে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু, দুঃখের বিষয় হলো, গণতান্ত্রিক ভারতও কাশ্মীরিদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে ম্যানেজ করার ক্ষেত্রে একই পথে হেঁটেছে।'

বঙ্গবন্ধু থেকে শের-এ-কাশ্মীর। দুজনই তার মানুষের জন্য জেল খেটেছেন জীবনের বিরাট সময়। ত্যাগ স্বীকার করেছেন। কিন্তু, দুজনের জীবনের সবচেয়ে বড় তফাৎ সৃষ্টি হয়েছে 'জাতীয়তা'র রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির প্রশ্নে। দুজনই আলাদা জাতিসত্তার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। শেখ আবদুল্লাহ সেই জাতীয়তাকে 'জাতিরাষ্ট্রে' পরিণত করতে পারেননি। শেখ মুজিবুর রহমান পেরেছেন। তিনি হয়েছেন 'জাতির পিতা'। সেখানে এসেই দুই নেতার মধ্যে তুলনা শেষ করতে হয়। কারণ, একজন একটি বিরোধপূর্ণ এলাকার পরাধীন নেতা। অন্যজন স্বাধীনতা অর্জন করে দেশ গঠনের শুরুতেই প্রাণ দিয়েছেন পথভ্রষ্টদের হাতে।

নোট/সূত্র

১. Kashmir and South Asia Studies বিষয়ে এমএ ডিগ্রির চূড়ান্ত সেমিস্টারে লেখক ওই থিসিস লিখেছেন। এর শিরোনাম হচ্ছে, Leadership in Political Movements: Comparative Study of Sheikh Mohammad Abdullah and Sheikh Mujibur Rahman. প্রায় শত পৃষ্ঠার গবেষণাপত্রটি কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।

২. শেখ আবদুল্লাহর আত্মজীবনী আতশ-এ-চিনার (উর্দু) এর ইংরেজি অনুবাদের নাম Flames of The Chinar (1993)। হাজার পৃষ্ঠার সুদীর্ঘ উর্দু বইটির ইংরেজি সম্পাদনা করেছেন খুশবন্ত সিং। ইংরেজি বইটি খুবই সংক্ষিপ্ত। মাত্র ১৭২ পৃষ্ঠার। এই অধ্যায়ের তথ্যাবলী দেখুন তার পৃষ্ঠা ৪-৭, ১৭, ৪৬-৫০, ৫৭, ১৬৪।

৯

বন্দুকের নল ও আজাদির স্বপ্ন

কাশ্মীরে সশস্ত্র পন্থার শুরু হয় ১৯৮৮ সালে। এর আগে ক্ষোভ-বিক্ষোভ ছিল।

চিত্র ৯.১: কারফিউ কিংবা হরতালের দিনে শ্রীনগর শহরের দৃশ্য

পাকিস্তানের পতাকা উঠিয়ে 'তেরি জান, মেরি জান/পাকিস্তান পাকিস্তান' স্লোগানও হয়েছে। এখনও মাঝেমধ্যে হয়। কিন্তু, সশস্ত্র পন্থা ছিল না। ১৯৫৩ সালে শেখ আবদুল্লাহকে গ্রেপ্তারের পর তার দল ন্যাশনাল কনফারেন্সকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। পরে শেখ-এর এক সাগরেদ মির্জা আফজাল বেগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গণভোটের দাবিতে পিলবিসাইট ফ্রন্ট। ১৯৬৪ সালে শেখকে মুক্তি দিয়ে পাকিস্তান পাঠিয়েছিলেন নেহরু। উদ্দেশ্য ছিল দুই দেশের মধ্যে শেখের উদ্যোগে আলোচনার মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যার একটা সমাধান হবে। কিন্তু, যখন শেখ পাকিস্তানে পৌঁছালেন তখনই নেহরু মারা গেলেন। আলোচনা ভেস্তে গেল।[১] এরপর থেকে

শেখও গণভোটের দাবিতে সোচ্চার ছিলেন। এরই মধ্যে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হলো ১৯৬৫ সালে কাশ্মীর নিয়ে। তাসখন্দ ঘোষণার মাধ্যমে যুদ্ধ থামল।[২] আবদুল্লাহ তখনও আশা করেছিলেন গণভোট পাবেন। কিন্তু পাননি। বরং নিক্ষিপ্ত হয়েছেন জেলে।

১৯৭১ সালে শুরু হলো বাংলাদেশ যুদ্ধ। শেখ আবদুল্লাহ লিখেছেন, '১৯৭১-এ যুদ্ধের মাধ্যমে দুর্ভাগ্যজনকভাবে সকল উদ্যোগ বন্ধ হয়ে গেল'।[৩] শিমলায় চুক্তি হলো ১৯৭২-এ। তাতে বলা হলো, দুই দেশ তাদের মধ্যকার বিভেদগুলো শান্তিপূর্ণ উপায়ে 'দ্বিপক্ষীয়ভাবে' অথবা 'দুই পক্ষের ঐক্যমতে অন্য কোনোভাবে' সমাধান করবে। কিন্তু সমাধান হলো না। বরং, ভারতীয় রাজ্য হিসেবে জম্মু-কাশ্মীরে ভোটের ঘোষণা দিলেন ইন্দিরা গান্ধী। শেখ আবদুল্লাহর দল তখনও নিষিদ্ধ। তাই তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেনি। ইন্দিরা গান্ধীর তত্ত্বাবধানে সরকার গঠন করল কংগ্রেস। আবদুল্লাহ দিল্লিকে জানালেন, 'ভারতে যোগ দেওয়া নিয়ে আমার কোনো দ্বিমত নেই। আমি শুধু চেয়েছিলাম ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৩৭০ (স্বায়ত্তশাসন) তার মূল অবস্থায় বহাল থাকুক।'[৪] ১৯৭৫ সালে তিনি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কাশ্মীর অ্যাকর্ড স্বাক্ষর করলেন। আবদুল্লাহ নতুন নির্বাচন চাইলেন। ইন্দিরা ছিলেন 'অনাগ্রহী'। তিনি কংগ্রেসের সংসদীয় কমিটির মিটিংয়ে আবদুল্লাহকে টেকনোক্র্যাট হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী বানালেন। আবদুল্লাহ বলছেন, 'আমি সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছিলাম, কিন্তু দ্রুতই আমাকে অনুতপ্ত হতে হয়েছিল'।[৪] পরে ১৯৮২ সালে নির্বাচন হয় রাজ্যে। আবদুল্লাহ এবার বিজয়ী হন। তার ন্যাশনাল কনফারেন্স পুনরায় চালু হয়। বলা হয়ে থাকে কাশ্মীরের ইতিহাসে এই হচ্ছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন। ১৯৮৩ সালে আবদুল্লাহর মৃত্যু হলো। তার ছেলে ফারুক আবদুল্লাহ হন মুখ্যমন্ত্রী। মনে করা হচ্ছিল ভারতবিরোধিতা চুপসে গেছে। দিল্লির ইচ্ছায় চলছে সবই। আবদুল্লাহ পরিবারও দিল্লির অধীনে ভালভাবেই চালাচ্ছে কাশ্মীর। এরপরই হঠাৎ সব গোলমেলে হয়ে গেল। ঘরে ঘরে যুবকেরা তুলে নিল অস্ত্র।

শান্তি অধ্যয়নের প্রতিষ্ঠাতা ইয়োহান গালটুংসহ গবেষকরা কোনো সংঘাতের তিন ধরনের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। ১. মূল কারণ (Root cause), ২. প্রভাবক কারণ (Accelerating Cause) ও ৩. বিস্ফোরক কারণ (Trigger Cause)। যে কোনো সংঘাত নিরসনে এই কারণগুলো সুচিহ্নিত করা জরুরি। ব্রিটিশ ও মহারাজার ভূমিকা, পাক-ভারত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ এবং ১৯৪৭-এর রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অসচ্ছতা—এগুলো কাশ্মীর সমস্যার মূল কারণ। ক্রমে সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা প্রভাবিত হওয়া, কাশ্মীরি নেতাদের সঙ্গে ভারত ও পাকিস্তানের আস্থার সংকট, পাকিস্তানাইজেশন, কাশ্মীরিদেরকে নিয়ন্ত্রণের ভারতীয় প্রচেষ্টা আর আইনের শাসন

দিতে অসামর্থ্যতা– ভারতের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হওয়ার প্রভাবক কারন। এসব কারণ ক্ষোভ বৃদ্ধি করেছে। সমস্যা সৃষ্টি করেছে। সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য এগুলোর অবসান দরকার। কিন্তু, হাজার হাজার যুবকের হঠাৎ করে সশস্ত্রপন্থা গ্রহণের কারণ এগুলো নয়। এর বিস্ফোরক কারণটি হলো, ১৯৮৭ সালের নির্বাচন। ওই নির্বাচনটিতে ব্যাপকমাত্রায় কারচুপি হওয়ার পরই বিরোধী মহল ব্যালটের প্রতি আস্থা হারিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল বুলেট আর বন্দুকের ছায়ায়। নির্বাচনটি সম্পর্কে কাশ্মীরি সাবেক জেলা জজ ও লেখক জিএন গওহর মন্তব্য করেছেন, 'চরমতম জোচ্চুরি', যা ব্যাখ্যা করার জন্য 'রিগিং শব্দটি খুবই সংকীর্ণ'।[৫] ওই নির্বাচনে রাজিব গান্ধীর সঙ্গে ফারুক আবদুল্লাহর একটি 'সমঝোতা' হয়েছিল বলে জনগণ বিশ্বাস করে। তাতে ন্যাশনাল কনফারেন্সের বিরোধী সকল পক্ষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলিম ইউনাইটেড ফ্রন্ট (এমইউএফ) নামে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। তারা ৭৫টি আসনের মধ্যে মাত্র পাঁচটি আসনে বিজয়ী হয়েছিল। পরে, নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগে তারা সংসদ থেকে পদত্যাগ করে। এর পরই ইয়াসিন মালিক, মকবুল ভাটসহ চার-পাঁচজন যুব নেতা জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট (জেকেএলএফ)-এর ব্যানারে সশস্ত্র পথে ছুটে যায়। জিএন গওহর লিখেছেন, 'নির্বাচনটি কাশ্মীরিদের এমন একটা ধারণা দিয়েছিল যে শাসক নির্ধারণে তাদের কোনো অধিকার নেই। এই হতাশাজনক পরিস্থিতিতে যুবকরা সীমান্তের ওপারে ছুটে যাওয়া ছাড়া' আর কোনো উপায় খুঁজে পায়নি। সশস্ত্র বিদ্রোহ তখন একটা 'কালচার' হয়ে দাঁড়ায়। 'গানকালচার'। প্রতিবাদ 'পাথর গ্রেনেড দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়'। 'কাংড়িগুলো (উষ্ণ কয়লাভর্তি মাটির পাত্র) মিসাইলে রূপ নেয়'।

এই চরমপন্থার রাষ্ট্রীয় প্রতিক্রিয়াও ছিল বন্দুক। বন্দুকের বিরুদ্ধে বন্দুক। সহিংসতার বিরুদ্ধে সহিংসতা। মহারাজার ভারতে যোগদানের শর্তে প্রথম ভারতীয় সৈন্যবাহিনী শ্রীনগরে পৌঁছেছিল ১৯৪৭ সালের ২৬ অক্টোবর। পরে ১৯৫০ সালে অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় আধাসামরিক সিআরপিএফ ব্যাটালিয়ন কাশ্মীরে যায়। ১৯৮৯ সালে বিদ্রোহ বেড়ে উঠলে ব্যাটালিয়নের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৯৯২ সাল নাগাদ ১২৯টি কোম্পানি সেখানে নিযুক্ত হয়। সম্প্রতি সেখানে ৪৭টি ব্যাটালিয়ন অবস্থান করছিল। গত ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ সময়ে চলমান অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণে আরও ১০২টি কোম্পানি পাঠানো হয়। ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে ইন্টারন্যাশনাল পিপলস ট্রাইব্যুনাল কাশ্মীর (আইপিটিকে) এবং এসোসিয়েশন অব প্যারেন্টস অব ডিসএপিয়ারড পারসনস (এপিডিপি) যৌথ উদ্যোগে মানবাধিকার পরিস্থিতির ওপর একটি বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ করে। সে অনুসারে, এখনও ভারতীয় সেনাবাহিনী, বিএসএফ, ইন্দো-তিব্বটিয়ান বর্ডার ফোরস (আইটিবিএফ), সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ), এবং জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ ফোর্স মিলে মোট নিয়োজিত সরকারি নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য ৬ লাখ ৫৬ হাজার ৬৩৮ থেকে ৭ লাখ ৫০ হাজার ৯৮১ জনের মতো।[৬] সে হিসেবে

পুরো রাজ্যে গড়ে প্রতি ১৬/১৭ জনে একজন করে নিরাপত্তারক্ষী নিয়োজিত রয়েছে। কিন্তু, তাতে সমস্যার সমাধান হয়নি। বন্দুকের ব্যবহার কমলেও চরমপন্থা বেড়েছে। একজন ভারতীয় সেনা কমকর্তা একবার বলেছিলেন, 'সৈন্যরা চরমপন্থীকে হত্যা করতে পারে কিন্তু চরমপন্থা হত্যা করতে পারে না'।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই সশস্ত্র পন্থায় গিয়ে কাশ্মীরিদের কেমন মূল্য দিতে হয়েছে এবং হচ্ছে। নিহতের পরিসংখ্যান এখানে লেখা জরুরি নয়। তাছাড়া, পরিসংখ্যান নিয়ে রাজনীতি হয় সবচেয়ে বেশি। সংখ্যার চেয়ে গভীরতা অনুভব করাই শ্রেয়। তেমনই কিছু তথ্য তুলে ধরা যাক এবার।
১৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৫। বারামুলা জেলার সোপুর এলাকার ঘটনা। মাগরিবের নামাজ শেষ করে মসজিদ থেকে বেরিয়েছেন বশির আহমেদ। তিনি ৯০ দশকের শুরুতে ছিলেন হিজবুল মুজাহিদীনের যোদ্ধা। গ্রেপ্তার হয়ে জেল খেটেছিলেন তিন বছর। তারপর, জঙ্গি রাস্তা ছেড়ে গৃহস্থালিতে মন দিয়েছেন দেড় দশক আগে। বিয়ে করেছেন। ছেলে বুরহান তিন বছর পেরিয়ে স্কুলে যায়। স্ত্রীর কোলে ১৫ মাসের মেয়ে 'হুরাইন'। ছেলেকে কোলে নিয়ে বশির যাচ্ছিলেন দোকানে। গ্রামের মধ্যেই, সন্ধ্যার আলো আঁধারিতে অজ্ঞাতপরিচয় মোটরসাইকেল আরোহী গুলি করল বশিরকে। স্পটডেড! কোলে থাকা শিশু বুরহান কিছু বুঝে ওঠার আগেই দ্বিতীয় গুলি। শিশুটির তলপেট ফেটে গিয়েছে। হাসপাতালে নেয়া হলো। রাতভর অপারেশন হলো। ডাক্তার বললেন, স্যরি!
স্বাধীনতার এক অদ্ভুত চেতনায় অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন বশির আহমদ আড়াই দশক আগে। ফের জীবনের টানে অস্ত্র ফেলে স্বপ্ন দেখলেন তিনি। ছেলের বাবা হলেন। মাটিতে মিশে গেল সব আশা। বাবার দাফন হয়েছে শুক্রবার। পরের দিন সন্তানের জানাজা হলো। স্কুলের শিশুরা তাদের বন্ধুর জানাজায় এসে হাজির হয়েছে দলবেঁধে। বশিরের ভাই খবরের কাগজকে জানায়, এর আগে মেজো ভাইকে হারিয়েছে তারা। তার নাম ছিল ফেরদৌস। অনেক দিন ছিল নিখোঁজ। খবর পেয়েছিল, রাজৌরির এক ক্রসফায়ারে তার মৃত্যু হয়েছে।[৭] একই পরিবারের দু'ভাই আর ছোট্ট ছেলে বুরহান হরিয়ে গেছে বুলেটের ঘায়ে। বাকি দু'ভাই এখন কী করবে? মৃত্যুর প্রস্তুতি নেবে? নাকি স্বপ্ন দেখবে বেঁচে থাকার? এই দ্বিধা কাটছে না।
কাশ্মীরে একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়, এখানে কে কাকে হত্যা করে তা কেউ জানে না। বিশ্লেষকরা বলেন, এ হলো একটি সীমিতমাত্রার যুদ্ধক্ষেত্র (Low intensity war zone)। এখানে যুদ্ধও চলছে জীবনও চলছে। মানুষের মৃত্যু সেখানে রুটিনাইজড।
এই লেখক কাশ্মীর পৌঁছে ৬ জুন, ২০১৪ তারিখে। এর তিন দিন পরই কাশ্মীরে হিজবুল মুজাহিদীনের এক কমান্ডার ক্রসফায়ারে মারা যান। ওই কমান্ডার নিহত হওয়ার কয়েক মাস আগে কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিল। এমএ প্রথম বর্ষ শেষ করে সে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যায়। ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ নিহত হওয়া

আরেক তরুণ সোপিয়ান জেলার আশিক হোসেন দার। তুর্কিওয়াঙ্গাম গ্রামের ওই যুবক সেদিন প্রত্যুষে নিহত হন হেফ গ্রামে সংঘটিত এক ক্রসফায়ারে। ২০১৪ সালের মে মাসে সে ভিলেজ লেভেল ওয়ার্কারের চাকরিতে যোগ দিয়েছিল। তিন মাস পরই সে যোগ দেয় হিজবুল মুজাহিদীনে। ইংরেজি সাহিত্যে এমএ ও বিএড পাস করা ওই যুবক শিক্ষা বিভাগ, রেভিনিউ, সিপিএডি ও হর্টিকালচার বিভাগে চাকরির পরীক্ষা দিয়ে প্রত্যেকটিতে উত্তীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু, এসবের চেয়ে সশস্ত্র পথ তার কাছে আকর্ষণীয় হলো। সেখানেই ক্ষয়ে গেল তার জীবন। এই ঘটনার দুদিন আগে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে এক প্রতিবেদনে বলা হয়, উচ্চশিক্ষিত তরুণদের জঙ্গি দলে যোগদানের প্রবণতা খুবই ভয়াবহ ও উদ্বেগের বিষয়।

এগুলো বিচ্ছিন্ন, আবার অবিচ্ছিন্ন ঘটনা। এগুলোর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়, গানকালচার কমে গেলেও একেবারে বন্ধ হয়নি। ভারতীয় বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার তথ্যমতে গোটা জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরে এখন সশস্ত্র বিদ্রোহীর সংখ্যা দুইশ'-চারশ'র মতো। এ থেকে উপলব্ধি করা যায়, সশস্ত্র গ্রুপে সশরীরে যোগ দেওয়া মিলিট্যান্টের সংখ্যা হয়তো কমে গেছে। কিন্তু, ভারতের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ মানুষের সংখ্যা কমেনি। নিহত জঙ্গির প্রতি সমবেদনা ও সমর্থন জানানোর মানুষের সংখ্যাও কম নয়।
সাম্প্রতিক সময়ের আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, একবার জানা গিয়েছিল, ইদানীং মিলিট্যান্সিতে যোগদানের জন্য প্রথম শর্ত হলো, সরকারি বাহিনীর কোনো সদস্যের কাছ থেকে অস্ত্র ছিনতাই করতে হবে। এবং, প্রায়ই খবরের কাগজে পুলিশের অস্ত্র ছিনতাইয়ের খবর পাওয়া যায়। আরও লক্ষণীয়, ইদানীংকালের নিহত হওয়া মিলিট্যান্টদের অধিকাংশই এক বছর বা দুই বছর আগে যোগ দিয়েছে। কেউবা মাত্র ছয় মাস আগে যোগ দিয়েছে। অর্থাৎ, তারা পুরনো বা অভিজ্ঞ মিলিট্যান্ট নন। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, ওই সব নতুন বিদ্রোহী লাইন অব কন্ট্রোল পেরিয়ে ওপারে গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে আসার খবর তেমন একটা পাওয়া যাচ্ছে না। তাছাড়া, আগের মতো প্রকাশ্য সহায়তা পাকিস্তানের ওপাশ থেকে এখন দেওয়া হয় না। ভারতীয় প্রহরাও বেশ কড়া বলে জানা যায়। ফলে, অনুমান করা যেতে পারে যে, ওই সব মিলিট্যান্ট ভারত শাসিত জেঅ্যান্ডকের মধ্যে কোথাও ট্রেনিং নেয়। দক্ষিণ কাশ্মীরের ত্রাল এলাকার পাহাড়ি জঙ্গলে বুরহান মুজাফফার ওয়ানি (৮ জুলাই, ২০১৬ তারিখে নিহত) প্রায় ছয় মাস ধরে অবস্থান করেছেন উল্লেখ্য, ত্রাল এলাকাটির সঙ্গে পাকিস্তান সীমান্তের কোনো সংযোগ নেই। সেখানকার জঙ্গলে বসে সশস্ত্র ছবি তুলে ফেসবুকে প্রচার করেছেন বুরহান। আর সেসব ছবি দেখে কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন এলাকায় 'বুরহান ভাই আগে বাড়ো, হাম সব লোক তোমহারা সাথ হ্যায়'– এমন স্লোগান হয়েছে। এসব বিষয়ের কারণে কাশ্মীরের মিলিট্যান্সির বিষয়টিকে বেশ জটিল মনে হয়। তবে, সন্দেহাতীত বিষয় হলো, কাশ্মীরিদের ভারত-বিরোধীতা শতভাগ সমর্থন করে পাকিস্তান।

যাই হোক, সংঘাতের কারণে মৃত্যুর আলোচনা চলছিল। বিষয়টির বর্তমান অবস্থা বুঝতে খবরের কাগজে আসা নিহতের সংখ্যার একটি টালি করেছিলাম এক মাসের জন্য। সে অনুসারে সেপ্টেম্বরে (২০১৫) কাগজে প্রকাশিত অপমৃত্যুর মোটসংখ্যা ২৯। এর মধ্যে ১৬ জন সশস্ত্র বিদ্রোহী। পাঁচজন নিরস্ত্র নাগরিক, দুজন শিশু, পাঁচজন সৈন্য বা পুলিশের সদস্য। একজনের মৃত্যু হয়েছিল সীমান্তে পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে গুলিবিনিময়ে। ওই মাসটি হলো তুলনামূলক একটি স্বাভাবিক মাস সেখানকার।

ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা রাজ্য সরকারের একটি রিপোর্ট বলছে, ২০১২-২০১৫ সালের মধ্যে দুই লাখ ১৫ হাজার ১১০টি পরিবার সীমান্তে গোলাগুলির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর জম্মু এলাকার সীমান্তবর্তী ৪৪৮টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত। সীমান্তের ভারতীয় অংশে বসবাসকারী মোট জনসংখ্যা পাঁচ লাখ। মোট গ্রাম ৫৯০টি। যার মধ্যে ৪৪৮টি হুমকির মুখে থাকে সবসময়। আন্তর্জাতিক সীমান্ত ও লাইন অব কন্ট্রোলের[৮] পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে ভারতীয় অংশে বসবাসকারী মোট জনসংখ্যা ৫ লাখ ৩২ হাজার ১৪৪ জন। কাঠুয়া, সামবা, জম্মু, পুঞ্চ, রাজৌরি এই পাঁচটি জেলা সীমান্ত বরাবর রয়েছে।[৯] হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল এক ডকুমেন্টারিতে সাফল্যের গল্প হিসেবে তুলে ধরেছিল গুলজার আহমেদ নামে এক বৃদ্ধকে। তিনি ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে দুটি পা হারিয়েছিলেন। এখন কৃত্রিম পায়ের সাহায্যে হেঁটে বেড়ান। সংস্থাটির তথ্যমতে, ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা ২০৬৪ জন।[১০]
কাশ্মীর ভ্যালিতে ১৯৮৬ সালে একটি মাত্র এতিমখানা ছিল। এখন চলছে ৭ শতাধিক। কোনোটা ব্যক্তি উদ্যোগে, কোনোটা ট্রাস্ট, আবার কোনোটা রাজ্য চালিত। সেভ দ্যা চিলড্রেনের জরিপ[১১] অনুসারে ভ্যালিতে দুই লাখ ১৫ হাজার এতিম শিশু আছে, যাদের ৩৭ শতাংশ সংঘাতের কারণে মা-বাবা বা উভয়কে হারিয়েছে। ১৫ শতাংশের বেশি এতিম এতিমখানায় থাকে। বাকিরা কোনো সহায়তা ছাড়াই আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে থাকে। এদের বলা হয় অরফানস অব কনফ্লিক্ট। আরেকটি জরিপ অনুসারে, এতিমাখানার ৪০ শতাংশের বেশি শিশু নানা মানসিক সমস্যায় ভোগে, যা সমাধানে কোনো ব্যবস্থা নেই।

লক্ষণীয়, সেখানে সংঘাত শুরু হয়েছে তিন দশকের বেশি হলো। অর্থাৎ, এখনকার যুবকদের জন্ম এর মধ্যেই। এর মধ্যেই বেড়ে ওঠা তাদের। তারা শান্তির সময় দেখেনি। তাদের কাছে মৃত্যু স্বাভাবিক। যে কোনো সময় এখানে-ওখানে তাদের ভাই-বন্ধুর মৃত্যু হয়। সুতরাং, এই যুব সমাজকে গঠনমূলক সামাজিক কার্যক্রমে যুক্ত করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া কিভাবে সম্ভব? এ নিয়ে তেমন আলোচনা নেই। ভারতীয় সেনাদের 'সদ্ভাবনা প্রকল্প' আছে। কাশ্মীর থেকে যুবকদের নেওয়া হয়

শিক্ষা সফরসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। সেই সুযোগগুলোকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা হয় সন্দেহের চোখে। জনগণের কাছে ওইসব সম্ভাবনা প্রকল্প এখনও 'বন্দুকের নলে গোলাপ'-এর মতো।

শোপিয়ান জেলার এক যুবক যেমনটা বলছিল, সে রসায়ন শাস্ত্রে মাস্টার্স। তার বাবা নিহত হয়েছেন ১৯৯৫ সালে। বড় ভাই নিহত হয়েছেন, ১৯৯৬ সালে। পরিবারের সে সবার ছোট। তারা চার ভাই বেঁচে আছে। তাদের সংসার চলে আপেল বাগানে। বলছিল, 'পরিস্থিতি আমাদের সবসময় টানে অস্ত্র তুলে নিতে।'

৮ ও ৯ আগস্ট, ২০১৫ কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় শিক্ষার্থীদের। আলোচনার বিষয় ছিল লিডারশিপ ও উদ্যোক্তা তৈরি। আলোচক প্রশ্ন করেছিলেন, লিডার শব্দটি শুনলেই আপনাদের সামনে কোনো ছবি ভেসে ওঠে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক দর্শক সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিল, গিলানী সাহাব। ওই অনুষ্ঠানে সরকারি প্রতিষ্ঠান জেঅ্যান্ডকে এন্টারপ্রেনরশিপ ডেভলপমেন্ট ইনস্টিটিউটের এক কর্মকর্তা এসেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সবাইকে সরকারি চাকরি দেওয়া সম্ভব নয়। স্বাবলম্বী হওয়ার গুরুত্ব বর্ণনা করেছিলেন তিনি। এজন্য দ্বাদশ শ্রেণি থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষিত বেকার যুবকের সহজ শর্তে এত এত টাকা ঋণ দিচ্ছে সরকার- এ খবর দিলেন তিনি। যারা আগ্রহী তারা তাদের নিজস্ব উদ্যোগের পরিকল্পনা নিয়ে আসলেই ঋণ দেওয়া হবে।

এক শিক্ষার্থী প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা! আমি টাকা ঋণ নেবো। কাল আমি গুলি খেয়ে মরে গেলে আমার ঋণ কে পরিশোধ করবে? আমার নিরাপত্তা কী আপনার প্রতিষ্ঠান দেবে?' এই প্রশ্নের কোনো জবাব সরকারের কাছে নেই। রাজ্য সরকার সেখানে বড় অসহায়। এই অসহায়ত্বের মধ্যেই বেড়ে উঠছে সেখানকার যুবসমাজ।

এত মন্দের মধ্যেও বেশ কিছু অবহেলিত ভাল খবরের সন্ধান মেলে আশাজাগানিয়া। যেমন, জায়েদের নামে এক যুবকের কাণ্ড। সে নিজের ঘরে বসে বিভিন্ন এনিমেটেড ভিডিও তৈরি করে ফেসবুকে ছেড়ে দেয়। তার ভাষায় এর উদ্দেশ্য হলো, '২৫ বছরের সংঘাত আমাদের দুঃখী ও গোমড়ামুখো বানিয়েছে। আমি মানুষকে একটু হাসাতে চাই'। মানুষকে হাসানোর এই শখ থেকেই সে তৈরি করে ছোট ছোট কার্টুন ভিডিও। এটি সে করে কেবলই শখে। কোনো বাণিজ্যিক ব্যবস্থা ছাড়াই। ২০১৪ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের নেতারা তাকে প্রস্তাব দিয়েছিল ভিডিও বানিয়ে দিতে। তাতে রাজি হয়নি জায়েদ।[১২] এভাবে সাউথ কাশ্মীরে উবাইদ হায়দার নামে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক কিশোরের সন্ধান দিয়েছিল খবরের কাগজ। ওই কিশোর কাশ্মীরের প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত গোটা ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছে একটি বইয়ে। যেটি প্রকাশিত হয়েছে ২০১৫ সালে।

মোদ্দাকথা, কাশ্মীরে এখনও আপেল গাছে সাদা ফুল ফোটে বসন্তে। শীতের আগে, হেমন্তে, লাল আপেলের ভারে নুয়ে পড়ে সবুজ গাছ। বাক্স ভরে বিক্রি হয়। মানুষের হাতে আসে টাকা। গাছের পাতারা ঝরে পড়ে শীতে। তুষারপাত হয়। ন্যাড়া গাছেরা ফের সবুজ হয়ে জেগে ওঠার নিশ্চয়তা পায় প্রকৃতির কাছ থেকে। কিন্তু, মানুষের জীবন চলে অনিশ্চয়তায়। এ অবস্থায়ও আশার কথা শুনিয়েছিলেন কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্বের এক গবেষক। তিনি জানান, 'উত্তর কাশ্মীরে (সোপুর) আমাদের গ্রামে প্রায় প্রত্যেক ঘরে কেউ না কেউ নিহত হয়েছে। আমার স্কুলজীবনের বন্ধুদের মধ্যে কেউ বেঁচে নেই। কারও মৃত্যু নিজের চোখে দেখেছি। কেউ হয়েছে নিখোঁজ। একমাত্র আমি বেঁচে আছে। আমি ডক্টরেট করেছি। এখনও আমি আশা করি কাশ্মীর একদিন ফিরবে স্বাভাবিক অবস্থায়। হয়তো, শিগগিরই অথবা শতাব্দী সময় পর।'

নোট/সূত্র

১. Sheikh Muhammad Abdullah (1993); *Flames of the Chinar*, Pp: 154-55.

২. Srinath Raghavan (2013); 1971: *The Global History*; Prologue; Pp: 1-13.

৩. প্রাগুক্ত; পৃ: ১৬২-৬৩

৪. প্রাগুক্ত; পৃ: ১৬৩-৬৭

৫. G.N. Gauhar; *Military Operation in Kashmir* (2001); Pp: 136-142.

৬. Javid Iqbal; *Structured Violence: A report*; Greater Kashmir (19th Sep, 2015); P11.

৭. Greater Kashmir, Sep 20, 2015; P: 1.

৮. আন্তর্জাতিক বর্ডার আর লাইন অব কন্ট্রোল এক নয়। দুই দেশের মধ্যে মীমাংসিত সীমানা হলো আন্তর্জাতিক বর্ডার। পাঞ্জাব পর্যন্ত এমন সীমানা রয়েছে। আর জম্মু ও কাশ্মীরের ওপর দিয়ে টানা দুই দেশের যে অমীমাংসিত যভ বিরোধপূর্ণ সীমান্ত, যা কাশ্মীরকে বিভক্ত করেছে তাকে বলা হয় 'লাইন অব কন্ট্রোল বা এলওসি'।

৯. যোগেশ সগোত্রা; গ্রেটার কাশ্মীর (ডিসেম্বর ১৬, ২০১৫); পৃষ্ঠা:১৬

১০. ৩ নভেম্বর, ২০১৫; ভিন্নভাবে সক্ষমদের জন্য আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান, কনভোকেশন হলো, কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে লেখক উপস্থিত ছিলেন।

১১. মুদাসির ফেরদৌসি, *অরফানস অব কনফ্লিক্ট*, গ্রেটার কাশ্মীর (১২ আগস্ট, ২০১৫); পৃষ্ঠা ৯

১২. Kashmir Life; August 9, 2015; P: 15-21.

১০
আজাদি ও ইসলামী রাজনীতি

জনসংখ্যার সিংহভাগ মুসলিম। সমাজের নানা কর্মকাণ্ডে ইসলামের উপস্থিতিও চোখে পড়ার মতো। বিশেষত জনবহুল কাশ্মীর ভ্যালি ও জম্মুর মুসলিম অধ্যুষিত ৪/৫টি জেলায়। স্বভাবতই, সশস্ত্র 'আজাদি সংগ্রামে'র সঙ্গে ইসলাম ও ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। সেক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামীই আলোচনা পর্যালোচনার কেন্দ্র হওয়ার কথা। কারণ, এই দলটি দক্ষিণ এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশেই ইসলামী রাজনীতির প্রতিনিধিত্বের দাবিদার[১]। বিশ্বব্যাপী রয়েছে তাদের আদর্শ ও কর্মসূচির প্রসার।

কাশ্মীরে স্বাধীনতা সংগ্রামে এই দলটির ভূমিকা নিয়ে জানার চেষ্টা ছিল সবিস্তারে। যা জানা গেছে তা হলো, দলটি ১৯৭২ সাল থেকে নির্বাচনমুখী ছিল। প্রথমবার নির্বাচনে অংশ নিয়ে পাঁচটি আসনে জয় পেয়েছিল। ১৯৭৭-এর নির্বাচনে পেয়েছিল একটি আসন। ১৯৮৭ সালের নির্বাচনেও অংশ নিয়েছিল 'ইউনাইটেড মুসলিম ফ্রন্টে'র ব্যানারে।[২] সৈয়দ আলী শাহ গিলানীসহ ওই ফ্রন্ট পাঁচটি আসনও পেয়েছিল। তবে, ১৯৮৭'র নির্বাচনে ভোট কারচুপির ঘটনায় নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারিয়ে অন্য অনেকের মতো জামায়াতও বেছে নিয়েছিল অস্ত্রের পথ। তারপর থেকে তারা ভোটমুখী রাজনীতি থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয়। ভারতের কাছে তারা তখন 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' বা 'পাকিস্তানপন্থী' দল হিসেবে চিহ্নিত হয়। ১৯৮৮ সালে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় দলটি। নির্বাচিত এমপিরা সৈয়দ আলী শাহ গিলানীর নেতৃত্বে পদত্যাগ করেন সংসদ থেকে। তারপর তৈরি করা হয় অল পার্টি হুরিয়াত কনফারেন্সে (৩৩টি দলের মিলিত স্বাধীনতাকামী মোর্চা যা এখন কয়েক ভাগে বিভক্ত)। হিজবুল মুজাহিদীন নামে এক সশস্ত্র সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করে দলটি। ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে 'হিজবুল মুজাহিদীন' গ্রুপটি ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ, দুর্দমনীয়। এই গ্রুপটিতে ছিল জামায়াতে ইসলামীর অসংখ্য ক্যাডার। প্রায় প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, এটি জামায়াতে ইসলামীর সশস্ত্র স্বাধীনতাকামী গ্রুপ। ভারতীয় বিভিন্ন সংস্থার লোকেরা এটা উপলব্ধি করেছিল যে, জামায়াতে ইসলামীর ইন্ধন নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে এই গ্রুপ দমন করা কঠিন। জামায়াতের দাবি, ভারতীয় সংস্থার মূল টার্গেট ছিল জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় ও দ্বিতীয় সারির নেতারা।

৯০ ও শূন্য দশকের শুরুর দিকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে জামায়াতে ইসলামীর অনেক নেতা মারা যায়। স্বাধীনতাকামীদের মধ্যেও একটি গ্রুপ জামায়াত নেতাদের টার্গেট করেছিল বলে জামায়াতের দাবি। ওই গ্রুপটি স্থানীয়ভাবে 'ইখওয়ানি' হিসেবে পরিচিত।

২০০২ সালে 'ভারতীয় চাপে' নতিস্বীকার করে জামায়াতে ইসলামী। জামায়াতের তৎকালীন আমীর গোলাম মোহাম্মদ বাট সংবাদ সম্মেলন করে জানান, হিজবুল মুজাহিদীনের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না, নেই। সৈয়দ আলী শাহ গিলানী তখন জামায়াতে ইসলামীর 'রাজনৈতিক শাখা'র প্রধান। তিনি ছিলেন জেলখানায়। জামায়াতের আমীরের এই ঘোষণার পর সৈয়দ গিলানী তা মেনে নেননি। তার মতে, আল্লাহর কথা মানুষকে বলার জন্য আগে আমাদের ভূ-খণ্ড স্বাধীন করা জরুরি। জামায়াতের বক্তব্য ছিল, আজাদি আসুক বা না আসুক, আল্লাহর কথা প্রচার করতে হবে। যুদ্ধ, সংঘাত এড়িয়ে শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজ করাই জামায়াতের অবস্থান। তবে, এখনও তারা নির্বাচনে অংশ নেন না। এক গণমাধ্যম সাক্ষাৎকারে ২০১৫ সালে জামায়াত আমীর মো. আবদুল্লাহ ওয়ানি বলেছিলেন, জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর ভারতের অধীনে না আমেরিকার অধীনে আছে সেটা আমাদের দেখার বিষয় নয়। আমরা চাই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। আফসাপা (আর্মড ফোর্স স্পেশাল পাওয়ার্স অ্যাক্ট) এখনও বিদ্যমান, যুবক ছেলেদের যখন-তখন ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে–এ অবস্থায় আমরা নির্বাচনে যাচ্ছি না।[৩] অপর এক জামায়াত নেতা এই লেখককে বলেছিলেন, 'জামায়াতে ইসলামী মনে করে, জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর একটি বিরোধপূর্ণ এলাকা। পাকিস্তান, ভারত ও জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের প্রকৃত জনপ্রিয় নেতৃত্বের অংশগ্রহণে আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য সমাধান আশা করে দলটি। সমাধান হিসেবে তাদের দলের অবস্থান হচ্ছে, অবাধ-সুষ্ঠু গণভোট।' আজাদি আন্দোলনে সশস্ত্র ভূমিকার প্রশ্নে ভিন্নমতের কারণে সৈয়দ আলী গিলানী জামায়াত থেকে বহিষ্কৃত হন। এছাড়া নানা কারণেই সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে একদিকে আজাদি আর অন্যদিকে শান্তিপূর্ণভাবে মানুষকে ইসলামের মৌলিক চর্চার দাওয়াত এই দুই মত আলাদা হয়ে গেল।

অন্যান্য দেশের মতো ওখানেও জামায়াতে ইসলামী একটি ক্যাডারভিত্তিক ধর্মীয় সংগঠন। জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি গবেষক লিমন মাজীদ লিখেছেন, 'জামায়াতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্যাডারভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। অনেকে মনে করেন, দলটির গণমুখী (Mass based) পার্টি হিসেবে কাজ শুরু করা উচিত। কিন্তু, গণমুখী দল হতে হলে ক্যারিশম্যাটিক নেতৃত্ব প্রয়োজন। একটা দল যখন ধারাবাহিকভাবে ক্যারিশম্যাটিক নেতৃত্ব খুঁজে পায় না তখন তা বংশীয় শাসনে পরিণত হয়। এটা দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ গণমুখী দলের বৈশিষ্ট্যে

পরিণত হয়েছে। অপরদিকে জামায়াত তার ক্যাডারভিত্তিক দলীয় ব্যবস্থার কারণে, ক্যারিশম্যাটিক নেতৃত্বের চেয়ে শৃঙ্খলা এবং গণতান্ত্রিক চর্চাকে প্রধান্য দিয়েছে। ফলে, পীর সাহেবের হাতে প্রতিষ্ঠার পরও এটি বংশীয় সম্পত্তিতে পরিণত হয়নি।'[৪]

এই রাজনৈতিক দলটি এখন নির্বাচনী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নেই। কোনো নির্বাচনে তাদের দলের মূল-সদস্যরা (রুকন) ভোট দেন না। তাদের রুকনের সংখ্যা হাজার পাঁচেক। আর অসংখ্য সাধারণ কর্মী ও সমর্থক রয়েছে। তারা নানা সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেন। ১৯৮৮ সালে নিষিদ্ধ হওয়ার পর তারা ফালাহ-এ-আম নামে এক ট্রাস্ট গঠন করে বিভিন্ন স্কুল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা শুরু করে। তাছাড়া, নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চালাচ্ছেন 'ইসলামী-সামাজিক' কার্যক্রম। সৈয়দ আলী শাহ গিলানী 'আজাদিপন্থী বা সেপারেটিস্ট' দল তেহরিক-ই-হুরিয়াতের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এখনও কাশ্মীরের একটা বড় সংখ্যক স্বাধীনতাকামী জনসংখ্যা মনে করেন, জামায়াতে ইসলামী জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের লক্ষ লক্ষ মানুষের আজাদি আন্দোলনের রক্ত দিয়ে হাত ধুয়ে ঘরে উঠেছে। অধ্যাপক শেখ সওকত হুসাইন লিখেছেন, জামায়াতের মধ্যে একটা প্রবণতা লক্ষণীয়, যারা জামায়াতকে 'রেডক্রসের' ইসলামী সংস্করণ হিসেবে চালিয়ে নিতে চায়। তারা বিপন্নদের সেবা করবে। কিন্তু, নিজেরা সংঘাতে জড়াবে না। কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে তারা কোনো ঝামেলায় জড়াতে চায় না। এই প্রবণতাকে ইতিমধ্যে জীবন ও সম্পদ খুইয়ে সর্বহারা কর্মীদের সঙ্গে প্রতারণা বলেও মনে হয়।[৫] অনেকে মনে করেন, ভারতের বিভিন্ন সংস্থার নির্যাতন ও আক্রমণের কাছে জামায়াতে ইসলামী অসহায় ছিল। তাই তারা পরিস্থিতির শিকার। আবার অনেকেই মনে করেন, ১৯৯০-এর দশকে সশস্ত্র সংগ্রামে কর্মী ও রুকনদের পাঠিয়ে দিয়েই জামায়াতে ইসলামী ভুল করেছে। কারণ, ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে আজাদির জন্য লড়তে কী পরিমাণ শক্তি প্রয়োজন, আন্তর্জাতিকভাবে কারা তাদের কোনো ধরনের সহায়তা দিচ্ছে, কে প্রকাশ্যে তাদের পক্ষে কথা বলবে এগুলোর হিসাব না করেই জামায়াত সশস্ত্র সংগ্রামে নিয়োজিত করেছে অসংখ্য কর্মীকে। অন্যান্য স্বাধীনতাকামী গ্রুপ যেমন জম্মু কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের (জেকেএলএফ) আদর্শ হচ্ছে জাতীয়তাবাদ। কিন্তু জামায়াতের আদর্শ হচ্ছে ইসলাম। স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র বড় এই দুটি গ্রুপের আদর্শিক ভিন্নতাও তাদের স্বাধীনতা প্রপ্তির জন্য বাধা হয়ে কাজ করেছে বলে অনেকে মনে করেন।

মজার বিষয় হলো, ১৯৪৭ সাল থেকে উপমহাদেশের সব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে জামায়াতের ভূমিকা ছিল প্রশ্নবিদ্ধ এবং স্রোতের বিপরীতে। জামায়াত সচারাচর এটা অস্বীকার করেছে। আবার কখনো স্বীকার করেছে। ১৯৪৭'র দেশ বিভাগের মাধ্যমে মুসলমানদের আলাদা ভূ-খণ্ড পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে মাওলানা মওদুদীর প্রশ্ন ছিল, নতুন পাকিস্তান কী ইসলামী দেশ হবে? তাহলে নেতৃত্বকে

ইসলামী হতে হবে। জামায়াতে ইসলামী সব সময় চেয়েছে পাকিস্তানের নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাকে ইসলামীকরণ করতে। সেখানে কখনও সফল হয়েছে, কখনও হয়নি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ প্রশ্নেও তাদের অবস্থান ছিল একই। তাদের প্রত্যাশিত ইসলামী পাকিস্তান যদিও পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত ছিল না, তবুও তারা পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ গড়ার বিরোধিতা করেছে। পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে দলটি। স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির পরও তারা অব্যাহত চেষ্টা করেছে বাংলাদেশকে ইসলামী বাংলাদেশে পরিণত করতে। জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের স্বাধীনতার প্রশ্নেও জামায়াতের অবস্থান একই দেখা গেছে। তারা সবসময়ই বলতে চেয়েছে, ইসলামের ভিত্তিতে চলবে জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের সমাজ। আর, স্বাধীনতাকামী জাতীয়তাবাদী অন্যান্য অনেকেই বলেছে, ইসলামের সঙ্গে স্বাধীন জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কোনো সম্পর্ক নেই। এ কারণে হিজবুল মুজাহিদীন অনেক জাতীয়তাবাদী মুসলিম ও হিন্দু নেতাকে হত্যা করেছে বলেও জানা যায়। আবার বিপরীত ঘটনাও ঘটেছে অসংখ্য। সেক্যুলার জেকেএলএফ-ই হিন্দুদের হত্যা শুরু করেছিল। জাতীয়তাবাদীরা সবসময়ই বলেছেন, গিলগিত, বালতিস্তান, লাদাখ, জম্মু এবং কাশ্মীর ভ্যালি নিয়ে মূল জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের একটি স্বাধীন জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার কথা। সেখানে হিন্দু ও মুসলিম, বৌদ্ধ সবই থাকবে। জামায়াতের অবস্থান ছিল ইসলাম। জামায়াতের এক তরুণ নেতার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল ২০১৫ সালের মে মাসে। একজন বাংলাদেশি হিসেবে আমি আমার পরিচয় দিয়েছিলাম। জানতে চেয়েছিলাম তাদের দলের অবস্থান কাশ্মীর প্রেক্ষিতে। তিনি জানিয়েছিলেন, 'হিজবুল মুজাহিদীনকে জামায়াত সমর্থন করেছিল। তবে, এটা সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে না। হিজবুল মুজাহিদীনের প্রতিষ্ঠাতা সাঈদ সালাহউদ্দীন (আসল নাম সাইয়েদ ইউসুফ শাহ)[৬] এর সঙ্গে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কিছু নেতার সুসম্পর্ক ছিল (পরে জানতে পেরেছি তিনি জামায়াতের একটি জেলা পর্যায়ের নেতা ছিলেন) সেই সম্পর্কের সুবাদে হিজবুল নেতা প্রেস কনফারেন্সে দাবি করেন, আমরা জামায়াতের পৃষ্ঠপোষকতায় সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করছি। ইতোমধ্যে কাশ্মীরের যুবকদের মধ্যে বন্দুকের নলের প্রতি একধরনের বিশ্বাস তৈরি হয়েছিল। সুতরাং, জামায়াতের কর্মী ও নেতাদের অনেকেই নিজ দায়িত্বে জাড়িয়ে পড়ে সশস্ত্র সংগ্রামে।' জামায়াত সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধি হচ্ছে, দলটির কার্যক্রম সবসময়ই টপ-ডাউন ধরনের। উপরের সিদ্ধান্ত ছাড়া এর কর্মীরা কখনোই সিদ্ধান্ত নেয় না। সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো একটা চরম সিদ্ধান্ত এ দলের প্রশিক্ষিত কর্মীরা নিজেরাই নিয়ে ফেলেছে এটা মানতে আমার দ্বিধা আছে। যদি তা হয়ই, তাহলে এটা স্পষ্ট যে, নব্বইয়ের দশকে জামায়াতের সাংগঠনিক কাঠামো দুর্বল ছিল। জামায়াতের ওই নেতার বক্তব্য অনুসারে, তখন পরিস্থিতি এমন ছিল যে, মনে হচ্ছিল, দ্রুতই কাশ্মীর স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে। সরকার বলতে কিছু তখন ছিল না। চিফ

মিনিস্টার ফারুক আবদুল্লাহ তখন দায়িত্ব ছেড়ে 'পালিয়ে' গিয়েছিলেন বলে কথিত আছে। কিন্তু, দ্রুতই ভারত সরকার পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। তখন আর কিছুই করার ছিল না। এ প্রসঙ্গে জাস্টিস জিএন গওহরের মন্তব্য খুবই মানানসই। তিনি লিখেছেন,

> The Jama't leadership was against armed revolt but, as the gun attained the seal of popularity, their 'elected' legislators (in total five) resigned and associated themselves with this revolt. Within a month militancy swayed the public and the militant acquired the halo of the savior of the nation. A dominant section of Jamat-e-Islami felt attracted to the popularity of the gun and so a militant outfit, under the name of J&K Hizbul Mujahideen, took birth from the womb of JKLF. The state Jamat declared it as its military wing.[৭]

বিভিন্ন সশস্ত্র গ্রুপের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবকেই ব্যর্থতার কারণ বলে মনে করে জামায়াত। ওই নেতা জানান, ইখওয়ানি নামে একটা গ্রুপ ছিল। তারাও সশস্ত্র সংগ্রামে যুক্ত হয়েছিল। মূলত, তাদেরকে ভারতীয় বাহিনীর পক্ষ থেকে কাউন্টার ইনসারজেন্সি গ্রুপ হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল। পরে, তারাই হিজবুল মুজাহিদীন ও জামায়াত নেতাদের হত্যা করেছে যা ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছে। মজার ব্যাপার হলো, কাশ্মীরের প্রায় অধিকাংশ মানুষের কাছে 'ইখওয়ানি' শব্দটি একটি অভিশাপ হিসেবে বিবেচিত। যেমনটা বাংলাদেশে 'রাজাকার'।

জামায়াতের কাছে তাদের দলের নিহত নেতাকর্মীর সংখ্যার কোনো হিসাব নেই। হাজার-হাজার। ওই নেতা আমাকে জানিয়েছিলেন, মোটামুটি ২০ থেকে ৫০ বছর বয়সের যত মেধাবী নেতৃত্ব ছিল তার প্রায় সবই 'শহীদ' হয়েছে। এখন নতুন করে আমাদের শুরু করতে হয়েছে। তবে, এখনও তারা মনে করে, স্বাধীনতা কাশ্মীরের মানুষের শিরায় শিরায় বহমান। এদের দমিয়ে রাখা যাবে না। মজার ব্যাপার হলো, দল হিসেবে তারা পাকিস্তানই কাশ্মীরের গন্তব্য মনে করে। তরুণ এক নেতার বক্তব্য ছিল, কাবা শরীফের পর দ্বিতীয় প্রিয় কোনো স্থান যদি থাকে অধিকাংশ কাশ্মীরির কাছে সেটা পাকিস্তান। সৈয়দ আলী গিলানীও নিজেকে পাকিস্তানের পক্ষে দাবি করেন। তিনি তা প্রকাশ্যেই বলে থাকেন। গণমাধ্যমে তাকে বলা হয় 'প্রো-পাকিস্তান সেপারেটিস্ট লিডার'। সৈয়দ আলী গিলানীকে জামায়াতে ইসলামী এখনও বিশেষ ক্যাটাগরিতে দলের সদস্য হিসেবে দাবি করে। অর্থাৎ, জামায়াত ও তেহরিক-ই-হুরিয়াত এই দুই সংগঠনের যুগপৎ সদস্য হিসেবে কাজ করেন সৈয়দ গিলানী। ২০০৪ সালে তেহরিক-ই-হুরিয়াতের ও জামায়াতে ইসলামী এক

সমঝোতায় আসে। সে অনুসারে, গিলানীসহ ছয়জন নেতাকে এই দ্বি-দলীয় সদস্য হিসেবে গ্রহণ করে জামায়াত।[৮] তরুণ ওই নেতাকে প্রশ্ন করেছিলাম, জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরে তো অনেক ধরনের মানুষ আছে। জম্মু হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লেহ (লাদাখ)। শিয়া অধ্যুষিত কারগিল (লাদাখ)। ওই সব এলাকায় জামায়াতের কার্যক্রম আছে কি? তিনি জানিয়েছেন, 'না'। অর্থাৎ, শুধুমাত্র কাশ্মীর ভ্যালি ও জম্মুর সুন্নী মুসলিমদের (মোট জনসংখ্যার আনুমানিক ৬৫%) নিয়েই জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক পরিকল্পনা ঘুরপাক খায়। ওই নেতা আরও বলেছিলেন, 'আমরা কাশ্মীর সমস্যার সমাধান চাই। প্রয়োজনে জম্মুর হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ কয়েকটি জেলা ভারতকে ছেড়ে দিতে আমরা রাজি আছি।'

জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর জামায়াতে ইসলামীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সৈয়দ নাজীর আহমেদ খাসানি। যিনি ২০০৩-২০০৬ সাল সময়ে জামায়াতের আমীর ছিলেন। ১৯৯০'র দশকে তিনি জামায়াত থেকে দূরে ছিলেন। ২০১৫ সালে তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পর একাধিক গণমাধ্যম নিবন্ধে জেনেছিলাম, দূরদর্শী এই নেতা ৯০'এ ঘটে যাওয়া জামায়াতের অনেক ঘটনাকে সমালোচনা করেছিলেন।

> Khshani was critical of many things that happened in Jama't after 1990s. Someone within Jama't has to take that tradition of criticism further. When Khasani Sahab joined, he found his questions answered in the form of Jama't. When he left, he left a bagful of questions for Jama't to answer.'[৯]

অপর এক নিবন্ধে এজাজ উল হক লিখেছেন, '১৯৯০ এর সশস্ত্র সংগ্রমে জামায়াত যখন অগ্রভাগে দাঁড়িয়েছিল তখন খাসানি ছিলেন ক্ষীণকণ্ঠী স্বল্প সংখ্যক মানুষের একজন যাদের মতামত সহিংস হুংকারের কাছে ডুবে গিয়েছিল। খাসানি ছিলেন জামায়াতের সেই পক্ষের ব্যক্তি যিনি স্রোতের সঙ্গে মিশতে চাননি, বরং স্রোতের বিপরীতে থাকাকেই সঠিক মনে করেছিলেন। তিনিই কেবল বুঝতে পেরেছিলেন, সশস্ত্র পথ কেবল গণআত্মাহুতির দিকে নিয়ে যাবে'।[১০]

১৯৯০ সালে সাবেক আমীরের এই অবস্থান থেকে ধারণা করা যায়, ১৯৯০ সালে জামায়াত তার রাজনৈতিক অবস্থানে ঐক্যবদ্ধ ছিল না। সুসংবদ্ধ এই রাজনৈতিক দলটি হুজুগের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, যদি ১৯৯০ এর স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল হতো, আর যদি জামায়াত সশস্ত্র সংগ্রামের বাইরে থাকত, তাহলে জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের জামায়াতের অবস্থা বাংলাদেশ জামায়াতের মতো 'স্বাধীনতাবিরোধী' হতো। তার চেয়ে বরং যুদ্ধে যোগ দিয়েই তারা ঠিক করেছিল কিনা? স্পষ্টত, বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামী ১৯৭১-এ যা করেছে,

সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হিসেবে করেছে। ঘটনার ৪০ বছর পরও তারা সেই অবস্থানকে সমস্ত উপায়ে জাস্টিফাই করার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। বিপরীত দিকে, জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের ৯০'র স্বাধীনতার আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীর অংশগ্রহণ দলীয় রাজনৈতিক কৌশলের অংশ ছিলই কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়ে গেছে।

এ বিষয়ে কাশ্মীরি লেখক (তিনি ইসলামপন্থী বলে আমার মনে হয়েছে) অধ্যাপক শেখ সওকত হোসেনের বক্তব্য এখানে তুলে ধরা যায়। তিনি এক নিবন্ধে লিখেছেন, 'বিশ শতকের প্রথমার্ধে শেখ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ছিলেন অত্যাচারী রাজার শোষণের বিরুদ্ধে কাশ্মীরের জনগণের সংগ্রামের প্রতিনিধি। আর শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, সাংস্কৃতিক আগ্রসন ও গণতান্ত্রিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করেছে জামায়াতে ইসলামীর মতো সংগঠন।[১১]' অর্থাৎ, ভারতীয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে কাশ্মীরি মুসলমানদের প্রতিরোধে জামায়াতে ইসলামীর শক্ত অবদান রয়েছে। এই জামায়াতে ইসলামী কাশ্মীরে কিভাবে প্রতিষ্ঠা ও বিকশিত হলো তাও এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা দেওয়া জরুরি। 'বিশুদ্ধবাদী' ইসলামী এই দলটিকে ১৯৪০-এর দশকে কাশ্মীরে প্রতিষ্ঠা করেন মাওলানা সা'দ উদ্দিন নামে এক স্কুল মাস্টার। সর্বত্রই দলটি স্থানীয় জনপ্রিয় সুফি সংস্কৃতির বিরোধী। ফলে মাওলানা সা'দ উদ্দিনের জনসভাগুলোতে সাধারণত লোকজন আসত না। এসব সামাজিক বাধা এড়িয়ে তিনি ৩/৪ জন লোকের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতেন। এভাবেই, জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের একটি শক্ত অবস্থান সৃষ্টি হয় দলটির। মার্কসিস্ট গবেষক ড. সাজাদ পাডের বলেছিলেন, 'জামায়াতে ইসলামী হলো একটি ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক (Socio-Politico-Religious) সংগঠন।' ১৯৮৪ সালে এই মাওলানা দল থেকে অব্যাহতি নেন। অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথার ওই মাওলানার অব্যাহতির পরই দলটি স্বেচ্ছায় অথবা পরিস্থিতির চাপে ভারত বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। এবং যখনই সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয় দলটির কর্মীরা সেই পক্ষে ঝুঁকে পড়ে।[১২] এই বক্তব্য থেকেও স্পষ্ট, যদিও সশস্ত্র দলে যোগ দেওয়ার বিষয়ে কর্মীরা স্রোতের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু, ভারতের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে দলটির অগ্রগণ্য ভূমিকা নিঃসন্দেহ।

কেবল জামায়াতের কথা বললেই ইসলামী রাজনীতির প্রসঙ্গ শেষ হয় না। কারণ, কাশ্মীরের রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার করেছে এমন গোষ্ঠী শুধু জামায়াতই নয়। বলতে গেলে সকলেই ধর্মকে মিশিয়েছেন কাশ্মীরে। 'অসাম্প্রদায়িক' শেখ আবদুল্লাহও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। শেখ আবদুল্লাহ ও তার দল ন্যাশনাল কনফারেন্স সম্পর্কে ৯০-এর দশকের জেঅ্যান্ডকে-রাজ্যের গভর্নর জাগমোহনের উক্তিটি এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন, 'এমনকি শেখ আবদুল্লাহ ও তার দলকে জামায়াতে ইসলামীর জমজ বোন বলা হয়ে থাকে।'[১৩] কাশ্মীরের ইসলামীকরণের ক্ষেত্রে স্পষ্ট হতে আরও একটি পরিবার সম্পর্কে ধারনা নেওয়া

জরুরি। তা হলো, মৌলবি ইউসুফ শাহ্ পরিবার। ইউসুফ শাহ্ ছিলেন কাশ্মীরের ঐতিহ্যবাহী জামে মসজিদের খতিব, যাকে কাশ্মীরি ভাষায় বলা হয় মীরওয়াইজ বা প্রধান বক্তা। কয়েকশ বছর ধরেই ওই পরিবার কাশ্মীরের প্রধান ধর্মপ্রচারকের আসনে আসীন। একে অনেকে তুলনা করেছেন 'দালাই লামা'র ইসলামী সংস্করণ হিসেবে। আর মীরওয়াইজের বয়ানের কেন্দ্র যে জামে মসজিদটি, সেটিও প্যাগোডা আকৃতির কারণে অনেকেই তাকে কাশ্মীরিদের বৌদ্ধ সংস্কৃতির লিগ্যাসি বলে মনে করেন।[১৪]

বহু বছরের পুরনো হলেও মীরওয়াইজ পদের এই বিশেষ গুরুত্ব কাশ্মীরে প্রতিষ্ঠা পায় আফগান শাসক আহমদ শাহ আবদালীর সময়ে, যিনি দিল্লির আলেম হজরত শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ'র বিশুদ্ধবাদী ইসলামী চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ফলে, কাশ্মীরের জামে মসজিদে প্রতিষ্ঠিত মীরওয়াইজ পরিবার মূলত শরিয়তভিত্তিক ইসলামী প্রচারের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবেই পরিচিত। বিখ্যাত আরব সাংবাদিক মুহাম্মদ আসাদ কাশ্মীরে এসে এই ইউসুফ শাহের আতিথেয়তা গ্রহণ করেছিলেন ১৯৩৪ সালে। হাদিস গ্রন্থ বুখারির ইংরেজি অনুবাদক মুহাম্মদ আসাদ। তিনি সেই অনুবাদের কাজও করেছিলেন কাশ্মীরে বসে।

অবশ্য, শরীয়ত আর তরিকতের মধ্যে বিরোধ সেখানে অব্যাহত ছিল। জামে মসজিদ থেকে মাত্র মাইল খানেক দূরে অবস্থিত অপর একটি প্রতিষ্ঠান খানকাহ-ই-মওলা ছিল তরিকত-পন্থীদের আস্তানা। ডোগরা শাসনামলে এই দুই পক্ষের মধ্যকার দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসে। এমনকি সেটা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটায়। ফলে, সে সময় মহারাজা ডিক্রি জারি করে শ্রীনগরের মসজিদগুলোকে দুই পক্ষের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে দিয়েছিলেন।

মীরওয়াইজ পরিবারই কাশ্মীরে প্রথম ইসলামিয়া হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করে। বলা হয়ে থাকে, ডোগরা মহারাজারা ওই মৌলবিকে আস্থায় রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন অভিজাত আলেম। শেখ আবদুল্লাহ্ রাজনীতিতে আসার শুরুতে এই মৌলবির পৃষ্ঠপোষকতা পান। ১৯৩১ সালে যখন শেখ আবদুল্লাহ যুবসমাজের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন তখন এই মৌলবির নেতৃত্বে ভাগ বসে। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। ১৯৩১ সালে মুসলিম সম্প্রদায়ের আন্দোলন শুরুর সময়ে শেখ আবদুল্লাহ স্কুল মাস্টার ছিলেন। আন্দোলন দমাতে তাকে গ্রামে বদলি করা হয়। আবদুল্লাহ তখন খনকায় গিয়ে চাকরি ছাড়ার ঘোষণা দেন। বিপরীতক্রমে, ইউসুফ শাহকে মহারাজার পক্ষ থেকে ৬০০ রুপি মূল্যের একখানা ওয়াজিফা উপহার দেওয়া হয়। মীরওয়াইজ মহারাজার কৌশল বুঝতে না পেরে তা গ্রহণ করেন।[১৪] আবদুল্লাহও এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে মীরওয়াইজের বিপরীতে নিজেই জননেতা হয়ে ওঠেন। শেখ আবদুল্লাহ তখন জামে মসজিদের বিপরীতে তরিকতপন্থী খানকাহ-ই-মওলায় আশ্রয় পেয়েছিলেন। খানকাহ-ই-মওলায় শেখ আবদুল্লাহ সুরা আর রাহমান তেলাওয়াত করতেন। আর মহারাজার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করতেন। অন্যদিকে জামে

মসজিদে ইউসুফ শাহ দিতেন ইসলামী বয়ান। খানকাহ-ই-মওলা ছিল কিছুটা সুফি ঘরানার বা তরিকতপন্থী। পরে অবশ্য শেখ আবদুল্লাহ হজরতবালেও তার রাজনৈতিক কার্যক্রমের বিস্তার ঘটান। কিন্তু জামে মসজিদে আবদুল্লাহ ও তার ন্যাশনাল কনফারেন্স প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি। মৌলবি ইউসুফ শাহ কাশ্মীরে জিন্নাহকে সমর্থন করেছিলেন। ১৯৪৪ সালে জিন্নাহকে কাশ্মীরে আমন্ত্রণ করেছিলেন তিনি। উদ্দেশ্য ছিল আবদুল্লাহ ও চৌধুরী গোলাম আব্বাসের মধ্যে সমঝোতা করানো। কিন্তু, সমঝোতা হয়নি। জম্মুর নেতা চৌধুরী গোলাম আব্বাস দেশভাগের আগে মুসলিম কনফারেন্স পুনর্গঠন করেছিলেন ইউসুফ শাহের সহযোগিতায়। পরে, ১৯৪৭ সালে চৌধুরী গোলাম আব্বাস, মীরওয়াইজ ইউসুফ শাহ, সাংবাদিক পণ্ডিত প্রেমনাথ বাজাজসহ অনেকেই কাশ্মীর থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। ফলে, কাশ্মীরের একক ক্ষমতা রয়ে যায় আবদুল্লাহর হাতেই। আর অন্যরা পাকিস্তান শাসিত অংশে চলে যান। পাকিস্তান শাসিত কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী হন চৌধুরী গোলাম আব্বাস। মৌলবি ইউসুফ শাহ চলে গেলে তার এক ভাতিজা আতিকউল্লাহ শাহ জামে মসজিদে নায়েব-এ-মীরওয়াইজ হিসেবে কাজ চালিয়ে যান। তিনি মারা যান ১৯৬২ সালে।[১৫]

পরে মীরওয়াইজ হন মৌলবি মোহাম্মদ ফারুক। তিনিও পারিবারিক ধারা অব্যাহত রাখেন। ১৯৬৩ সালে হযরতবালের মুঈ-মুকাদ্দাস চুরির প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু হয়। তখন আওয়ামী অ্যাকশন কমিটি গঠিত হয়। তার নেতা ছিলেন মীরওয়াইজ মোহাম্মদ ফারুক। ওই সময়ে এই নতুন মীরওয়াইজকে মোকাবিলার জন্যই নেহরু শেখ আবদুল্লাহকে জেলখানা থেকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেন বলে কথিত আছে।[১৪] তখন কাশ্মীরের রাজনীতি আবদুল্লাহকেন্দ্রিক একমেরু অবস্থা থেকে আবারও দ্বিমেরু অবস্থায় (মীরওয়াইজ বনাম আবদুল্লাহ) ফেরত যায়। কিন্তু মীরওয়াইজ সেই অবস্থা ধরে রাখতে পারেননি। ওই ষাটের দশকেই জামায়াতে ইসলামী নানা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শক্ত অবস্থান সৃষ্টি করে। ফলে, আবদুল্লাহর জন্য মীরওয়াইজ ঐতিহ্যবাহী প্রতিপক্ষ হলেও মৌলিক প্রতিপক্ষ হয়ে পড়ে জামায়াত এবং তার রাজনৈতিক শাখার নেতা সৈয়দ আলী শাহ গিলানী।

মীরওয়াইজ পরিবারের সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর স্থায়ী সমঝোতা হয়নি। কারণ, জামায়াত কখনও মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে বংশপরম্পরা সমর্থন করেনি। তবে, কাশ্মীরের রাজনীতিতে ভারতবিরোধী জনমত তৈরিতে এবং শেখ আবদুল্লাহর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে মীরওয়াইজ আর জামায়াতের মধ্যে ঐক্য হয়েছে বারবার। ১৯৮৭ সালের নির্বাচনেও মীরওয়াইজের আওয়ামী অ্যাকশন কমিটি জামায়াতের নেতৃত্বে ইউনাইটেড মুসলিম ফ্রন্টকে (এমইউএফ) সমর্থন করে। পরে সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে যখন কাশ্মীরি তরুণেরা ঝুঁকে পড়ে তখন এই মৌলবি পরিবারটি ছিল দ্বিধান্বিত। মীরওয়াইজ ফারুক সে অবস্থায় রিমোটকন্ট্রোলড

রাজনীতিকের মতোই দ্বিধান্বিত অবস্থান নেন। ১৯৯০ সালে মোহাম্মদ ফারুক নিহত হন। তখন তার ছেলে ওমর ফারুক আসীন হন মীরওয়াইজ পদে।

২০০০ সালের পর কাশ্মীরে সশস্ত্র আন্দোলন স্তিমিত হয়। অলপার্টি হুরিয়াত কনফারেন্স নামে স্বাধীনতার দাবিদার প্রায় ৩৩টি দল একসঙ্গে হয়। সৈয়দ আলী গিলানী তার নেতা হন। মীরওয়াইজ ওমর ফারুকও সেখানে অংশ নেন। পরে আবার হুরিয়াত বিভক্ত হয়। মীরওয়াইজ ওমর ফারুকের নেতৃত্বে হুরিয়াতের একাংশ এখন হুরিয়াত (এম) বলে পরিচিত। তিনি এখনও কাশ্মীরের স্বাধীনতাপন্থী রাজনীতিকদের মধ্যে প্রভাবশালী। স্মার্ট এই মৌলবির ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে গোটা মুসলিম বিশ্বে। এখনও জুমা ও ঈদে তিনি তেজস্বী বয়ান করেন জামে মসজিদে। মাঝে মধ্যেই নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে সেখানে অংশ নিতে আরোপ করা হয় বিধিনিষেধ। প্রতিবার ঈদের নামাজের পর জামে মসজিদ এলাকায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় মুসল্লিদের। সৈয়দ আলী গিলানীর নেতৃত্বে অপর অংশ হুরিয়াত (জি) নামে পরিচিত। এই গিলানী অংশই জনপ্রিয়তা ও প্রভাবের দিক থেকে শীর্ষস্থানীয়।

নোট/সূত্র

১. ১৯৪১ সালে নিখিল ভারতের পাঞ্জাবের পাঠানকোটে এ দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর দলটি জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান, জামায়াতে ইসলামী হিন্দ ও জামায়াতে ইসলামী জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর এই তিনটি অংশে বিভক্ত হয়। একেক স্থানে একেক ধরনের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে কাজ শুরু করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ প্রশ্নে দলটির পূর্ব পাকিস্তান অংশের নেওয়া ভূমিকা সৃষ্টি করে এক ঐতিহাসিক বিতর্ক। পরে ১৯৭৭ সালে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নামে বাংলাদেশেও কার্যক্রম শুরু করে দলটি।

২. মুসলিম ইউনাইটেড ফ্রন্ট (মাফ) ছিল আবদুল্লাহ পরিবারের নেতৃত্বাধীন ভারতমুখী ন্যাশনাল কনফারেন্সের বিপরীতে সকল দলের নির্বাচনী জোট। ১৯৮৭ সালের নির্বাচনে তারা ৮৫টি আসনের মধ্যে ৫টি আসন পায়। একমাত্র ন্যাশনাল কনফারেন্সের সমর্থকরা ছাড়া কাশ্মীরের প্রায় সবাই স্বীকার করে যে ওই নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে। ওই নির্বাচনে মাফ'র পাঁচটি আসনের মধ্যে একটি ছিল জামায়াতের সৈয়দ আলী শাহ গিলানীর। মাফের সবাই একযোগে সংসদ থেকে পদত্যাগ করে। পরে মকবুল ভাট, ইয়াসিন মালিকসহ চারজন পাকিস্তানে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে জেকে লিবারেশন ফ্রন্ট শুরু করে। পরে জামায়াত একই পথ অনুসরণ করে।

৩. Interview; Abdullah Wani; January 26, 2015; *http://www.kashmirlife.net/issue-45-vol-06-72231;* (Accessed on: 08 April 2015)

৪. Lymon Majid; *Jama'at: What Next?*; Kashmir Life; Aug 30-Sep 5, 2015; Pp: 12-13.
৫. Shaikh Showkat Hussain; *Facets of Rescurgent Kashmir*; Srinagar: Kashmir Institute; 2008. 87.
৬. G N Gauhar; *Military Operation in Kashmir*; Delhi: Manas; 2001. P155.
৭. প্রাগুক্ত, ১৪৪
৮. Riyaz Khaliq; *Jama't to get New Head in JK*; Kashmir Life, 29th August, 2015 (Online).
৯. Mahmood Ur Rashid; *Khshani: In context, as context*; Greater Kashmir; 16th May, 2015; P9.
১০. Ajaz Ul Haque, *Write Hand: Kashani Goes;* Greater Kashmir; 17th May, 2015; P: 10.
১১. Shaikh Showkat Hussain; *Facets of Rescurgent Kashmir*; Srinagar: Kashmir Institute; 2008. P85.
১২. প্রাগুক্ত, ৮৭
১৩. Jagmohan (2011); *My Frozen Turbulence in Kashmir*; New Delhi: Allide; P: 181.
১৪. Shaikh Showkat Hussain; *Facets of Rescurgent Kashmir*; Srinagar: Kashmir Institute; 2008. 97-99.
১৫. http://www.hindustantimes.com/india/mirwaiz-mohammad-yusuf-shah/

১১

স্বাধীনতা ও সংখ্যালঘুর দ্বিধা

হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের কথা বারবার আলোচনায় এসেছে। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই কাশ্মীরের সামাজিক ব্যবস্থায় জড়িয়ে রয়েছে ধর্মের প্রভাব আর নানা ধর্মীয় মতভেদ। ১৯৪৭ সালে এসে সেই রাজনীতি জটিল রূপ ধারণ করেছে। ক্রমে হয়েছে জটিলতর। শেখ আবদুল্লাহর কাশ্মীরিয়াতের বিপরীতে হিন্দু নেতাদের ভারতবাদের কথাও আগের আলোচনায় এসেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য হলো, ১৯৯০-পরবর্তী সময়ে কাশ্মীরে হিন্দু জনসংখ্যার কী হয়েছিল? অধিকাংশ ভারতীয় বয়ানে শোনা যায় যে, কাশ্মীরি মুসলমানরা হিন্দুদের তাড়িয়ে দিয়েছিল। অর্থাৎ, তারা সাম্প্রদায়িক, হিন্দু বিদ্বেষী, সহিংস। ওই বর্ণনায় পূর্বাঞ্চলীয় আরাকানের বৌদ্ধ আর কাশ্মীরি মুসলমানদের একই চেহারা ভেসে ওঠে সবার সামনে। আরও বড় দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে সরলীকরণ করে বলা যায়, পৃথিবীর সবখানেই সংখ্যালঘুর ওপর সংখ্যাগুরুর চরিত্র যেমন এখানেও তেমন। কিন্তু, সমস্যার গভীরে যেতে হলে বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার জন্য সকল পক্ষের মতামতের সমন্বিত উপস্থাপন জরুরি।

আলেকজান্ডার ইভান্স[১] লিখেছেন, 'মুসলমানদের মতো কাশ্মীরি পণ্ডিতরাও ১৯৮৮ পরবর্তী সংঘাতের শিকার। কিন্তু, তাদের কথা তুলনামূলকভাবে কম প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৯০ সালের আগে দুটিমাত্র গবেষণায় তাদের ইতিহাস ও নৃবিজ্ঞান তুলে ধরা হয়েছিল। অসংখ্য বইয়ে তাদের কথা উল্লেখ রয়েছে তবে সেটা খুবই সীমিত। তাদের সম্পর্কে অনেক নিবন্ধ আছে যার বেশিরভাগই তথ্য-উপাত্তহীন মতামত দিয়ে ঠাসা। হিন্দুদের পরিচালিত বেশ কয়েকটি ওয়েবসাইট এই ঘাটতি ইদানীংকালে পূরণ করেছে। তবে তারাও তুলনামূলকভাবে একপেশে তথ্য সরবরাহ করছে।' ব্রাহ্মণদের ব্যাপারে প্রায় সব মতামতই ভিন্ন ভিন্ন 'জাতীয়তাবাদী' প্রিজমের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা। ফলে, ব্রাহ্মণদের মোট সংখ্যা, নিহতের সংখ্যা এবং ঘরছাড়া হওয়া লোকের সংখ্যা নিয়ে চলছে 'পরিসংখ্যানের রাজনীতি'।

এসব কারণেই বিষয়টি আলোচনার জন্য সুনির্দিষ্ট কয়েকটি প্রশ্ন এখানে আলোচনা প্রয়োজন।

১. কাশ্মীরি সমাজে ব্রাহ্মণদের অবস্থান ঐতিহাসিকভাবে কেমন ছিল?

২. ১৯৯১ সালে কী প্রেক্ষিতে, কেন, কিভাবে এবং কতজন ব্রাহ্মণ কাশ্মীর ছেড়েছিলেন?

৩. তাদের কাশ্মীরে ফিরে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা আছে কি? তারা নিজেরা কী কাশ্মীরে ফিরতে আগ্রহী? এ অধ্যায়ে এই বিষয়গুলো আলোচনা করা হবে।

আগেই বলেছি, কাশ্মীরের সমাজে ব্রাহ্মণবাদ বা শিবের উপাসনা যাকে শেইবিজম বলা হয়, বিকাশ হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক কালে। কাশ্মীরের পুরাকৃতি বা পুরাতত্ত্বের সঙ্গেও রয়েছে ব্রাহ্মণবাদ। কিন্তু, ইতিহাসের ধাপে ধাপে মানুষের পরিচয়বোধের পরিবর্তন ঘটেছে। গড়ে উঠেছে নতুন পরিচিতি ও ধর্মবোধ। হিন্দুত্ব থেকে বৌদ্ধ ধর্ম, তারপর ক্রমান্বয়ে ইসলাম সেখানে সংখ্যাধিক্য অর্জন করেছে চতুর্দশ শতকের পর থেকে। নেপালি গবেষক বিষ্ণু পোখরেল[২] পরিবর্তনের গোটা বিষয়টিকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেছেন তিনটি শব্দের মাধ্যমে। 'কনফ্লিক্ট, কো-অপারেশন ও কনভার্সন'। যাইহোক, চতুর্দশ শতকে বিপুল সংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণদের একটা সংখ্যা অবশিষ্ট ছিল। নানা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেই তারা টিকে ছিলেন। ত্রয়োদশ শতকে রাজদেব (১২১৩-১২৩৬) কাশ্মীরি ব্রাহ্মণদের নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করতেন। যার ফলে পণ্ডিতরা এমনটা বলতে বাধ্য হতো যে, 'আমি ভাত্তা নই'।[৩] কাশ্মীরি ভাষায় ভাত্তা মানে কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ।
কাশ্মীরের ইতিহাসে ব্রাহ্মণদের অস্তিত্বের ইতিহাস আরও পুরনো, এমনকি হিন্দু-বৌদ্ধ-ইসলাম ধর্মগুলোরও আগের। আর্যরা যখন উত্তর-পশ্চিম ভারতে আসে তখন স্থানীয় বিভিন্ন গোষ্ঠীর মুখোমুখি হয়। সে সময় একটা জনগোষ্ঠী আন্তরিকভাবে আর্যদের গ্রহণ করেছিল, যারা 'বানর জাতি' হিসেবে পরিচিত হয়। অপর জনগোষ্ঠী, যারা আর্যদের সহজে গ্রহণ করেনি, পরিচিত হয় নাগ (সাপ) বা পিশাচ (শয়তান) হিসেবে। ধীরে ধীরে আর্যরা প্রতিষ্ঠা পায়। কালক্রমে তারাই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত হয়। অবশ্য এর ভিন্নমতও আছে। অনেকে বলছেন, কাশ্মীরের ব্রাহ্মণরা যে লর্ড শিবকে পূজা করে তা অনার্য ঈশ্বর। মোদ্দাকথা, ব্রাহ্মণদের গভীর অতীত রয়েছে কাশ্মীরে। তবে বারবারই তাদের মধ্য থেকে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। নিলমাত পুরাণ অনুসারে বর্ণব্যবস্থার কারণেই কাশ্মীরি নাগরিকদের মধ্যে আর্যবিরোধী প্রতিক্রিয়া ছিল, যা বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তার কারণ। এছাড়া ললিতাদিত্য (৬৯৭-৭৩৮) ছিলেন নাগ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। তিনি আর্য হিন্দুদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ করেছেন। তিনিই আর্যদের ধুতি পরতে বাধ্য করেছিলেন যেন তাদের পশুর মতো লেজবিশিষ্ট দেখায়।[৩] তবে, পরবর্তীতে অবন্তি বর্মণের আমলে ব্রাহ্মণবাদ পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসে। অবন্তি বর্মণের সময়ে নির্মিত অসংখ্য মন্দির ও স্থাপনা এখনও কাশ্মীরে আছে কোনোটা পূর্ণ আবার কোনোটা ভগ্নাংশ। পরবর্তীতে হর্ষদেব (১০৮৯-১১০১) নিজে ব্রাহ্মণ হয়েও হয়তো জনপ্রিয় হওয়ার জন্য অগণিত মন্দির ভাংচুর করেছেন। সবমিলে একথা স্পষ্ট, কাশ্মীরে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অন্যদের দ্বন্দ্বের গল্পটা সুপ্রাচীন। মুসলিম যুগেরও বহু আগের।

এই বাস্তবতায়ই অনুসন্ধান করা জরুরি যে, কাশ্মীরে ব্রাহ্মণদের অবস্থান কেমন ছিল? শেখ আবদুল্লাহ তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'যদিও তারা ছিল মাইক্রোস্কোপিক মাইনরিটি, কিন্তু তাদের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারি'।[৪] ইসলামী

যুগেও সুলতান জাইনুল আবেদীনের (১৪২০-১৪৭০) সময় পণ্ডিতরা প্রশ... কাজের বিপুল সুযোগ পেয়েছিল। সুলতানকে 'ভাত্তা শাহ' বা ব্রাহ্মণদের শা... হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো যা পরে রূপান্তরিত হয়ে বাদশাহ হয়েছে। এই সুলতানের আমলেই কাশ্মীরের মন্দিরগুলোকে ব্রাহ্মণদের মালিকানায় দেওয়া হয়। ফলে সেগুলোর সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিও ব্রাহ্মণদের মালিকানায় যায়। এভাবে সুলতান জাইনুল আবেদীনের সময়ই কাশ্মীরের ব্রাহ্মণরা পুরহিত শ্রেণির পাশাপাশি জমিদার শ্রেণিতে পরিণত হন। আবার ওই বাদশাহর'ই সন্তান ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তিনি ব্রাহ্মণদের ওপর খড়গহস্ত হয়েছিলেন।[৩] কাশ্মীরের নাগরিকদের মধ্যে ব্রাহ্মণরাই ছিল শিক্ষিত ও প্রশাসনিক কাজে দক্ষ জনগোষ্ঠী। ফার্সি ও সংস্কৃত ভাষায় দক্ষ ছিলেন তারা। এই দক্ষতার কারণে তারা মোগল শাসকদের বিশ্বস্ততা অর্জন করেন। সম্রাট আকবর তাদের অনুষ্ঠানাদিতে নিয়মিত যোগ দিতেন। এমনকি আওরঙ্গজেবও এই নীতি অনুসরণ করেছিলেন। আফগান শাসনামলে কাশ্মীরে হিন্দু-মুসলিম সবার ওপর নিপীড়ন হয়েছে। সে সময়ও ফার্সি জানা কাশ্মীরি ব্রাহ্মণরা আফগান সাম্রাজ্যের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন যারা আফগানদের অর্ডার অনুসরণ করতেন। আফগান আমলে কিছু কিছু কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ দেওয়ান পদে আসীন হয়েছিলেন যাদের নামাঙ্কিত পয়সা প্রচলিত ছিল।[৩] বীরবল ধর নামে এক কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ উচ্চপদস্থ অবস্থায়ই আফগানদের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবকে আহ্বান করেছিলেন।[৫] সেভাবেই আফগান দখলদারিত্বের অবসান হয়েছিল কাশ্মীরে। তবে, তার বিনিময়ে কাশ্মীর পতিত হয়েছিল পাঞ্জাবের শিখদের অধীনে। ১৯৫৩ সালে শেখ আবদুল্লাহকে গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রেও ব্যাপক কৌশলী ভূমিকা রেখেছিলেন দুর্গা প্রসাদ ধর (ডিপি ধর)। তিনিও ছিলেন কাশ্মীরি পণ্ডিত। কাশ্মীরে এ নিয়ে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে, 'যখন ধরেরা ক্ষমতাসীন হয় তখন কাশ্মীর পরাজিত হয়!'[৬]। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যুদ্ধের ইস্যুতেও ইন্দিরা গান্ধীর উপদেষ্টা ছিলেন ডিপি ধর।[৭] এভাবে সব শাসনামলেই কাশ্মীরি পণ্ডিতরা ছিলেন শীর্ষস্থানীয় ও প্রভাবশালী।

মহারাজার শাসনামলে তারা রাজ্যের প্রশাসনে আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ পায়। ১৯৩০ সালের দিকে কাশ্মীরি ব্রাহ্মণরা রাজ্যের সিংহভাগ জমি ও প্রশাসনিক পদের নিয়ন্ত্রণ করতেন। ১৯৩১ সালে রাজ্যের আমলাতন্ত্রের ৭৮ শতাংশের দখল ছিল হিন্দু ও শিখদের, যদিও জনসংখ্যায় মুসলমানরা ছিল তাদের চেয়ে দশগুণেরও বেশি। ব্রিটিশ আমলের নথি অনুসারে কাশ্মীরি ব্রাহ্মণদের প্রধান পেশা ছিল লেখালেখি।[২] দাদন ও সুদে অর্থঋণ দেওয়ার চর্চা ছিল তাদের নিয়মিত ব্যবসার অংশ।[৩] এরই ধারাবাহিকতায় যখন মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা বাড়তে শুরু করল তখনই আর্থসামাজিক অবস্থায় হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের একটি স্থায়ী দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে, শত চেষ্টা করেও শেখ আবদুল্লাহ খুব বেশি সংখ্যক হিন্দু সদস্য তার দলে ভিড়াতে পারেননি।

পরে ১৯৪৭ সালের পর শেখ আবদুল্লাহ ভারতের অধীনে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হলেন। তখনকার ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুও ছিলেন কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ। আবদুল্লাহ তার সময়ে কাশ্মীরি ব্রাহ্মণদের আর্থসামাজিক অবস্থায় নতুন আঘাত হেনেছিলেন তার নয়া কাশ্মীর মেনিফেস্টো বাস্তবায়ন করতে গিয়ে। ওই মেনিফেস্টো অনুসারে রাজ্যের প্রায় সব জমিদারের অধীনস্থ জমিন সরকারি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে কয়েক লাখ কৃষকের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে মূলত রাজ্যের অর্থনীতির পুরো কাঠামোই বদলে দেওয়া হয়েছিল। জমিদারি ব্যবস্থার সঙ্গে কাশ্মীরি ব্রাহ্মণদের সম্পর্ককে তুলনা করা হয়েছে উত্তর প্রদেশের মুসলিম জমিদারদের সঙ্গে। কেউ কেউ বলেছেন, 'উত্তর প্রদেশের মুসলিম জমিদাররা যেমন সেখানকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত না থাকায় ১৯৪৭ সালে দেশছাড়া হয়েছে, তেমনি হয়েছে কাশ্মীরি ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রেও'।[৩]
অর্থনৈতিক এতসব চড়াই উৎরাই সত্ত্বেও কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ ও মুসলমানরা একসঙ্গেই ছিল বছরের পর বছর। তবে, হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ভারতে যতটা তীব্র হয়েছে তার ছোঁয়াও ততবেশি লেগেছে কাশ্মীরে। ১৯৪৭ সালের পর থেকে অভ্যন্তরীণভাবে আবদুল্লাহর নয়া কাশ্মীর মেনিফেস্টো যেমন ব্রাহ্মণ জমিদারদের স্বার্থহানি করেছে; একই সময়ে ভারতে শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বাধীন হিন্দু সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আরএসএস) বিরোধপূর্ণ জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর রাজ্যকে পূর্ণরূপে ভারতে যুক্ত করতে সক্রিয় আন্দোলন শুরু করে। জনসংঘ ও প্রজা পরিষদও একই দাবিতে সক্রিয় ছিল। সে সময় কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা বিভাগ কাশ্মীরের কিছু এলাকায় প্রবেশের ক্ষেত্রে অনুমতির ব্যবস্থা চালু করে। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এই পারমিট ব্যবস্থা বাতিলের দাবি করেন। প্রতিরক্ষা বিভাগ তা অস্বীকার করার পর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বিনা পারমিটে কাশ্মীরে প্রবেশের ঘোষণা দেন। ১৯৫৩ সালের ৮ মে যখন তিনি জম্মুর মধুপুর ব্রিজ পার হয়ে রাজ্যের সীমানায় প্রবেশ করেন তখনই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। শ্রীনগরের নিশাতবাগ এলাকায় তাকে জেলবন্দি রাখা হয়। এ ঘটনায় জম্মুর হিন্দু সংগঠনগুলো ব্যাপক বিক্ষোভ করে। ২৩ জুন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি কারাবন্দি অবস্থায় মারা যান।[৬] এ ঘটনাও শেখ আবদুল্লাহকে অপসারণের পাশপাশি হিন্দু-মুসলিম বৈরিতার অন্যতম কারণ।
শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির হিন্দুত্ববাদ কাশ্মীরি ব্রাহ্মণদের খানিকটা প্রভাবিত করেছিল বলেও মনে করা হয়। তিনি কাশ্মীরি ব্রাহ্মণদের ভারতীয় পোশাক ও ভাষা অনুসরণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। এক সময় কাশ্মীরি হিন্দু-মুসলিম সবাই ফেরেন (মোটা কাপড়ের জুব্বা বিশেষ) ও সালোয়ার-কামিজ পরতো। পরে কাশ্মীরি ব্রাহ্মণরা ধুতি ও শাড়ি পরা শুরু করেন।[৩] আর কালক্রমে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কাছে আপন থেকে পর হয়ে পড়েন। কাশ্মীরি মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক বা সামাজিক আন্দোলন ১৯৩১ সালে শুরু হলেও ব্রাহ্মণরা সম্প্রদায়ভিত্তিক ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম শুরু করে বেশ আগেই। ১৯১৪ সালে কাশ্মীরের

হিন্দু সম্প্রদায়ের সংস্কারের উদ্দেশ্যে কাশ্মীরি পণ্ডিত সভা নামের একটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে জম্মুতে। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ওই সভা গঠিত হয়। পরে ধীরে ধীরে তারা রক্ষণশীল হিন্দুচর্চার দিকে ধাবিত করার চেষ্টা করে সম্প্রদায়টিকে। তারা কাশ্মীরি ব্রাহ্মণদের মুসলিম আচার অনুষ্ঠানে যোগদানে নিষেধ করতে শুরু করে।[২] সুফি আস্তানাগুলোতে যেতেও মানা করে। একই প্রচেষ্টা মুসলিম সম্প্রদায়ে শুরু হয় ১৯৫০-এর দশকে জামায়াতে ইসলামীর মাধ্যমে। এর ফলে কাশ্মীরি বহু সাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা ধীরে ধীরে বিভক্ত হতে শুরু করে। পঞ্চাশের দশক থেকেই এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ভারতের বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করে। দিল্লির পাম্পোশ কলোনি, জম্মুর সুভাসনগর গড়ে ওঠে কাশ্মীরের সশস্ত্র সংগ্রাম শুরুর বহু বছর আগেই। কিন্তু, এতদসত্ত্বেও এ সম্প্রদায়ের একটি বিরাট সংখ্যা ছিল কাশ্মীরে। তারা কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা, শ্রীনগরসহ বিভিন্ন স্থানে ব্যবসা-বাণিজ্য করছিল। তবে, সুদীর্ঘকালের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটপরিবর্তনের ক্লাইম্যাক্স ইভেন্ট ছিল ১৯৯০-৯১ সালে কাশ্মীরি ব্রাহ্মণদের গণপ্রস্থান।

এবার দ্বিতীয় প্রশ্নের আলোচনায় আসা যাক। ১৯৮৮ সাল থেকেই সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হয় ভারতীয় শাসনের বিরুদ্ধে। দলে দলে লোকেরা সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তান গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসছিল। শ্রীনগরের রাস্তায় রাস্তায় যুবকরা স্লোগান দিত, 'চল চল পিন্ডি চল, কাশ্মীরকো আজাদ কর'। অজ্ঞাত এক কারণে সীমান্ত (লাইন অব কন্ট্রোল) ছিল উন্মুক্ত। আসা-যাওয়া ছিল নিয়মিত। এমন এক পরিস্থিতিতে ১৯৯০-৯১ সালের দিকে কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় এক লাখ ৬০ হাজার কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ ভ্যালি ছেড়ে চলে যায়। তারা প্রাথমিকভাবে জম্মুতে ভয়ানক দারিদ্র্যপীড়িত 'অস্থায়ী' ক্যাম্পে অবস্থান করে। পরে ১৯৯৭ সাল নাগাদ তাদের অনেকে জম্মু ও দিল্লির বিভিন্ন ঘর-বাড়িতে চলে যায়।[২] এখনও জম্মুর ক্যাম্পে অনেকে অবস্থান করছে। এ অবস্থা সম্প্রদায়টির ওপর এক অপরিসীম মানবিক বিপর্যয় নিয়ে আসে। আর এ নিয়ে শুরু হয় এক নতুন দোষারোপের রাজনীতি।

জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট (জেকেএলএফ) তাদের স্বাধীনতার দাবিতে প্রচারণা শুরু করে ১৯৮৮ সালের ৩১ জুলাই। শ্রীনগরে দুটি ভয়ানক বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। তারপর নানা সময় বিচ্ছিন্ন আক্রমণের মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে থাকে। আগেই বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণরা তখনও রাজ্যের সিংহভাগ গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন। জেকেএলএফ-এর টার্গেট হয়ে পড়েন তারা। ফলে, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে আস্থার সংকট স্পষ্ট হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণদের ভারতের বিশ্বস্ত মনে করা হয়। আর মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে আইন অমান্য (সিভিল ডিজ-অবিডিয়েন্স) করে স্বাধীনতার দাবি সমর্থনের প্রবণতা স্পষ্ট হয়। মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাহ তখন অপাংক্তেয়। ভারত সরকার গভর্ণরের শাসন চালু করে। জানুয়ারির শেষ দিকে মালহোত্রা জাগমোহনকে গভর্নর করে পাঠানো হয় যিনি আগেও এক মেয়াদে রাজ্যটির গভর্নরের দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৯০ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি দূরদর্শন

টিভির প্রধান লাসা কোলকে হত্যা করে জেকেএলএফ। ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ বিজেপির কাশ্মীরি প্রধান টিকা লাল টপলুকে হত্যা করা হয়। হাইকোর্টের জজ নীলকান্ত গাঞ্জু জেকেএলএফ-এর প্রতিষ্ঠাতা মকবুল বাটকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। ৪ নভেম্বও, ১৯৮৯ তাকেও হত্যা করে প্রতিশোধ নেয় সংগঠনটি। ১৬ এপ্রিল, ১৯৯০ তারিখে আলসাফা ও শ্রীনগর টাইমস পত্রিকায় ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে হুমকির খবর প্রকাশ করে। মিলিট্যান্টরা দাবি করতো, ভারতের এজেন্টদের মারা হচ্ছে। আর ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের কাছে এটা একটা সাম্প্রদায়িক হুমকি হিসেবেই আবির্ভূত হচ্ছিল। ব্রাহ্মণদের বিশ্বাস, পাকিস্তান এবং তার সমর্থকরা কাশ্মীরকে হিন্দুমুক্ত করার জন্য এই হুমকিগুলো দিয়েছে এবং তারা সফল হয়েছে। আবার মসলিম সম্প্রদায় মনে করে, গভর্নর জাগমোহন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় একটা উত্তেজনা তৈরি করেছেন। তারপর ব্রাহ্মণদের সরিয়ে নিয়েছেন যাতে মুসলমানদের ওপর নিশ্চিন্তে 'গণহত্যা' চালানো যায়। অনেকে বলেছেন জাগমোহন দায়িত্ব নেওয়ার আগে থেকেই প্রস্থান শুরু হয়েছিল। একজন কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ এই লেখককে বলছিলেন, আমরা টেরও পাইনি যে পাশের বাড়ির ব্রাহ্মণ পরিবারটি সব ছেড়ে চলে যাচ্ছে। চারদিকে আতঙ্ক বিরাজ করছিল পুরো সম্প্রদায়ের মধ্যে। আবার ভারতীয় গণমাধ্যমে অনেক কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ দাবি করেছেন, ১৯৯০ সালের ১৯ জানুয়ারি রাতে ব্যাপক আতঙ্ক তৈরি করে তাদের ঘর ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল। ওই দিনটিকে 'কেপি এক্সোডাস ডে' হিসেবে স্মরণও করা হয়।[৮]

১৯৯০-এর মার্চের শেষ দিকে অল ইন্ডিয়া কাশ্মীরি পণ্ডিত কনফারেন্স-এর পক্ষ থেকে কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে জম্মুতে স্থানান্তরের দাবি জানানো হচ্ছিল। আবার বিপরীত ঘটনাও ঘটেছে, একযোগে ট্রাকে চেপে মধ্যরাতে ব্রাহ্মণ পরিবারগুলো জম্মুর দিকে যাত্রা করেছে। অনন্তনাগের কাজিগন্ড দাঁড়িয়ে এক স্কুলপড়ুয়া কিশোর তা দেখছে। সেই কিশোর এখন কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। সব মিলিয়ে স্পষ্টত, পরস্পরবিরোধী দুটি বক্তব্য এখানে বিদ্যমান।

সে সময় জেকেএলএফ ও হিজবুল মুজাহিদিন যেমন হুমকি দিয়েছিল তেমনি অনেকে ব্রাহ্মণদের চলে যাওয়া ঠেকাতে চেষ্টা করছিলেন। ওয়াজাহাত হাবিবুল্লাহ তখনকার অনন্তনাগে কর্মরত এক সরকারি কর্মকর্তা। তিনি আলেকজান্ডার ইভান্সকে বলেছেন, 'একদিন একজন এমএলএ'র নেতৃত্বে শ'তিনেক লোক এসে আমাকে বলল, কাশ্মীরি পণ্ডিতরা চলে যাচ্ছে। তাদের থামান। আমি তখন গভর্নরের কাছে সুপারিশ করলাম এ বিষয়ে একটি গণমাধ্যম-ঘোষণা দেওয়ার। কিন্তু, সেটি করা হয়নি। বরং গভর্নর জাগমোহন নির্দেশনা দিলেন জম্মুতে কিছু ক্যাম্প তৈরি করে চলে যাওয়া পণ্ডিতদের থাকার ব্যবস্থা করতে। একই সঙ্গে নির্দেশনা দিলেন চাকরিজীবী ব্রাহ্মণদের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও বেতন জারি রাখতে। এটা অবশিষ্ট ব্রাহ্মণদেরও চলে যেতে উৎসাহিত করেছিল।' ব্যাপারটা একটা প্রশাসনিক ব্যর্থতা

হিসেবে ওই কর্মকর্তা মনে করেন। অনেক ব্রাহ্মণ মনে করেছিলেন কিছুদিন পরই তারা ফিরে আসতে পারবেন। অনেকে গভর্নরকে দোষারোপ করেন এভাবে যে, 'জাগমোহন তাদের চলে যেতে বলেননি বটে, তবে তাদের চলে যাওয়া ঠেকাতে ব্যবস্থাও নেননি।' সুমিত গাঙ্গুলি বলেছেন, 'জাগমোহন দায়ী এজন্য যে, তিনি ব্রাহ্মণদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেননি। আর সশস্ত্র গ্রুপগুলো দায়ী। কারণ, তারা আতঙ্ক তৈরি করেছিল'।[৯] পিএস বর্ম লিখেছেন, 'অল্প কিছু ব্রাহ্মণই কেবল তাকে জানিয়েছেন তারা সরাসরি হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন। অনেকে বলেছেন, মুসলিম প্রতিবেশীরা অনুরোধ করেছিলেন থেকে যেতে'।[১৯] জম্মু বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সার্ভেতে জানা গেছে, ঘর ছাড়ার পর ক্যাম্পে অবস্থান করা ব্রাহ্মণদের মধ্যে ২ শতাংশ সরাসরি হুমকিযুক্ত চিঠি পেয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন। প্রায় ৮০ শতাংশ কোনো ধরনের সরাসরি হুমকির মুখোমুখি হননি। তবে, অনস্বীকার্য রকমের একটা সহিংস অবস্থার মধ্যে তারা খুবই অনিরাপদ বোধ করছিলেন।[১০]

প্রস্থান বা বিতাড়ন যাই হোক, এ সম্প্রদায়ের সিংহভাগ লোক তাদের ঘর ছেড়েছিল তখন। তার পরের ঘটনা মোটেও সুখকর ছিল না। অদ্যাবধি তাদের নিয়ে চলছে দোষারোপ আর সংখ্যার রাজনীতি। গুগলে খুঁজলে দেখা যায়, হিন্দুদের পরিচালিত বেশ কয়েকটি ওয়েবসাইট দাবি করছে, ১৯৯০ সালে কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মোট জনসংখ্যা ছিল সাত লাখ, যার মধ্যে সাড়ে তিন লাখ তখন ভ্যালিতে বসবাস করছিল। কিন্তু সরকারি তথ্যমতে, ১৯৩১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী সম্প্রদায়টির জনসংখ্যা ছিল ৭৮ হাজার। সেখান থেকে ১৯৯১ সালে অর্থাৎ পায় দশকে সংখ্যা যদি সাড়ে তিন লাখ হয় তাহলে প্রতি ১০ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৩৫%। আর যদি মোট সংখ্যা ১৯৯০ সালে সাত লাখ ধরা হয় তাহলে দশকপ্রতি জনসংখ্যা বৃদ্ধি দাঁড়ায় ৪৫%। অথচ, ওই শতকে কাশ্মীরের জনসংখ্যার মোট বৃদ্ধির হার ছিল ৫-৩০ শতাংশ। উল্লেখ্য, অধিক শিক্ষা ও আর্থিক অবস্থাসম্পন্ন কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের জন্মহার আরও কম হওয়ার কথা। ফলে, সম্প্রদায়টির জনসংখ্যা নিয়ে যে দাবি করা হয় তার বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশের সুযোগ আছে। আলেকজান্ডার ইভান্স তার হিসেবে দাবি করেছেন, ১৯৯০ সালের দিকে রাজ্যের মোট হিন্দু জনসংখ্যা এক লাখ ৯০ হাজারের মতো, যার মধ্যে এক লাখ ৬০ হাজার থেকে এক লাখ ৭০ হাজার লোক ঘরবাড়ি ছাড়া হয়েছিল।

পানুন কাশ্মীর নামে একটি সংগঠন আছে, যারা কাশ্মীরি ব্রাহ্মণদের তাদের মাতৃভূমিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে বিভিন্ন স্থানে প্রচারণা চালায়। তাদের ওয়েবসাইটেও দাবি করা হয়, ১৯৯০-এর আগে তিন লাখ ব্রাহ্মণ বসবাস করতেন। ইন্দো-আমেরিকান কাশ্মীর ফোরাম নামের একটি সংগঠনের প্রচারপত্রে বলা হয়, ১১০০ কাশ্মীরি ব্রাহ্মণকে হত্যা করা হয়। অপর একটি সূত্র দাবি করছে, সাত শতাধিক ব্রাহ্মণকে হত্যা করা হয়েছে ১৯৮৯-৯০ সালের মধ্যে। ভারতীয় সরকারি নথি বলছে ২২৮ জন হিন্দু বেসামরিক লোক নিহত হয়েছে ১৯৮৮ থেকে ১৯৯১

পর্যন্ত সময়ে। এক সরকারি কর্মকর্তা যিনি ক্ষতিপূরণ কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন তিনি আলেকজান্ডার ইভান্সকে বলেছেন, সরকারি কর্মচারিদের মিলিয়ে সংখ্যাটি ৪৯০-এর বেশি নয়। শেষতক, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, সংখ্যা যাই হোক, লক্ষাধিক কাশ্মীরি ব্রাহ্মণকে ছাড়তে হয়েছিল তাদের কয়েক হাজার বছরের পুরনো আবাসভূমি। তারা কেউ তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছিল। আবার কারও কারও সম্পত্তি এখনও একইভাবে রয়েছে। অনেকের মুসলিম প্রতিবেশীরা এখনও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করছে পরিত্যক্ত সম্পত্তিগুলো। এত কিছুর মধ্যেও আশা জাগিয়ে রেখেছে যে ব্যাপারটি তা হলো, সেই আতঙ্কের সময়ও কাশ্মীরি পণ্ডিতদের কেউ কেউ তাদের প্রতিবেশীদের ওপর আস্থা রেখেছিলেন। তারা ঘর ছাড়েননি।

সরকারি তথ্যমতে, সেই সংখ্যাটা বর্তমানে চার হাজারের কাছাকাছি। কাশ্মীরে থেকে যাওয়া এই পরিবারগুলোর গল্পগুলো অবশ্য অন্যরকম। তারা এখনও কাশ্মীরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেখা পায় বলে দাবি করে। ২০১১ সালের আল-জাজিরার এক রিপোর্টে[১১] বোঝা যায়, অপেক্ষাকৃত গরিব আর অবহেলিত পণ্ডিতরাই কাশ্মীর ছাড়েনি তখন। আর ধীরে ধীরে মূল সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে তাদের অভিজ্ঞতাগুলো বেমানান হয়ে পড়েছে। ২০১৬ সালের অশান্ত পরিস্থিতির মধ্যেও দু-একটি খবর তারই উদাহরণ। জুলাই মাসের একটি খবর বলছে, কাশ্মীরের ত্রাল এলাকায় নিহত মিলিট্যান্ট বুরহানের মৃত্যুর পর তার পরিবারকে সমবেদনা জানাতে গ্রামের ব্রাহ্মণ নারীরা হাজির হয়েছেন।[১২] ১৮ নভেম্বরের খবরে বলা হয়, কারফিউর মধ্যেই শ্রীনগর পুরনো শহরে সুষমা পারিমু নামে ৪০ বছর বয়সী এক ব্রাহ্মণ নারীর মৃত্যু হয়। তার দুই ভাই আর তাদের স্ত্রীরা ছাড়া আর কেউ ছিলেন না কাছাকাছি। ওই নারীর শেষকৃত্যের কাজ স্থানীয় মুসলমানরা সম্পন্ন করেন।[১৩] এর মধ্যে অবশ্য আরেকটি দিক স্পষ্ট হয়। তা হলো, যারা এখনও কাশ্মীরে আছেন তারা অধিকাংশই তাদের সন্তানদের বিয়ের জন্য নিজের সম্প্রদায়ের কাউকে খুঁজে পাচ্ছেন না। ফলে, তাদের সন্তানরাও ছুটছে দূরে, ভারতের অন্য কোনো রাজ্যে, যেখানে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের কোনো সঙ্গী মিলবে সচরাচর।

গোটা সম্প্রদায়টির ঘরে ফেরার সম্ভাবনা নিয়ে নানা কারণে রয়েছে সংশয়। রাজ্যের সকল রাজনৈতিক দল নীতিগতভাবে একমত যে, কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ফিরিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী মুফতি সাঈদ (মৃত্যু: ২০১৫) বলতেন,

> 'কাশ্মীরি পণ্ডিতদের কাশ্মীর ফেরার প্রয়োজন নাও হতে পারে, কিন্তু, কাশ্মীরিদের নিজস্ব বৈচিত্র্য ধরে রাখার জন্য হলেও পণ্ডিতদের প্রয়োজন।'[১৪]

কিন্তু, বাস্তব প্রয়োগের প্রশ্নে বিষয়টি নিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে অনাস্থা, সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং সংশয়। এ নিয়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আস্থা সৃষ্টির উদ্যোগও সে অর্থে নেই। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের ঘরছাড়া হওয়ার পরপরই বিষয়টি নিয়ে

ভারতসহ বিশ্বজুড়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। সম্প্রদায়ের সিংহভাগ লোক মেধাবী ও শিক্ষিত হওয়ায় এ ঘটনা গণমাধ্যম ও সাহিত্যে ব্যাপকভাবে স্থান পেয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতাপূর্ণ একটি ঘটনাপ্রবাহের অংশ বলেই সম্ভবত যুথবদ্ধ
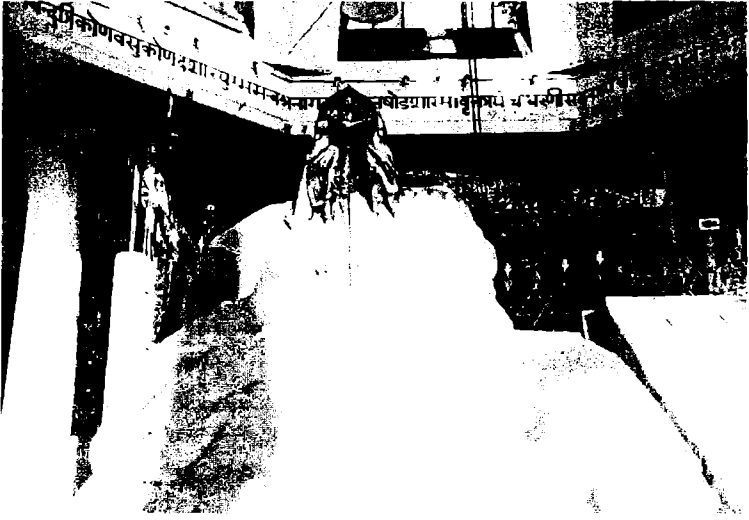
চিত্র ১১.১: শ্রীনগরের হরি পর্বতের (কোহ-এ-মারান) ওপরে অবস্থিত একটি মন্দিরের দৃশ্য। একই পর্বতে পাশেই আছে একচি মাজার ও একটি গুরুদুয়ারা

এই সম্প্রদায়টির সদস্যদের সেসব মর্মান্তিক বর্ণনা একমুখিনতার দোষে দুষ্ট। বিপরীত দিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়ও প্রতিপক্ষের চশমা দিয়ে দেখেছে পুরো ব্যাপারটিকে। এ সম্প্রদায়টিই যে হাজার হাজার বছর ধরে একই সমাজে অবস্থান করে আসছে সেই সত্যটি এখন সুদূরপরাহত।

শাকিল কালান্দার নামে একজন বিশিষ্ট নাগরিকের একটি মন্তব্যের মাধ্যমে ব্যাপারটি বোঝানো যাবে। শ্রীনগরের একটি সেমিনারে তার মন্তব্য ছিল, 'ভারত সরকার এক লাখ মুসলমানের মৃত্যুকে অস্বীকার করে। সেখানে মাত্র কয়েকশ কাশ্মীরি পণ্ডিতের মৃত্যুর ঘটনাকে বড় করে দেখার কী কারণ থাকতে পারে?' অধিকাংশ কাশ্মীরি মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গি এমনই। একই সভায় কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের এক যুবতী অংশ নিয়েছিলেন। তিনিও মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ ও আত্মসংবরণহীন হয়ে পড়েছিলেন।[১৫] স্পষ্টতই এই দৃষ্টিভঙ্গি দুটি সম্প্রদায়ের পরস্পরের পাশে আসার পথে মস্তবড় বাধা। পণ্ডিতদের ঘরে ফিরিয়ে নেওয়ার দাবিতে পানুন কাশ্মীর (আমাদের কাশ্মীর) নামে একটি সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে ১৯৯০-এর দশকেই। তাদের অন্যতম দাবি হলো,

কাশ্মীরি পণ্ডিতদের কাশ্মীরে ফিরিয়ে নিতে হবে। তাদের জন্য সেখানে স্বতন্ত্র কলোনি স্থাপন করতে হবে। তাদের দাবি হলো, কাশ্মীরি মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক। ফলে, তাদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকা যাবে না। কাশ্মীর অঞ্চলের মধ্যেই ব্রাহ্মণদের জন্য তিনটি আলাদা অঞ্চল স্থাপন করতে হবে। ঝিলাম নদীর তীরবর্তী অনন্তনাগ জেলায় একটি, শ্রীনগর শহরে একটি আর বারামুলা জেলায় একটি।

পানুন কাশ্মীর এই দাবি করলেও, পণ্ডিত সম্প্রদায়ের অন্য একটি বাস্তবতা আলোচনার বাইরে থেকে যাচ্ছে। তা হলো, গত ২৬ বছরে এই সম্প্রদায়টি বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। তাদের অনেকে শিক্ষিত ও দক্ষ হওয়ায় ভারতে এবং বিদেশে বিভিন্ন বড় বড় অবস্থানে চলে গিয়েছেন। অনেকে ভারতের অন্য রাজ্যে বৈবাহিক ও পারিবারিক সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। ফলে, তাদের মধ্যে কাশ্মীরে ফিরে যেতে আগ্রহী লোকের সংখ্যা সামান্যই। তবুও রাজনৈতিক এজেন্ডা হিসেবে ব্রাহ্মণদের ঘরে ফেরার দাবি উত্থাপিত হচ্ছে এবং হবেও।

দীর্ঘদিন ধরে এই দাবীর করা হলেও এ নিয়ে বাস্তব উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ২০১৫ সালে নরেন্দ্র মোদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর পণ্ডিত সম্প্রদায়ের জন্য একটি আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। ওই বছরই জম্মু-কাশ্মীরে রাজ্যে পিডিপি-বিজেপি ক্ষমতায় আসে। ভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং কাশ্মীরে পণ্ডিতদের জন্য 'কম্পোজিট টাউন' প্রতিষ্ঠার জন্য জমি বরাদ্দ চান। মুখ্যমন্ত্রী মুফতি মো. সাঈদও জমি দেওয়ার আশ্বাস দেন।

এর প্রতিবাদ শুরু হয় সর্বমহল থেকে। ভারতমুখী রাজনীতিক হওয়া সত্ত্বেও রাজ্যের বিরোধীদলীয় নেতা ওমর আবদুল্লাহ বলেন–

> 'সুস্থ মস্তিষ্কের কোনো কাশ্মীরিই পণ্ডিতদের আলাদা, বিচ্ছিন্ন ক্যাম্পে ফেরত আসা সমর্থন করে না। কাশ্মীরিয়াত ও কম্পোজিট কালচারকে সংরক্ষণের জন্য তাদের ফেরত আনতে যা যা করার আমি করতে রাজি। কিন্তু, তা ঘেটু বা বিচ্ছিন্ন ক্যাম্পে নয়। আমার সংশয় আছে অনেক কাশ্মীরি পণ্ডিতই ওই রকম ক্যাম্পে ফিরবেন কিনা।'[১৬]

জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের (জেকেএলএফ) বর্তমান চেয়ারম্যান ইয়াসীন মালিক বলেন–

> 'স্বাধীনতাকামীরা সবসময় তাদের নিজ নিজ ঘরে ফেরার পক্ষে। তাদের মর্যাদা ও সম্মান নিয়ে এখানে থাকার অধিকার আছে। তারা আমাদের ভাই ও বোন। কিন্তু ধর্মের নামে ঘৃণার দেয়াল তৈরির কোনো ষড়যন্ত্র মেনে নেওয়া হবে না। এর মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীরকে আরেকটি ফিলিস্তিন বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।'

এই জেকেএলএফই প্রথম ব্রাহ্মণ কর্মকর্তাদের যুদ্ধের কৌশল হিসেবে হত্যা করেছিল। অবশ্য, ২০০২ সালের পর থেকে সংগঠনটি সশস্ত্র পন্থা ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা দেয়। ইয়াসীন মালিক বলেন,

> 'মুফতি সাঈদ এ উদ্যোগের মাধ্যমে আরএসএস-এর এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছেন। পণ্ডিতরা আমাদের আত্মার অংশ। তারা আমাদের এই ভূমির মাস্টার। আমরা ১৯৪৭ সালেও ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষা করেছি। যখন, আরএসএস-এর সন্ত্রাসীরা জম্মুতে মুসলমানদের গণহত্যা করেছে তখনও পণ্ডিতরা এবং অন্য অমুসলিমরা এখানে নিরাপদে ছিল। যে কারণে গান্ধীজি বলেছিলেন, কোনো আশার আলো যদি থাকে তা কাশ্মীর।'

অবশ্য, মুখ্যমন্ত্রী মুফতি সাঈদ পরে বলেছিলেন, 'কম্পোজিট টাউনশিপ' হবে ইনক্লুসিভ। যে কেউ সেখানে বসবাস করতে পারবে। আজাদিপন্থী শিবির থেকে আরও বলা হয়েছিল কাশ্মীরি পণ্ডিতরা ফিরতে আগ্রহী নয়। এখন পণ্ডিতদের নামে ভারতীয় হিন্দুদের কাশ্মীরে সেটেল করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। অবশ্য, এই উদ্যোগ এখনও বাস্তবায়ন হয়নি। হলেও তা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি যে করবে না তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

দুই সম্প্রদায়ের বিরোধের আরও একটি উদাহরণ এখানে তুলে ধরা জরুরি। মহারাজার আমলে চালু হওয়া রণবীর পেনাল কোড অনুসারে রাজ্যে গরু-মহিষ জবাই, মাংস বিক্রি ও আমদানি-রপ্তানি নিষিদ্ধ। সে আইনের আর কোনো সংশোধন হয়নি। যদিও, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলিম এবং তাদের অপরিহার্য খাদ্য হওয়ার কারণে আইনটি কাশ্মীরে কখনও বলবৎ হয়নি। বিশেষ করে কাশ্মীর এলাকায় গরুর মাংস প্রায় সবসময়ই সহজলভ্য; এখনও। অবশ্য, কাটরা, জম্মুসহ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলোতে ওই আইন চালু আছে। ২০১৫ সালে, হঠাৎ হাইকোর্টের এক নির্দেশে বলা হয় গরুর মাংস বিক্রি এবং আমদানি-রপ্তানি বন্ধের উদ্যোগ নিতে। এ নিয়ে পুরো রাজ্যে হুলুস্থুল পড়ে যায়।

বিরোধী দল ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি) বিষয়টিকে ডিক্রিমিনালাইজেশনের প্রস্তাব রাজ্যসভায় আলোচনার জন্য বিল উত্থাপনের ঘোষণা দেয়। অন্যদিকে সংসদের স্পিকার ওই বিল আলোচনার অনুমতি দিলে কাশ্মীরের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টির হুমকি দেয় জম্মুভিত্তিক বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (বিএইচপি)। ২০০৮ সালের অবরোধের কথাও তারা স্মরণ করিয়ে দেয়। এমনকি কেউ গরু জবাই করলে তাকে ফাঁসি দেওয়ার দাবি জানান বিজেপির এক এমএলএ।[১৭] স্বাধীনতাকামী ও ভারত-বিরোধী সকল রাজনৈতিক দল এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ডাকে হরতাল। শুক্রবার নামাজের পর ব্যাপক প্রতিবাদে লাঠিচার্জের ঘটনা ঘটে। আহত হয় অনেক মানুষ। জামায়াতে ইসলামীর আমীর মন্তব্য করেন, 'হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল করার ক্ষমতা সরকারের নেই'।

পাকিস্তানপন্থী মুসলিম নারী সংগঠন দুখতারানে মিল্লাতের নেত্রী আয়শা আন্দ্রাবি শ্রীনগরে গরু জবাই কর্মসূচি পালন করেন। ওই অনুষ্ঠানের ভিডিও কাশ্মীরের সবার মোবাইল ফোনে ছড়িয়ে পড়ে। তাতে দেখা যায়, কয়েকজন পুরুষ একটি গরু ধরে আছে। আয়শা আন্দ্রাবি বক্তৃতা দিচ্ছেন। আল্লাহু আকবর বলে গরু জবাই করা হলো। আয়শা বললেন, 'হামলোক গাই জবাহ কার দিয়া'। হাইকোর্টের এই নির্দেশের প্রতিবাদে একজন এমএলএ গরুর গোশতের পার্টি আয়োজন করেন। পরের দিন বিধানসভায় তার ওপর হামলা করে বিজেপি সদস্যরা। কয়েকদিন পর ৯ অক্টোবর (২০১৫) গরুর চামড়া বহন করার অভিযোগে কাশ্মীরি এক ট্রাকচালকের গায়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় জম্মুর উদমপুরে। জাহিদ নামে ওই যুবক (১৮) মারা যায় নয় দিন পর। নিহতের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সংবাদ সম্মেলনের সময় বিফ পার্টির আয়োজক ওই এমএলএ'র মুখে পেট্রল ছুঁড়ে মারে এক হিন্দু যুবক। এভাবেই একুশ শতকেও গরুর মাংস দুই সম্প্রদায়ের সম্প্রীতির জন্য হুমকিই শুধু নয়, বিভিন্ন মতের লোকদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে।[১৮]

নোট/সূত্র

১. বিষ্ণু পোখরেল লেখকের সহপাঠী হিসেবে কাশ্মীরে অধ্যয়ন করেছেন। তিনি একজন নেপালি ব্রাহ্মণ। হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মণবাদ সম্পর্কে লেখকের ভাবনাগুলো গড়ে উঠতে বিষ্ণুর অবদান উল্লেখযোগ্য।
২. আলেকজান্ডার ইভান্স লন্ডনের কিংস কলেজের সেন্টার ফর ডিফেন্স স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক। তিনি ২০০২ সালে কমপ্লিমেন্টারি সাউথ এশিয়া জার্নালে একটি নিবন্ধ লিখেছেন। নিবন্ধের শিরোনাম ছিল, 'A Departure from history: Kashmir Pandits, 1990-2001'. এই অধ্যায়ে ওই নিবন্ধটির বেশ কিছু তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে।
৩. Sheikh Showkat Hussain, *Facts of Resurgent of Kashmir* (2008); Pp: 2-11; Prem Nath Bazaz, Kashmir in crucible, veering Publishers, Mirpur (1991); P5.
৪. Sheikh Abdullah (1993), *Flames of the Chiner*, Pp: 270-72.
৫. Zaved Iqbal; *Zaldagar 1865*; Greater Kashmir; May 2, 2015; P: 9.
৬. Sheikh Abdullah (1993), *Flames of the Chiner*; P. 128.
৭. Srinath Raghavan (2013), *1971: The Global History: Prologue*; Pp: 1-13.
৮. Shreya Biswas; January 19, 2016; *Exodus of Kashmiri*

Pandits: What happened on January 19, 26 years ago?; http://indiatoday.intoday.in/story/exodus-of-kashmiri-pandits-january-19-jammu-and-kashmir/1/574071.html

৯. Sumit Ganguli (1997); The Crisis in *Kashmir: Paterns of War, Hopes of Peace*; New York; P107.

১০. PS Verma, Jammu and Kashmir at the political crossroads (New Delhi: Vikash Publishing House, 1994), P-254.

১১. Azad Essa; August 2, 2011; *Kashmiri Pandits: Why we never fled Kashmir*; http://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/kashmirtheforgottenconflict/2011/07/20117613 4818984961.html

১২. Zahid Maqbool; July 15, 2016; *Pandits of Tral grieved at Burhan's death*; Greater Kashmir.

১৩. Kashmir Observer; Nov 28, 2016; *Muslims neighbors perform last rites of Pandit woman in Srinagar*; https://kashmirobserver.net/2016/city-news/muslims-neighbors-perform-last-rites-pandit-woman-srinagar-12140

১৪. মুফতির মৃত্যুর পর তার অন্যতম উপদেষ্টা আমিতাভ মাট্টু, যিনি একজন কাশ্মীরি পণ্ডিত, কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক আলোচনায় (মার্চ, ২০১৬) এ কথা বলেছিলেন। লেখক সেখানে উপস্থিত ছিলেন

১৫. শ্রীনগর মিডিয়া সামিট, ২০১৫; লেখক সেখানে উপস্থিত ছিলেন

১৬. গ্রেটার কাশ্মীর; ৯ এপ্রিল ২০১৫: পৃষ্ঠা ১

১৭. গ্রেটার কাশ্মীর, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৫, পৃষ্ঠা ১

১৮. অক্টোবর, ২০১৫ কাশ্মীরের স্থানীয় খবরের কাগজ দ্রষ্টব্য।

১২

কাশ্মীরের স্বাধীনতা ও বামপন্থা

কাশ্মীরের বামপন্থা নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা সামান্যই চোখে পড়েছে। শেখ আবদুল্লাহর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অনেকে কিছু কথা লিখেছেন। এখানেও সবিস্তার আলোচনার খুব একটা সুযোগ নেই। মূলত কাশ্মীর ইস্যুতে যত কথাই হয়, ঘুরে ফিরে ইসলামপন্থার কথা আসে। তবু কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে কাশ্মীরের সম্পর্কটি তুলে ধরা কোশেশ জরুরি।

বামপন্থার মূলকথা হলো, শ্রমিক-মজুর ও দরিদ্র লোকেরা ক্ষমতার কেন্দ্রাসীন 'উচ্চ' শ্রেণির শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে। একটি শ্রেণিহীন-সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চলবে। সে অর্থে ডোগরা মহারাজার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা প্রথম বিদ্রোহ পূর্ণরূপে একটি বাম বিদ্রোহ। যদিও সেখানে তখন বামপন্থার তত্ত্ব নিয়ে পর্যালোচনা হয়নি। স্রেফ একটি বিদ্রোহ হয়েছে মহারাজার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের। ১৮৬৫ সালে শাল শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য পাওনার জন্য ওই বিদ্রোহ করেছিল।

ডোগরা আমলে জমিদারি ব্যবস্থার অধীনে অস্বাভাবিক ট্যাক্স আরোপের কারণে মানুষের জীবন ছিল মানবেতর। বিভিন্ন একাউন্টে তার কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। শাল বুননের কাজে নিয়োজিত শিল্পীদের মহারাজার আমলে পারিশ্রমিক দেওয়া হতো দৈনিক চার আনা। মাসিক আয় হতো ৭-৮ রুপি। সেখান থেকে জনপ্রতি মাসিক পাঁচ রুপি ট্যাক্স আদায় করতেন মহারাজা। ১৮৬০-এর দশকে কাশ্মীর ভ্যালিতে ১১ হাজার তাঁত মেশিনে ২৭ হাজার শিল্পী কাজ করতেন। সেই হিসেবে তাদের কাছ থেকে বার্ষিক ১৫ লাখ ৯০ হাজার রুপি আয় হতো যার ১২ লাখ জমা হতো মহারাজার খাতে। বাকিটা থাকত কাশ্মীরের গভর্নরের পকেটে। গভর্নরও হতেন মহারাজার অধীনস্থ, বিশ্বস্ত কেউ (ওজির পানু ও কৃপা রাম প্রমুখ গভর্নর ছিলেন ১৮৬০-এর দিকে)। এই শোষণের বিরুদ্ধে ১৮৬৫ সালের ২৯ এপ্রিল শাল শ্রমিকরা বিদ্রোহ করেন। তারা শ্রীনগরের পুরান শহরের জলডেগার এলাকায় জড়ো হন। মহারাজার পুলিশ তাদের একটি জলাশয়ের পাশে আবদ্ধ করে দেয়। সেখানে ঠাণ্ডা পানিতে পড়ে ২৮ শ্রমিকের মৃত্যু হয়। রসুল শেখ, ইবলি বাবা, আবু কুদুস, সোনা শাহ প্রমুখ নেতাসহ প্রায় ৩০০ শ্রমিক গ্রেপ্তার হয়। রসুল শেখ ও ইবলি বাবা কাস্টডিয়াল নির্যাতনে প্রাণ দেন। কাশ্মীরি লেখক জাভেদ ইকবাল লিখেছেন, হে মার্কেটে ১৮৮৬ সালে শ্রমিকদের আত্মত্যাগের স্মরণে সারা পৃথিবীতে মে দিবস পালিত হয়। কাশ্মীরের শ্রমিকরা তারও প্রায় দুই দশক আগে অধিকারের জন্য

জীবন দিয়েছিলেন। কিন্তু তা বিস্মৃতপ্রায়।[১] কাশ্মীরের মহারাজার বিরুদ্ধে সংঘটিত হওয়া প্রথম ওই বিদ্রোহ কঠোরভাবে দমন করা হয়। ওই আন্দোলন সে অর্থে কোনো দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি সৃষ্টি করতে পারেনি। কারণ, আন্দোলনটি একেবারেই শ্রমিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয়ত, শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ নেতৃত্ব তাতে ছিল না। এখনও সামান্য সংখ্যক শিক্ষিত লোক ওই আন্দোলনটির খবর রাখে। পরবর্তীতে ১৯৩১ সালে মহারাজার বিরুদ্ধে শুরু হওয়া তুমুল গণআন্দোলন দাবানলের মতো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। কারণ, তাতে শিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক দল ছিল। দ্বিতীয়ত, তা শুরু হয়েছিল ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের মতো স্পর্শকাতর বিষয়কে ঘিরে। অর্থাৎ, কাশ্মীরের সংগ্রামে ধর্ম শুরু থেকেই ফ্যাক্টর ছিল।

কাশ্মীরের ইতিহাসে বামপন্থার সবচেয়ে বড় অবদান হলো 'নয়া কাশ্মীর মেনিফেস্টো'। ১৯৪৪ সালে এই মেনিফেস্টো দেওয়া হয়। পাঞ্জাবের ড. বাবা পিয়ারে লাল বেদী ও তার স্ত্রী ফরিদা বেদী (বলিউড অভিনেতা কবির বেদীর বাবা-মা) এই মেনিফেস্টোর রচয়িতা। তারা মার্কসবাদের দর্শনে আকৃষ্ট ছিলেন। এতে একটি কাউন্সিল অব মিনিস্টার্স, প্রতি ৪০ হাজার লোকের বিপরীতে একজন করে নির্বাচিত প্রতিনিধির সমন্বয়ে জাতীয় পরিষদ, স্বাধীন বিচার বিভাগ, সকল নাগরিকের সমানাধিকার, প্রত্যেক নাগরিকের বিবেকের স্বাধীনতা, উপাসনার স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা, শিক্ষা, সম্পদের মালিকানার, কাজ, বিশ্রাম ও সংগঠনের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়ার কথা বলা হয়। নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের ঘোষণা দেওয়া হয় সেখানে। রাজ্যের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার ঘোষণাও ব্যক্ত হয়।[২]

দৃশ্যত নয়া কাশ্মীরকে বিপ্লবী মনের একটি ফসল মনে হয়। ওই কমিউনিস্ট চিন্তকরা কাশ্মীরের দারিদ্র্য ও অশিক্ষার অবস্থা দেখে এবং বিপ্লবের মাতৃভূমি রাশিয়া থেকে কাশ্মীরের অবস্থানগত নিকটবর্তিতার কারণে একে টার্গেট করেছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। তারা কাশ্মীরকে কমিউনিস্ট বিপ্লবের একটি উর্বর ক্ষেত্র হিসেবে দেখেছিলেন। শোষণ বঞ্চনার শিকার হওয়া শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করে বিপ্লবের মন্ত্রে ধাবিত করার মতো সম্ভাবনা সেখানে ছিল নিঃসন্দেহে। কিন্তু বামপন্থী নেতারা সে অর্থে শ্রমজীবী মানুষের কাছে বিপ্লবের স্লোগান নিয়ে যাননি। তারা বরং নেতৃত্বস্থানীয় শেখ আবদুল্লাহকে টার্গেট করেন। কে এম আশরাফ, দানিয়াক লতিফ ও আসান দানেশ প্রমুখ ওই মেনিফেস্টো শেখ আবদুল্লাহর কাছে দেন। সেটাই শেখ আবদুল্লাহ তার দলীয় মেনিফেস্টো হিসেবে গ্রহণ করেন। এর পেছনে তার দলের বিশেষ কোনো আদর্শিক গ্রাউন্ড ওয়ার্ক ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

১৯৪৪ সালের ৩১শে জুলাই, মহারাজা হরি সিংয়ের কাছে ওই মেনিফেস্টো তুলে দেন শেখ আবদুল্লাহ। মহারাজা তা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কাশ্মীর তখন ব্রিটিশ ভারতের অংশ। সুতরাং, মহারাজা তা বাস্তবায়ন করতে পারেননি বা করেননি। আশিক হোসেন ভাট লিখেছেন, 'নয়া কাশ্মীর' ছিল মুসলিম লিগের দ্বি-জাতিতত্ত্বের

ভিত্তিতে আলাদা পাকিস্তান ধারণার একটা সূক্ষ্ম প্রত্যাখ্যান। এই কারণটি মহারাজা ও তার সঙ্গীদের নয়া কাশ্মীর মেনে নিতে আগ্রহী হওয়ার পেছনে কাজ করে থাকবে। এছাড়া, শেখ আবদুল্লাহ এবং তার দলের তখনকার কর্মকাণ্ড মহারাজাকে খুশি করে থাকবে। মহারাজার বিরুদ্ধে ১৯৩১ সাল থেকে আন্দোলন করে আসছিল শেখ আবদুল্লাহর দল। কিন্তু, মেনিফেস্টো ঘোষণার এর এক মাস আগেই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে অসম্মানিত করেছিলেন শ্রীনগরে শেখ আবদুল্লাহ। শেখ আবদুল্লাহর কর্মী মকবুল শেরওয়ানী নর্থ কাশ্মীরের বারামুলা শহরে জিন্নাহকে নিন্দিত করেছিলেন।

ভারতীয় সাংবাদিক অজিত ভট্টাচার্য তার বইয়ে লিখেছেন, শেখ তার মুসলিম কংগ্রেসের নাম বদলে ন্যাশনাল কংগ্রেস করার উদ্দেশ্য ছিল অমুসলিমদের জন্য দলের দরজা খোলা রাখা। অমুসলিমরা অনেকে তার দলে যুক্ত হয়েছিলেন বটে। কিন্তু তাতে মুসলমানদের কাছে আবদুল্লাহর জনপ্রিয়তা ঝুঁকিতে পড়ে। সে অবস্থায় অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের খুশি করার জন্য 'নয়া কাশ্মীরকে' একটা বড় অস্ত্র হিসেবে নিয়েছিলেন শেখ।[৪] এ জন্য একে অনেকে জনগণকে দেওয়া 'রাজনৈতিক ঘুষ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। নয়া কাশ্মীর অনুসারেই শেখ আবদুল্লাহ রাজ্যের প্রধান হওয়ার পর জমিদারি বিলুপ্ত করে কৃষকদের জমি বণ্টন করে দেন। কিন্তু, সেই ঘটনা আবার জমিদার শ্রেণির হিন্দুদের ক্ষেপিয়ে তোলে। আর ততক্ষণে কাশ্মীরকে নিয়ে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়েছে। কাশ্মীর তখন জাতিসংঘে বিচারাধীন ভারত বা পাকিস্তানের সম্পত্তি!

অর্থাৎ, একটা ব্যাপার স্পষ্ট যে, শেখ আবদুল্লাহ মৌলিকভাবে কমিউনিস্ট ছিলেন না।[৫] তিনি জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে আর্থসামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে কমিউনিস্টদের দেওয়া মেনিফেস্টো গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রেক্ষিতে নয়া কাশ্মীর দেওয়া হয়েছিল। বস্তুত, নয়া কাশ্মীর একটা ডকুমেন্ট হিসেবে ছিল পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ও শ্রেণিহীন সমাজের রূপরেখা। কিন্তু, তার প্রয়োগ ঘটেছে এমন নেতার হাত ধরে, যিনি ক্ষমতার জন্য ডানে-বামে সবদিকেই ছোটাছুটি করেছেন। তার পর থেকে সময় যতটা গড়িয়েছে হিন্দু-মুসলিম উভয় দিকে সাম্প্রদায়িকীকরণ হয়েছে কাশ্মীরের। বামপন্থা ক্রমে বিচ্ছিন্ন, গুটি কয়েক মানুষের রাজনৈতিক দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে।

ভারতের মূল ভূ-খণ্ডে বামপন্থী দলগুলো সাধারণত কাশ্মীর ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি সমালোচনা মুখর। তবে, তারা কোনো ক্রমেই ভারতের 'জাতীয় স্বার্থে'র বাইরে গিয়ে কাশ্মীরিদের আজাদির দাবি করে না। এমনটা তাদের পক্ষে সম্ভবও নয়। ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া ঘটনাপ্রবাহ তাই প্রমাণ করে। জম্মু-কাশ্মীরে মোহাম্মদ ইউসুফ তারিগামি নামে একজন নেতা আছেন। তিনি সেখানকার সংসদ সদস্য। তিনি সিপিআইর (মার্কসবাদী) জম্মু-কাশ্মীর কমিটির সেক্রেটারি। তিনিও সবসময় সমস্যা সমাধানের জন্য বিরোধীদের সঙ্গে আলোচনার দাবি করে থাকেন।

নোট/সূত্র

১. Javed Iqbal; *Zaldagar* 1865; Greater Kashmir, P9; May 2, 2015.

২. Sheikh Abdullah (1993), *Flames of the Chinar*; Pp: 108-12

৩. Ashik Hossain Bhat; *New Kashmir Manifesto*; Kashmir Life; 2013.

৪. Ajit Bhattacharjea (2008); *Sheikh Mohammad Abdullah: Tragic Hero of Kashmir*; New Delhi: Roli Books; 71-74.

৫. জাকারিয়া পলাশ, *এমএ থিসিস*, কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয় (ফেব্রুয়ারি, ২০১৬)

১৩
কাশ্মীর সমস্যা, জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক মহল[১]

১৯৪৭ সালের দেশভাগের শর্ত অনুসারে এটি হচ্ছে মালিকানার প্রশ্নে ভারত ও পাকিস্তানের দ্বিপক্ষীয় দ্বন্দ্ব। ভারতের দাবি, কাশ্মীর তার অবিচ্ছেদ্য অংশ- পাকিস্তান এখানে অনাকাঙ্ক্ষিত দখলদার; কাশ্মীরি জনগণের স্বাধীনতা বা পাকিস্তানে যাওয়ার দাবি ভারতের কাছে বিচ্ছিন্নতাবাদ। পাকিস্তানের দৃষ্টিতে কাশ্মীর সমস্যা হচ্ছে 'অমীমাংসিত দেশভাগ'।
এই বিরোধের সূত্র থেকেই ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয় ১৯৪৭ সালে। যুদ্ধ চলাকালেই ১৯৪৮ সালের ১ জানুয়ারি কাশ্মীর সমস্যাকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে তোলে ভারত। জাতিসংঘ তারপর বিভিন্ন রেজ্যুলেশন পাস করে। প্রথম রেজ্যুলেশন (১৯৪৮) অনুসারে জাতিসংঘ একটি কমিশন (ইউএনসিআইপি) তৈরি করে। দ্বিতীয় রেজ্যুলেশন (১৯৪৮) অনুসারে ইউএন কমিশনের কর্মপরিধি ও সদস্য বাড়ানো হয়। মিলিটারি পর্যবেক্ষক ও মিলিটারি উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। এর আওতায় প্রথম ইউএন মিলিটারি অবজারভার গ্রুপ ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান (ইউএনএমওজিআইপি) জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরে আসে ১৯৪৯ সালের জানুয়ারিতে। সেই থেকে এখন পর্যন্ত মিলিটারি অবজারভার গ্রুপের দুটি দপ্তর সক্রিয় আছে কাশ্মীরে। একটি ভারত শাসিত অংশে, অন্যটি পাকিস্তান শাসিত অংশে। স্বাধীন কাশ্মীরের দাবিদার এক বুদ্ধিজীবী এই লেখককে বলেছিলেন, 'মিলিটারি অবজারভার গ্রুপের উপস্থিতি এখনও প্রমাণ করছে যে কাশ্মীর একটি আন্তর্জাতিক বিরোধ'। ১৯৪৮ সালে যুদ্ধবিরতি হয়েছিল দুই দেশের। ১৯৪৯ সালেই জাতিসংঘ একটি মিডিয়েটর গ্রুপ নিয়োগ দেয় জেনারেল নাগটনের নেতৃত্বে। নাগটন কমিটির প্রস্তাবগুলো ছিল–

> ১. রাজ্যের মধ্যবর্তী সিজফায়ার (যুদ্ধবিরতি) লাইনের উভয় পাশ থেকে সেনাবাহিনী সরিয়ে নিতে হবে, যাতে কোনো ভীতিকর পরিবেশ বিরাজ না করে।
> ২. কাশ্মীর ভ্যালি, পুঞ্চ ও জম্মু এলাকার পাশাপাশি উত্তরাঞ্চলের গিলগিত ও বালতিস্তানকেও বিরোধপূর্ণ এলাকা হিসেবে ধরতে হবে। উল্লেখ্য, পাকিস্তান ১৯৪৭ সালে জম্মুর মুজাফফারাবাদ এলাকাসহ গিলগিত ও বালতিস্তানকে তাদের অধিকারে নেয়। এই প্রস্তাবের মাধ্যমে মূলত ১৯৪৭-এর আগে মহারাজার অধীনে থাকা ওইসব এলাকাসহ গোটা রাজ্যকেই বিরোধপূর্ণ হিসেবে মত দেয় ওই কমিটি।

৩. কমিটি প্রস্তাব করে, ওই এলাকাগুলো সেখনকার (existing) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা শাসিত হবে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে।

৪. জাতিসংঘের ৫ জানুয়ারি ১৯৪৯ তারিখের রেজ্যুলেশন অনুসারে জাতিসংঘের কমিশনের তত্ত্বাবধানে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে।

প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে পাকিস্তান রাজি ছিল। কিন্তু ভারত হয়নি। ভারতের অভিযোগ ছিল, পাকিস্তান উপজাতীয় দখলদারদের সহায়তা করার মাধ্যমে মহারাজার ভারতে যোগদানের চুক্তিকে লঙ্ঘন করেছে। অর্থাৎ, ভারতের দাবি ছিল মহারাজা যে ভারতে যুক্ত হয়েছিলেন সেটাই ফাইনাল। সুতরাং যে কোনো উদ্যোগের আগে শর্তহীনভাবে জম্মু-কাশ্মীর থেকে পাকিস্তানি সৈন্য এবং উপজাতীয়/পাঠান লোকদের সরিয়ে নেওয়ার দাবি জানায় ভারত।

১৯৫০ সালের ১২ এপ্রিল ওয়েন ডিক্সনকে মিডিয়েটর করা হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর ডিক্সন 'রিজিওনাল পিলবিসাইট' এর প্রস্তাব দেন। তাতে বলা হয়, পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষে আছে যেসব এলাকা তাদের পাকিস্তানের অধীনে আর যেসব এলাকা স্পষ্টতই ভারতে যোগদানের পক্ষে তাদের ভারতের অধীনে যুক্ত করে দেওয়া হোক। আর কেবল, যেখানে জনমত সুস্পষ্ট নয় সেখানেই গণভোট আয়োজন করা হোক। তিনি মূলত গিলগিত-বালতিস্তানকে পাকিস্তানের অধীনে এবং জম্মুকে ভারতের অধীনে দেওয়ার কথা বলেছেন। আর কাশ্মীর ভ্যালিসহ আশপাশের এলাকায় গণভোটের কথা বলেছেন। তবে ভারত ও পাকিস্তানের কেউই এ প্রস্তাবে রাজি হয়নি। উভয়ই 'আস্ত মুলো'র দাবিদার ছিল। ১৯৫০ সালের ২৩ আগস্ট ওই অস্ট্রেলিয়ান কূটনীতিক ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান।

একদিকে জাতিসংঘের এসব উদ্যোগ চলছিল। অন্যদিকে, ভারত শাসিত অংশে ভারতীয় ব্যবস্থার অধীনে একটি গণপরিষদ গঠনের প্রক্রিয়া চলছিল। অর্থাৎ, মহারাজার পক্ষ থেকে কাশ্মীরের যোগদানকে যৌক্তিক ধরে ভারত এগিয়ে যাচ্ছিল। ব্যাপারটা অনেকটা বিরোধপূর্ণ জমিতে সালিশ চলাকালীন জমির দখল চালিয়ে যাওয়ার মতো। এর বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিক্রিয়া আসে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে। দুই শক্তিশালী নিরাপত্তা পরিষদ সদস্য যৌথভাবে একটা রেজ্যুলেশন দেয় জাতিসংঘে। ফলে, ফের কাশ্মীর ইস্যুর আলোচনা নিরাপত্তা পরিষদে ওঠে ১৯৫১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। অ্যাংলো-আমেরিকান এই রেজ্যুলেশনের পর ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধির বক্তব্য শোনা হয়। পাকিস্তান এটি মেনে নেয়। কিন্তু, নেহরু 'অবজেকশন' দেন। ১৯৫১ সালের ৩০ মার্চ ফ্রাঙ্ক পি গ্রাহাম মধ্যস্থতার জন্য নিযুক্ত হন। তিনি তিন বছর চেষ্টা করেন। কিন্তু, দুই দেশের কাউকে তিনি খুশি করতে পারেননি। ভারতের দাবি ছিল, মহারাজার মাধ্যমে জম্মু-কাশ্মীর ভারতে যোগ দিয়েছে। তাই পাকিস্তানকে সব ধরনের সৈন্য সরিয়ে না নিলে কোনো ধরনের গণভোটের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। পাকিস্তানের বক্তব্য ছিল, প্রস্তাবে পাকিস্তানকে

সব সৈন্য সরিয়ে নিতে বলা হলেও ভারতকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে কিছু সৈন্য রাখার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, যা সুষম নয়। এছাড়া, নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষের সক্রিয় তত্ত্বাবধান ছাড়া গণভোট অবাধ ও সুষ্ঠু হবে না এমন আশঙ্কাও করেছে পাকিস্তান।

এরই মধ্যে ভারত শাসিত অংশে ভারতের তত্ত্বাবধানে শেখ আবদুল্লাহর নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। ভারতীয় সংবিধানে একটি বিশেষ রাজ্য হিসেবে জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরকে ব্যাখ্যা করা হয়। ফের ১৯৫৪ সালে সিকিউরিটি কাউন্সিলে আলোচনা হয় কাশ্মীর সমস্যা। ততদিনে নেহরুর কাছে শেখ আবদুল্লাহর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। সে তখন জেলবন্দি। ১৯৫৭ সালের ২৩ জানুয়ারি বকশি গোলাম মোহাম্মদের নেতৃত্বাধীন জেঅ্যান্ডকে বিধানসভা মহারাজার স্বাক্ষরিত ভারতে যোগদানপত্র অনুমোদন দেয়। এর জবাবে পাকিস্তান বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদে নেয়। সেখানে একটি রেজ্যুলেশন পাস হয়। তাতে আবারও বলা হয়, জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে গণভোটের কথা।

একই বছর ফেব্রুয়ারিতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে অস্ট্রেলিয়া, কিউবা, ইউকে এবং ইউএসএ একটি প্রস্তাব তোলে। তাতে ভেটো দেয় রাশিয়া। পরে এপ্রিল মাসে একটি সংশোধিত প্রস্তাব আনা হয়। সেটি গৃহীত হয়। ১০টি দেশ সমর্থন করে। রাশিয়া ভেটো না দিয়ে নীরব থাকে। সেই আলোকে সুইডিশ নাগরিক গানার জারিং দুই দেশের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি তাদের পক্ষ থেকে গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব দেওয়ার কথা বলেন। তিনি তার রিপোর্টে বলেন, গণভোট হলে নতুন সমস্যার উদ্ভব হবে। সাম্প্রদায়িক বিভেদ নতুন মাত্রা পাবে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। এই রিপোর্টটি ভারত সানন্দে গ্রহণ করে। অর্থাৎ, জারিং কমিশন কোনো সমাধান দেয়নি।

১৯৫৭ সালের ডিসেম্বরে জাতিসংঘ সিকিউরিটি কাউন্সিল আরেক ইউএন প্রতিনিধিকে কাশ্মীর পাঠান। ১৯৫৮ (মার্চ) সালে ওই প্রতিনিধি তার রিপোর্টে প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ে একটি কনফারেন্স প্রস্তাব করেন। যা পাকিস্তান গ্রহণ করলেও ভারত অস্বীকার করে। অর্থাৎ, তিনি ভারত-পাকিস্তানের সরাসরি সমঝোতার পরামর্শ দেন। কিন্তু, দিন শেষে ক্ষমতার রাজনীতিই প্রভাব বিস্তার করে।[২]

স্পষ্টতই, ১৯৫৮ সালের পর থেকে কাশ্মীর সংকটের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের ভূমিকা রিপোর্টিং, বিবৃতি ও উদ্বেগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ১৯৬৫ সালে আবারও কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ বাধে দুই দেশে। রাশিয়ার মধ্যস্থতায় ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি তাসখন্দ চুক্তি সই হয়। সে অনুসারে উভয় পক্ষ একে অপরের এলাকা থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে। দুই দেশ দ্বিপক্ষীয় সমস্যা সমাধানে আলোচনা চালানোর ঘোষণা দেয়। মূলত, এই চুক্তি কাশ্মীর সমস্যাকে হিমাবদ্ধ করে দেয়। এই ঘোষণা কাশ্মীরের প্রতি আন্তর্জাতিক মহলের আগ্রহ কমিয়ে দেয়। তাছাড়া, আমেরিকা তখন ভিয়েতনামে ব্যস্ত। এ ছাড়া পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিও

নানা সংঘাতে ও জটিলতায় জড়িয়ে পড়ে। সব মিলিয়ে, পাকিস্তানের উদ্যোম ও আন্তর্জাতিক চাপ কমে যাওয়া ভারতের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। ওই সময় জাতিসংঘ 'কাশ্মীরি জনগণের রাইট টু সেলফ ডিটারমিনেশনের' কথা উল্লেখ করে রেজ্যুলেশন পাস করলেও রিয়ালিস্ট (বাস্তববাদী) রাজনীতিতে তা সামান্যই গুরুত্ব পায়। উল্লেখ্য যে, জাতিসংঘ চার্টারের চতুর্থ অধ্যায় অনুসারে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ শুধু সুপারিশ করতে পারে। বিরোধে জড়িত পার্টিগুলো তা মানা বা না মানার এখতিয়ার রাখে। সেই এখতিয়ারের বলে দেশ দুটির স্বার্থের দ্বন্দ্বই (কনফ্লিক্ট ওভার ইন্টারেস্ট) টিকে থাকল। জাতিসংঘের পরামর্শমাফিক জনগণের মতামতের প্রাধান্য পেল না। তবে, এখনও জাতিসংঘের দৃষ্টিতে কাশ্মীর একটি অমীমাংসিত 'বিরোধ'।

এখানে উল্লেখ করা জরুরি, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতিসংঘের ভূমিকা ধীরে ধীরে সীমিত হয়ে গেলেও প্রভাবশালী দেশগুলোর অবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গি ও ভূমিকা সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ থেকেছে। ২০০৪ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি প্রতিনিধি দল কাশ্মীর সফর করেছিল। কাশ্মীর ইস্যুতে আন্তর্জাতিক ভূমিকার গুরুত্ব সম্পর্কে সেই দলের মন্তব্যটি এখানে উল্লেখযোগ্য। 'কাশ্মীরি জনগণের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ওপর আস্থা ধরে রাখা কঠিন। কারণ, আন্তর্জাতিক মহল প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘমেয়াদে কাশ্মীর সমস্যার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকেনি। এমনকি তারা কাশ্মীর সমস্যার প্রকৃত দিকগুলোর বিষয়ে মনোযোগও দেয়নি।[৩] ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে রাশিয়ার মধ্যস্থতার কথা আগেই বলা হয়েছে।[৪] চীন যদিও সরাসরি কাশ্মীরের সীমানার সঙ্গে যুক্ত একটি পক্ষ। তার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে অমীমাংসিত রাজ্যটির বিরাট এলাকা। কিন্তু, দেশটি এই ইস্যুতে বরাবরই নীরব কূটনীতির অনুসারি। পাকিস্তানের সঙ্গে দেশটির রয়েছে গভীর ও সুমিষ্ট সম্পর্ক। তবে, সে সম্পর্ক মৌলিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিনিয়োগমুখী।
যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলতে গেলে শুরু করতে হয় রবার্ট হাথাওয়ের বক্তব্য দিয়েই। তিনি মার্কিন অবসরপ্রাপ্ত কূটনীতিক স্ক্যাফারের বরাতে লিখেছেন, 'কাশ্মীর সমস্যার সমাধান বা অন্তত ম্যানেজ করার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগ ১৯৪৮ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত কখনও সম্পৃক্তি (এনগেজমেন্ট) আর কখনও নিশ্চলতার (কুয়েসেন্স) মধ্যে উঠানামা করেছে।[৫] কাশ্মীর ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান প্রসঙ্গে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন স্টিফেন কোহেন। তিনি তার ১৯৯৩-৯৫ সালের মধ্যে লেখা এক নিবন্ধে কাশ্মীর সমস্যার জটিলতা ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'এটি হচ্ছে একটি সন্ত্রাসবাদ, রাষ্ট্রীয় সহিংসতা, ধ্বংস এবং ভীতির সমন্বয়, যা ইতিহাসের কয়েকটি ধাপে গড়ে উঠেছে।'
বিভিন্ন সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও আইজেন হাওয়ারের সময় তাদের অবস্থান ছিল ব্যাপক

কঠোর। নেহরু একবার এক আমেরিকান অফিসারকে বলেছিলেন, 'আমি ওয়াশিংটনের যতসব নীতিবাক্য শুনতে শুনতে ক্লান্ত'। দীর্ঘকাল ধরেই ওয়াশিংটনের বিশ্বাস ছিল, দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে অ্যাংলো-আমেরিকার দীর্ঘমেয়াদি সুসম্পর্ক নির্ভর করবে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের ওপর। কিন্তু, নেহরু রাশিয়ার সঙ্গে সখ্যের সুযোগে জাতিসংঘে তোলা যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের প্রস্তাবে ভেটোর ব্যবস্থা করেছিলেন। পরে বিল ক্লিন্টন ২০০০ সালে কাশ্মীরে সফরের সময় মন্তব্য করেছিলেন, 'কাশ্মীর হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জায়গা'। কিন্তু, মার্কিন কর্তৃপক্ষের সেই মনোভাব বদলে গেছে ক্রমান্বয়ে। স্টিফেন কোহেন তার 'মুভিং ফরওয়ার্ড ইন সাউথ এশিয়া' শীর্ষক নিবন্ধে (মে' ২০০১) লিখেছিলেন,

> 'পৃথিবীর তিনটি বৃহত্তম উপজাতীয়-স্থানীয় (ethnic-domestic) সংঘাতের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ায়। যথা: আফগানিস্তান, কাশ্মীর এবং শ্রীলঙ্কা। সংঘাতের প্রকৃতিগত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের বিবেচনায় তিনটি সংঘাত আলাদা। সুতরাং, এ বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলাদা আলাদা নীতি হওয়া দরকার। এবং, দক্ষিণ এশিয়ায় কাশ্মীর হচ্ছে সবচেয়ে সংকটাপন্ন সমস্যা। এটি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি সম্ভাব্য পারমাণবিক যুদ্ধের ট্রিগার পয়েন্ট। পাকিস্তান সেখানে র‍্যাডিক্যাল জিহাদিদের সহায়তা করছে। যতক্ষণ পাকিস্তান এই সহায়তা অব্যাহত রাখছে ততক্ষণ সেখানে সংঘাত বিস্তারের আশঙ্কা রয়ে যাচ্ছে। ইসলামাবাদের এই ভূমিকার বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে উদ্যোগ নেওয়া দরকার। কাশ্মীর সংকটের দাবিতে ভারত-পাকিস্তান কয়েকটি যুদ্ধ করেছে। ১৯৯৯ সালে কারগিলে সীমিত পরিসরে এক যুদ্ধ হয়েছে। কাশ্মীরকে ছিনিয়ে নেওয়ার মতো শক্তি পাকিস্তানের নেই। কিন্তু, উপত্যকায় সংঘাত ছড়িয়ে দেওয়ার শক্তি তার আছে। ভারত কাশ্মীরকে দখলে রাখার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী। কিন্তু, ঠিকঠাকভাবে শাসন করতে অক্ষম। বর্তমান এই বৃহদাকার সংঘাতের মধ্যে কাশ্মীরি জনগণের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি হুমকির মুখে। আর কাশ্মীরের স্থানীয় নেতৃত্ব দুর্বল এবং দ্বিধাগ্রস্ত। এ সমস্যায় জাতিসংঘ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেউই কোনো সমাধান চাপিয়ে দিতে পারে না। অধিকন্তু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিছু উদ্যোগ নিতে পারে। ১. কাশ্মীরের নেতাদের সঙ্গে ভারতকে একটি অর্থবহ সংলাপে উৎসাহিত করতে পারে। ২. সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান বৃদ্ধিতে ভারতকে সহায়তার প্রস্তাব দিতে পারে। ৩. ইসলামাবাদকে বার্তা দিতে পারে যে, নন-কাশ্মীরি ও সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে সহায়তা অব্যাহত রাখলে তাদের দেশকে সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষক দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।'[৬]

এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়, যুক্তরাষ্ট্র ক্রমে পাকিস্তান ঘেঁষা অবস্থান থেকে মাঝামাঝি একটি অবস্থানে এসেছে। এবং এটা ঘটেছে ৯/১১-এর আন্তর্জাতিক পটপরিবর্তনের পর। তারই ধারাবাহিকতায় এখন খবরের কাগজে প্রায়ই যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের

বিবৃতি দেখা যায়। তাতে 'মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট স্পোকসপার্সন বলে থাকেন, কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত ও পাকিস্তানের নেতাদেরই আলোচনা করা উচিত।'(৭)

প্রসঙ্গত, যুক্তরাষ্ট্রের এক কূটনীতিকের সঙ্গে ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সাক্ষাৎ হয়েছিল এই লেখকের। তিনি কাশ্মীরে গিয়েছিলেন মূলত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে এবং পর্যটনের সম্ভবনা ও নিরাপত্তার অবস্থা যাচাই করতে। কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বাগানে বসে তার সঙ্গে প্রায় দেড় ঘণ্টা আলাপের সুযোগ হয়েছিল। সেখানে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী ও গবেষক ছিল। ওই কূটনীতিকের নাম জর্জ এন. শিবলি। তাকে কাশ্মীরি এক শিক্ষার্থী প্রশ্ন করেছিল, আপনারা চাইলে যেকোন কিছুই করতে পারেন। তোমার দেশ সিরিয়াকে ধ্বংস করে দিয়েছে। কিন্তু তোমরা কেন কাশ্মীর ইস্যুতে কিছু করছো না? তার জবাব ছিল,

> 'আপনি আপনার মতামত নিশ্চিন্তে বলতে পারেন। আপনি ধরে নিতে পারেন আমার গায়ে অনেক মোটা চামড়া আছে। তবে আসলে সিরিয়া নয়। ইরাকের ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকার কথা আমরা বলতে পারি। স্নায়ুযুদ্ধ শেষে আমাদের দেশের এমন একটা অবস্থান ছিল যে, আমরা পৃথিবীর যেকোন স্থানে যা কিছু করতে পারি। সেই প্রেক্ষিতে, জর্জ বুশ ও ডোনাল্ড রামসফেল্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ইরাকে। এটা সত্য, আমি জর্জিয়ায় তিন বছর কাজ করেছিলাম। আমি ইরাকের একনায়ক সাদ্দাম হোসেন এবং তার ছেলেদের নিষ্ঠুরতার কথা জানি। সে ছিল ভয়ানক। সুতরাং, আমরা মনে করেছিলাম ইরাক আক্রমণ করে সাদ্দামকে সরিয়ে দিলেই মানুষ আমাদের বন্দুকের নলে ফুল বসিয়ে অভিবাদন জানাবে। কিন্তু তা হয়নি। যুদ্ধে ৪০০০ মার্কিন সৈন্য নিহত হয়েছে। তার চেয়ে অনেক বেশি নিহত হয়েছে ইরাকি। এটা ছিল আমাদের ভুল।'

কাশ্মীর ইস্যুতে তিনি বললেন, 'আমরা যদি ভারতকে শক্তভাবে কিছু বলি তারা বলবে, আপনারা আমাদের সার্বভৌমত্ব নিয়ে কিছু করতে পারেন না। আমরা কাশ্মীরের মানুষের দুঃখ কষ্টের কথা বুঝি। কিন্তু কিছু করতে হলে সেটা হতে হবে শান্তভাবে (ইন অ্য সফট ওয়ে)।

নোট/সূত্র

১. ফয়সাল মাহমুদ সম্পাদিত ঢাকা থেকে প্রকাশিত (সেপ্টেম্বর, ২০১৬) 'বিবেকের বার্তা' ম্যাগাজিনে 'কাশ্মীর সমস্যা ও জাতিসংঘ' শীর্ষক লেখকের একটি নিবন্ধ প্রকাশ হয়। এই অধ্যায়টি ওই লেখার বর্ধিতাংশ।

২. উপরের তথ্যগুলো দুটি সূত্র থেকে নেওয়া। Ahmed, Samir; Contextualizing Mosharraf's Four Point Formula; Journal of Kashmir Studies, 2012; Pp: 87-105. এবং Sajad Padder; India-Pakistan: Composite Dialogue Process (2015); New Delhi; Pp: 22-30.

৩. J-k.com; *Kashmir, World's Most Beautiful Prison*; http://www.jammu-kashmir.com/archives/archives2004/kashmir20040721a.html (accessed: 14, Oct; 2015)
৪. Srinath Raghavan (2013); 1971: Global History of the Bangladesh War; P 1.
৫. Robert M Hatahway; *Review*; https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/ 2010-03-01/limits-influence-americas-role-kashmir
৬. Stephen P. Cohen; 2001, *Moving Forward in South Asia*; Brookings: Web; Kashmir: The Roads Ahead; 1995.
৭. Greater Kashmir; 26 December, 2015; P. 1.

১৪
কাশ্মীরের রাজনৈতিক অর্থনীতি

কাশ্মীর সমস্যার নানা দিক নিয়ে কথা হলেও অর্থনৈতিক দিকটি আলোচনায় আসে খুবই কম। অথচ, এটিই সব কারণকে ছাপিয়ে গেছে। বিবদমান পক্ষগুলো তাদের আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থের কারণেই মূলত সমাধানের পথে যেতে অনাগ্রহী। পাছে স্বার্থহানি হয়– এই ভয় সবার। ভৌগোলিক ও ধর্মীয়-সাংস্কৃতিকভাবে জম্মু থেকে কাশ্মীরের অনেক তফাতের কথা অন্য অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু, যখন বিষয়গুলো আসে অর্থনীতি কেন্দ্রীক তখন প্রশ্ন আসে স্বনির্ভরতার। আপেল আর শাল চাদরে আজকের যুগের অর্থনৈতিক চাহিদা তো আর মেটানো যায় না। সুতরাং, আমদানি-রপ্তানির প্রশ্ন জরুরি।

প্রথমেই তুলে ধরা দরকার কাশ্মীরের অর্থনীতির স্বরূপ কী? জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে এখনকার সময়ে বলা হয় 'কনজিউমার ইকোনোমি'। অর্থাৎ, যেখানে উৎপাদনের চেয়ে আমদানি বেশি। ভারতের ২৯টি রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভর্তুকি দেওয়া হয় এই রাজ্যের জন্য। কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে রাজ্যটি একটি 'সিকিউরিটি সেনসিটিভ স্টেট'। এমনকি জম্মু-কাশ্মীরের বিমানবন্দরগুলোতেও লেখা আছে 'সিকিউরিটি এয়ারপোর্ট'। এই সিকিউরিটি কাতরতার কারণে কেন্দ্রীয় সরকার প্রচুর ভর্তুকি দেয়। ২০০৩ সালের ভারতীয় গণমাধ্যমের এক রিপোর্ট অনুসারে '১৯৯০-এ সশস্ত্র যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ভারত সরকারের মোট রাষ্ট্রীয় ভর্তুকির ১০ ভাগেরও বেশি খরচ করা হয় জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর রাজ্যে। একজন কাশ্মীরির পেছনে ভারত যা খরচ করে তা অন্য যেকোনও ভারতীয় নাগরিকের জন্য করা ব্যয়ের আট গুণ বলে ওই রিপোর্টে দাবি করা হয়'।[১]
ভারতীয় উন্নয়নের সূচক হিসাব করলে বিহার, উড়িষ্যাসহ অনেক রাজ্যের চেয়ে মানব উন্নয়ন সূচকে জম্মু-কাশ্মীরের অবস্থা ভাল। শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদিতে কাশ্মীরের অবস্থা বেশ অগ্রসর। সাধারণত, ভারতের পক্ষ থেকে বলা হয়, প্রচুর পরিমাণ ভর্তুকি কাশ্মীরিদের দেওয়ার পরও তারা অকৃতজ্ঞ। তারা অকারণে 'আজাদি' নাম করে হইচই করে। শান্তি বিনষ্ট করে। এ বিষয়ে ভারতীয় সৈন্যদের একটি স্লোগান নিয়ে কাশ্মীরি তরুণদের কৌতুক করতে শোনা যায়, 'দুধ মাঙো গে, তো ক্ষীর দেঙ্গে/মাগার, আজাদি মাঙো গে, তো চির দেঙ্গে'। অর্থাৎ, দুধ চাইলে ক্ষীর খাওয়াবো কিন্তু, আজাদি যদি চাও, ছিঁড়ে ফেলবো'। আজাদির দাবি

যাতে ওরা না করে সে লক্ষ্যে 'ক্ষীর-মাখনের' অংশ হিসেবে ওই রাজ্যে দেওয়া হয় ভর্তুকি। যদিও কাশ্মীরিদের অভিযোগ, কৃষি বা ফলের বাগানের উন্নয়নে কোনো ভর্তুকি দেওয়া হয় না, ভর্তুকি দেওয়া হয় সৈন্যদের ভরণ-পোষণ আর জম্মুর সমতল এলাকায় গড়ে ওঠা কলকারখানার জন্য।

কনজিউমার অর্থনীতিকে আরও সহজ করে বললে 'নির্ভরশীল অর্থনীতি'ও বলা যায়। কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক হামিদা নাঈম 'কনজিউমার ইকোনোমি' শব্দটির তীব্র বিরোধিতা করে থাকেন। এই অধ্যাপক কাশ্মীরি জাতীয়তাবাদের সক্রিয় সমর্থক। তিনি বলেন, 'আমাদের অর্থনীতি স্বাবলম্বী ছিল। বিশ্বমানের অর্থনীতি ছিল। ধীরে ধীরে একে নিস্তেজ করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে এবং হচ্ছে।' মনে রাখা দরকার, কাশ্মীর এলাকাটি সমুদ্রসীমাবিহীন। ফলে স্থলপথই এর মূল যাতায়াতের মাধ্যম। পর্বত বেষ্টিত হওয়ায় সুনির্দিষ্ট কিছু পাহাড়ি সুড়ঙ্গ বা উপত্যকার কাছ ঘেঁষেই এর রাস্তাগুলো তৈরি। ইতিহাসের যে সময়টিতে সিল্করুট এশিয়ার পূর্ব থেকে পশ্চিম অবধি বিস্তৃত ছিল তখন থেকেই কাশ্মীরে ছিল যুগোপযোগী রাস্তাঘাট। কাশ্মীর ছিল সিল্করুটের বিভিন্ন কারাভানের বিশ্রামকেন্দ্র। সেখানে গড়ে উঠেছিল সরাইখানা। এ কারণেই কাশ্মীর ঐতিহাসিকভাবে দক্ষিণ এশিয়া ও মধ্য এশিয়া উভয়ের সঙ্গে সংযুক্ত। সাংস্কৃতিকভাবেও বহু সভ্যতার সম্মিলিত চিত্র সেখানে দৃশ্যমান। মধ্য এশিয়া এবং ইরান থেকে ১৪ শতকে প্রায় সাত শ' বুননশিল্পী কাশ্মীরে আসে, যারা শাল/চাদরের শিল্প গড়ে তোলে। কাশ্মীরি সুফি সৈয়দ আলী হামদানি (রহ.) তাদের নিয়ে আসেন[২]। কাশ্মীরের উপকথায় প্রচলিত আছে, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট তার স্ত্রী সম্রাজ্ঞী জোসেফাইনকেও উপহার দিয়েছিলেন কাশ্মীরি শাল।[৩] এমনও কথিত আছে যে, একবার নেপোলিয়ান তার বান্ধবীকে চাঁদের আলোয় উন্মুক্ত দেখতে চেয়েছিলেন। তিনি তার বান্ধবীর গায়ের চাদরটি ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন। এরপর তার বান্ধবী আরেকটা নতুন শাল গায়ে জড়ান। সেটি ছাড়িয়ে নেয়ার পর আরেকটা। এভাবে চাদর ছাড়িয়ে নিতে আর নতুন চাদর গায়ে জড়াতে জড়াতে ভোরের সূর্যোদয় হয়েছিল।[৪] কিন্তু নেপোলিয়ানের স্ত্রীর কাছে সংরক্ষিত কাশ্মীরি শাল শেষ হয়নি। গোটা ইউরোপ জুড়ে কাশ্মীরি পোশমিনা শালের খ্যাতি ছিল এবং তা এখনও আছে।
চতুর্দশ শতকে তৎকালীন কাশ্মীরের বিখ্যাত বাদশাহর নাম জাইনুল আবেদীন। তিনি পাহাড়ি ঝরনার পানিকে নালা কেটে সমতলে প্রবাহিত করেছিলেন যাতে ফসলের মাঠে সেচ কাজে সুবিধা হয়। দক্ষিণ কাশ্মীরের সেসব নালা এখনও অব্যাহত আছে। দক্ষিণ কাশ্মীরের একটি জেলার নাম অনন্তনাগ। এই অনন্তনাগ শব্দটিরও অর্থ হচ্ছে অসংখ্য নালা। সংস্কৃত ভাষায় 'অনন্ত' মানে অসংখ্য আর 'নাগ' মানে নালা। সেই মধ্যযুগ থেকেই কাশ্মীরের মানুষের কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সমাজ ছিল স্বাবলম্বি। এখনও প্রতিটি বাড়িতে তাদের রয়েছে সবজির বাগান। প্রায় সব লোকের

রয়েছে নিজস্ব ফসলের জমি। বিশেষ করে ধান আর ভুট্টার ক্ষেত। তবে, আবহাওয়ার বৈরিতা ও তুষারপাতের কারণে শীতের চার মাস থাকে উৎপাদনহীন। মানুষ বাকি সময়ে উৎপাদিত শস্যের ওপর নির্ভর করে শীতকালে। এমনকি সবজিও শুকিয়ে বা আচার বানিয়ে রেখে দেয় শীতের জন্য। এসবের পাশাপাশি কাশ্মীরের সবচেয়ে জনপ্রিয় অর্থকরি ফসল হচ্ছে আপেল। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই আছে উন্নত জাতের আপেল। ভারতের বাজারের সিংহভাগ আপেল আসে কাশ্মীর থেকে। সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর হলো আপেল পাকার ও সংগ্রহের মাস। ২০১৬ সালে কাশ্মীরে বিক্ষোভ আর কারফিউর কারণে আপেলগুলো সংগ্রহ ও বিক্রিতে ব্যাঘাত ঘটেছে। শ্রীনগর থেকে এক সাংবাদিক জানিয়েছিল, মানুষ দিনে হরতাল ও কারফিউর মধ্যে থাকলেও রাতে তারা আপেল নিয়ে মণ্ডিতে হাজির হয়েছে। কারণ, আপেল পচে গেলে চাষিদেরর আবারও অপেক্ষা করতে হবে রাজ্য সরকারের ভর্তুকির। আর রাজ্য সরকার তো ভারতের অনুকম্পার ওপরই নির্ভরশীল। আপেল ছাড়াও কাশ্মীরে উৎপন্ন হয় ওয়ালনাট (আখরোট), অ্যাপ্রিকট, পিয়ার, পিচ, চেরি, আলমন্ড, আঙুর প্রভৃতি শীতল আবহাওয়ার ফল বা টেম্পারেচার ফ্রুটস।

আখরোটের গল্পটাও খানিকটা তুলে ধরা জরুরি। ভারতের বাজারে সবচেয়ে ভাল মানের আখরোটের (কারনেল বাণিজ্যিক নাম) প্রতি কেজির মূল্য ছিল ২০১৪ সাল পর্যন্ত ১০০০-১২০০ রুপি। ২০১৫ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তার যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় পশ্চিমা কোনো দেশ থেকে আখরোট আমদানি করেন স্বল্প মূল্যে। ফলে ২০১৫ সালে ভারতের বাজারে কাশ্মীরি আখরোটের দাম নেমে যায় ৪০০ রুপিতে। অন্যদিকে সীমান্ত বন্ধ থাকায় এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের কোনো সুযোগ নেই রাজ্যের। ফলে, এই দরপতনের প্রভাব মেনে নিতে হচ্ছে আখরোটের উৎপাদক ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের।[৩]

ষোড়শ শতক থেকে মোগলরা কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর একে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলে। অর্থনীতির ছাত্ররা জানেন, পর্যটন হচ্ছে একটি বহুমাত্রিক অর্থনৈতিক খাত। যেখানে পর্যটন শিল্প বিকাশ হয় সেখানে স্থানীয় প্রায় সব পণ্যের একটি বাজার তৈরি হয়, যার ক্রেতা হয় বিদেশিরা। এটা স্থানীয় পণ্যকে একটা বৈশ্বিক পরিচিতি এনে দেয়। কাশ্মীরেরও সেই খ্যাতি ছিল। শেখ আবদুল্লাহ তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ১৮ শতকের আফগান শাসনামলেও তার পূর্বপুরুষেরা পোশমিনা (পাহাড়ি ছাগলের পশম দিয়ে নির্মিত মিহি চাদর) রপ্তানি করত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাজারে।[৪] পরে ১৮৪৬ সালে ডোগরা মহারাজার কাছে কাশ্মীরকে ব্রিটিশরা বেচে দেওয়ার পরই শুরু হয় নতুন শোষণের অধ্যায়। সমস্ত জমিন ও সম্পদের মালিক হয়ে গেল মহারাজা। মহারাজা বিভিন্ন এলাকায় জমিদার নিয়োগ করলেন। এভাবেই একটি জাতি সম্পূর্ণ গোলামে পরিণত হলো। স্বভাবতই, সেখানে দুর্ভিক্ষ, মহামারী বাড়তে শুরু করে। মহারাজার সুবিধাভোগী কিছু ধনিক শ্রেণিও গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান চরমে ওঠে।

১৯৪৭ সালে মহারাজা কাশ্মীরকে ভারতে যুক্ত করলেও নেহরুর নির্দেশে মহারাজাকে সরে দাঁড়াতে হয়। শেখ আবদুল্লাহ সেখানে প্রধানমন্ত্রী হন। শেখ আবদুল্লাহর অন্যতম ইশতেহার ছিল 'নয়া কাশ্মীর মেনিফেস্টো'। এর মূল কথা ছিল জমির পুনর্বণ্টন। সে অনুসারে মহারাজার কাছ থেকে কাশ্মীরের বিভিন্ন এলাকার জমিদারিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জমিদারির অবসান হয়। কিছু বিতর্ক ছাড়া মোটামুটি সকল

চিত্র ১৪.১: কাশ্মীরি শালের দোকান

কৃষকই সমান হারে বণ্টিত জমির মালিকানা পান। জমিতে ব্যক্তির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমানা করা হয়েছিল ১৮২ ইউনিট। এই প্রক্রিয়ায় প্রায় ৩৯৬ জন জমিদারের কাছ থেকে চার লাখ একর জমি নিয়ে দুই লাখ কৃষককে বিতরণ করে দেওয়া হয়। এই জমি বণ্টনও অন্যতম কারণ যে কাশ্মীরিরা আর্থসামাজিকভাবে মোটামুটি একই রকম, মধ্যবিত্ত ধরনের। মৎস্যজীবী ও পাহাড়ি লোকেরা ছাড়া ওখানকার অন্যদের মধ্যে বৈষম্যের হার তুলনামূলক কম। অনস্বীকার্য বিষয় হলো, শেখ আবদুল্লাহ কাশ্মীরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে সচেষ্ট ছিলেন। এই সময়েই একদিকে পাকিস্তানপন্থী মুসলিম উগ্রবাদ তাকে কমিউনিস্ট আখ্যা দিয়ে বিরোধিতা করছিল। অন্যদিকে আরএসএস-সহ ভারতীয় নিয়ন্ত্রণমুখী হিন্দুত্ববাদীরা তাকে ভারতের শত্রু ও পাকিস্তানের চর হিসেবে প্রচার করে আসছিল জম্মু থেকে। জমি হারানো জমিদারদের অধিকাংশ ছিলেন হিন্দু। শেখ আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে হিন্দুদের একাট্টা হওয়ার এও একটা কারণ বলে অনেকে মনে করেন। ১৯৫৩ সালে শেখ গ্রেপ্তার হওয়ার পর অর্থনৈতিকভাবে রাজ্যটিকে নির্ভরশীল করতে তেমন একটা অসুবিধা হয়নি।[৫]

শেখ আবদুল্লাহ গ্রেপ্তার হওয়ার পর ১৯৫৩ সালে বকশি গোলাম মোহাম্মদকে প্রধান করেছিলেন নেহরু। বকশি দিল্লির আস্থার অধীনে থেকে প্রায় ১১ বছর কাশ্মীর শাসন করেছেন। সে সময়ে বাজারের মূল্যের চেয়ে অনেক কম মূল্যে ভর্তুকি দিয়ে চাল বিতরণ শুরু হয় রাজ্যে। পরে কোনো সরকারই সেই ভর্তুকির চাল বিক্রি বন্ধ করতে পারেনি। এখন তো, ভারতীয় ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্টের অধীনে নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে ৫-১০ রুপি কেজিতে চাল বিতরণ হয় গোটা ভারতেই। কাশ্মীরও তার ব্যতিক্রম নয়। এ প্রসঙ্গে ২০১৫ সালের একটি ঘটনা উল্লেখ করা জরুরি। আমার এক বন্ধুর নিজের ঘটনা এটি। সে জানায়, তার পরিবারের নামে একটিমাত্র রেশন কার্ড ছিল। পরে সে জানতে পারল, অনেক পরিবারের একাধিক রেশন কার্ড আছে। সে গেল সরকারি কর্মকর্তার কাছে। বলল, আমাদের রেশন কার্ড লাগবে। অফিসার জানাল, তোমার ভাইয়ের নামে রেশন কার্ড হয়েছে। সে বলল, ভাই তো বিবাহিত। তার আলাদা সংসার। অফিসার বললেন, ঠিক আছে তুমি তোমার নাম বলো। আর তোমার যেহেতু স্ত্রী নেই, বিয়ে করোনি, একটা মেয়ের নাম বলো। অফিসার ওর স্ত্রীর স্থানে এক মেয়ের নাম বসিয়ে দিলেন। তারপর ওর নামে রেশন কার্ড তৈরি করে দিলেন। সে প্রতি মাসে চাল ও চিনি পাওয়া শুরু করল কম দামে। আমি বন্ধুকে প্রশ্ন করলাম, তুমি এতে সুবিধা পাচ্ছ। কিন্তু এটা কি বৈধ? সে বলল, সবাই এভাবে সুবিধা নিচ্ছে। আমি না নিয়ে বঞ্চিত হবো কেন? অনুভব করলাম, কতটা খুল্লাম খুল্লা অনিয়ম চলে সেখানে। সরকারি কর্মচারিরাও মনে করে, ভারত সরকার মানুষের নিরাপত্তা দেয় না, অধিকার দেয় না। যা দেয় তা থেকে আর আইনের নামে বঞ্চিত করে লাভ কী? বরং যে যেভাবে চায় তাকে সেভাবে দিলেই লাভ!

শুধু চাল নয়, সবকিছুতেই দিল্লির করুণার ওপর নির্ভরশীল হতে হয়েছে পরবর্তী শাসকদের। ডিএনএ ইন্ডিয়ার রিপোর্ট অনুসারে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের অর্থনীতির অন্তত ৫৪০০-৫৭০০ কোটি রুপি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ২০১৪'র সেপ্টেম্বরের বন্যায়। ওই বন্যায় প্রায় ৩০০ লোক মারা যায়। অন্তত ৪৫ লাখ লোক সর্বস্ব হারায়। সেখানে বন্যার পরপরই স্বাভাবিকভাবেই সেনাসদস্যরা উদ্ধার কাজে অংশ নেয়। সেনাবাহিনীর হিসাব অনুযায়ী শ্রীনগরসহ কাশ্মীরের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় দুই লাখ লোককে তারা উদ্ধার করেছে। অনেককে বিমানে করে ফেরত পাঠিয়েছে। এই অভিযানকে 'অপারেশন মেঘ রাত' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যদিও অধিকাংশ সূত্রের দাবি, সেনাবাহিনীর উদ্ধার অভিযানের মূল মনোযোগ ছিল পর্যটন এলাকাগুলোতে আটকে পড়া ভারতীয় ও বিদেশি পর্যটকরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, সৈন্যরা সাধারণ মানুষের উদ্ধারে আগ্রহী হয়নি। এ প্রসঙ্গে কাশ্মীরি সিনিয়র সাংবাদিক মাসুদ হোসেন বলেছিলেন, 'সেনাবাহিনী রাবারের নৌকায় করে উদ্ধার

কাজ চালাচ্ছিল। বন্যার আগেই বিভিন্ন স্থানে টানিয়ে রাখা কাঁটাতারে বিঁধে ওই নৌকা ছিদ্র হয়ে পড়ে। এ নিয়ে ভারতীয় গণমাধ্যমে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় যে, কাশ্মীরিরা সেনাদের নৌকা ডুবিয়ে দিয়েছে!'[৬]

মজার বিষয় হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার কয়েক মাস পর কাশ্মীরের বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য ১৬০২ কোটি রুপির তহবিল ঘোষণা করে। তখন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ৫০০ কোটি টাকার একটি বিল জমা দেওয়া হয় সেনাবাহিনীর উদ্ধার অভিযানের খরচ বাবদ। এই অবস্থাকে সিটিজেন.ইন ব্লগের এক রিপোর্টে 'নিষ্ঠুর রসিকতা' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। রাজ্য সরকার থেকে ৪৪০০০ কোটি টাকার পুনর্গঠন বাজেট দেওয়া হয়। এর বিপরীতে কেন্দ্র থেকে প্রাথমিক বরাদ্দ দেওয়া হয় ৫৫১ কোটি টাকা ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘরগুলো পুনর্নির্মাণের জন্য। একে প্রহসন বলে উল্লেখ করে স্থানীয় রাজনীতিকরা।[৭]

গত মার্চে (২০১৬) প্রকাশিত এক রিপোর্ট বলছে,[৮] ভারতীয় খাদ্য নিরাপত্তা অ্যাক্ট-২০১৩ অনুসারে দরিদ্র প্রত্যেক ব্যক্তি দুই রুপি কেজিতে আটা এবং তিন রুপি কেজি দামে চাল কিনতে পারবেন। এক মাসে একজন পাবেন সর্বোচ্চ পাঁচ কেজি চাল। অতিদরিদ্র পরিবারের ক্ষেত্রে নিয়মটি হলো প্রতি মাসে পরিবার প্রতি ৩৫ কেজি চাল পাবেন পাঁচ রুপি কেজি দরে। নিয়মানুসারে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রায় ৭৩ লাখ লোক দরিদ্র হিসেবে এবং ১৩ লাখ লোক অতিদরিদ্র হিসেবে এই সেবার আওতায় আসে। তবে, ওই অ্যাক্ট ২০১৩ সালে ভারতে পাস করার পরও সেটি জম্মু-কাশ্মীরে ওমর আবদুল্লাহর সরকার অনুমোদন করেনি। কারণ, আবদুল্লাহ পরিবার শুরু থেকেই ভর্তুকি দেওয়া খাদ্য সরবরাহের প্রক্রিয়াকে নির্ভরশীলতার চেষ্টা হিসেবে সন্দেহ করেছে। এছাড়া যুক্তি ছিল, কাশ্মীরের প্রধান খাবার হলো চাল। সেখানে একজন লোক মাসে কমপক্ষে ১২ কেজি চাল খায়। কমদামে প্রত্যেকে পাঁচ কেজি চাল পেলেও তাদের পূর্ণ দাম দিয়ে আরও সাত কেজি চাল কিনতে হয়। পরে, মুফতি সাঈদের সরকার ২০১৫ সালে এই অ্যাক্টটি অনুমোদন দেয়। অবশ্য, ভারতবিরোধী রাজনীতিকরা এই ব্যবস্থাকে 'আজাদি'র দাবির বিরুদ্ধে ঘুষ এবং গভীর ষড়যন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করে।

এই প্রক্রিয়ায় কাশ্মীরের যে কোনো মুখ্যমন্ত্রীকেই ঘুরে ফিরে দিল্লির কাছে 'ভিক্ষার পাত্র' নিয়ে হাজির হতে হয়েছে। কারণ, যারা ভারতীয় ব্যবস্থার অধীনে কাশ্মীরে রাজনীতি করেন, মুখ্যমন্ত্রী হন, তাদের মূল প্রচেষ্টা থাকে জনগণকে বোঝানো যে, আর্থিকভাবে নিরাপত্তা এনে দেব। দিল্লির কাছ থেকে ন্যায্য পাওনা এনে দেব। এই কথা রাখতে গিয়ে তারা বারবারই কঠোর সমালোচনা করেন দিল্লির। কী মুফতি, কী আবদুল্লাহ– সবাই ছিলেন এই পথের পথিক। ২০১৫ সালে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী, খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ড. হাসিব দ্রাবু তার বাজেট বক্তৃতায় বলেন, আমি ভিক্ষার থলি নিয়ে দিল্লি যাব না।[৯] তিনি একজন গবেষক হিসেবে স্বনামধন্য। তার ব্যক্তিগত মতামত হলো, কাশ্মীরের সীমান্ত খুলে দিয়ে যদি দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা

বাড়ানো যায়, আর যদি কাশ্মীরে দুই পাশের মানুষের চলাচল বৃদ্ধি পায় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই অর্থনীতি গতিশীল হবে। তিনি মনে করেন, অর্থনীতি-বাণিজ্য বৃদ্ধি পেলে শান্তি আসবে। তার ধারণা ছিল হাইড্রোপাওয়ার প্রজেক্টগুলো দিল্লির কাছ থেকে রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে। মনে করেছিলেন পাহাড়ি এলাকায় সিমেন্ট শিল্পে বিনিয়োগ বাড়ানো যাবে। গুজরাট মডেলে হয়তো কাশ্মীরেও বিনিয়োগ শুরু করা যাবে। জনমনে ক্ষোভ কমে আসবে। অর্থমন্ত্রী হওয়ার আগে কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক আলোচনায় এসব দৃষ্টিভঙ্গি তিনি বলেছিলেন যেখানে, এই লেখক উপস্থিত ছিল।

কিন্তু তিনি দেখলেন, আসলে অর্থনীতি তিনি যেভাবে চালাতে চান বাস্তবে তা হয় না। কোনো কিছুই স্বাভাবিকভাবে চলে না সংঘাতপ্রবণ এলাকায়। আজ সবকিছু স্বাভাবিক চলছে তো কাল অচল। কখনও কোনো কারণে অচলাবস্থা হবে তা অনুমান করা বা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অর্থমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী কারোরই নেই। আর পুঁজি বা বিনিয়োগ তো হলো 'কবুতরের' মতো, সামান্য গোলমাল যেখানে হয় সেখান থেকে সে উড়ে চলে যায়। এ অবস্থায় ২০১৫ সালে সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ও চলতি সরকারের বিরোধীদলীয় নেতা হিসেবে ওমর আবদুল্লাহ মন্তব্য করেছিলেন, 'ইগো কমান, অর্থের জন্য দিল্লির কাছে হাত পাতুন। তিনি বলেন, আমি মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে দিল্লি যেতাম, আর হাতজোড় করে ভারতের অর্থমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করতাম অর্থছাড়ের জন্য। এটা নিজের জন্য নয়, জনগণের জন্যই করতাম।' এতেই খোলসা হয় মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা কতটুকু। আর কিভাবে রাজ্যটিকে নির্ভরশীল করা হয়েছে ভারতের ওপর।

এই নির্ভরশীলতার আরেকটি প্রেক্ষিত হলো নিরাপত্তা বাহিনী। দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায় এই লেখকের এক সহপাঠী বলেছিল যে, ওদের একটা উচু টিলা ছিল। সেখানে ছিল কয়েকশ' আপেল গাছ। ওই বাগান থেকে বছরে অন্তত তিন লাখ রুপির আপেল বিক্রি হত। দুই দশক আগে ওই জমিটি দখল নিয়ে তাতে ক্যাম্প তৈরি করে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা। আপেল বাগানটি এভাবেই শেষ হয়। এখন ওরা প্রতিবছর জমির ভাড়া বাবদ টাকা পায়। কিন্তু ওদের কোনো আপেল বাগান নেই। এই উদাহরণটি থেকে অনুমান করা যায় কিভাবে একটি স্বনির্ভর অর্থনীতি ক্রমান্বয়ে নির্ভরশীল অর্থনীতিতে পরিণত হয়। কাশ্মীরের জেলায়-মহল্লায় গেলে দেখা যায় যেখানেই উঁচু টিলা সেখানেই আছে নিরাপত্তা বাহিনীর কাঁটাতার ঘেরা ক্যাম্প। মানসরওয়ার লেক, গুরেজ ভ্যালির মতো দর্শনীয় জায়গাগুলোতে নিরাপত্তার প্রয়োজনে জনগণের প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত। শুধু পাহাড়ের টিলা নয়, সরকারি এবং বেসরকারি ভবনও দখলে আছে। ফেব্রুয়ারিতে (২০১৬) প্রকাশিত একটি রিপোর্ট[১০] বলছে, রাজ্যে ১৬৪৮টি ভবন নিরাপত্তা বাহিনীর দখলে রয়েছে। ২৭৮টি সরকারি ভবন, ১৩০২টি ব্যক্তিমালিকানা ভবন, ৪৫টি হোটেল, ৫টি সিনেমা হলো, ১৮টি কারখানা স্থাপনা সেনাবাহিনীসহ বিভিন্ন

নিরাপত্তা বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আছে। ৬৪৭টি আছে সেনাবাহিনীর দখলে। অবশ্য, ওমর আবদুল্লার নেতৃত্বাধীন সরকার (২০০৯-১৪) তাদের ক্ষমতার ছয় বছরে ১৫৫৫টি ভবনকে নিরাপত্তা বাহিনীর দখলমুক্ত করেছিল বলে দাবি করেছে। ভারতীয় তরফ থেকে সুস্পষ্ট কোনো তথ্য প্রকাশিত নয় যে কী পরিমাণ নিরাপত্তা সদস্য কাশ্মীরে আছে। তবে, বিভিন্ন সংস্থার রিপোর্ট অনুসারে এই সংখ্যা প্রায় ৭০ হাজার। এত লোকের বসবাস ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিকে কেন্দ্র করেও আছে একটা অর্থনীতি। সেটাও কাশ্মীরিদের করে তুলেছে নির্ভরশীল। আর এই নির্ভরশীলতার অর্থনীতি স্বভাবতই মধ্যবিত্ত শ্রেণির ক্ষোভকে বাড়িয়ে তুলছে। সব মিলিয়ে গত সাত দশকের রাজনৈতিক বিরোধের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠা সমাজটি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে আজাদি স্লোগানের পতাকাতলে।

অরেকটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া জরুরি। তা হলো, জম্মু ও কাশ্মীর একই রাজ্য হলেও তাদের ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ভিন্নতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক অবস্থাও ভিন্ন। জম্মুর অধিকাংশ এলাকা সমতল এবং প্রায় নাতিশীতোষ্ণ। ফলে জম্মুর কৃষিপণ্য এবং কাশ্মীরের কৃষিপণ্যও ভিন্ন। জম্মু ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সহজে সম্পৃক্ত এবং তার নিরাপত্তা ঝুঁকি কম। ফলে সেখানে কলকারখানা গড়ে উঠেছে বেশি। এ নিয়েও রয়েছে জম্মুবাসী ও কাশ্মীরবাসীর মধ্যে টানাপড়েন। পাশাপাশি জম্মু হচ্ছে সিটি অব টেম্পল। জম্মুর অর্থনীতির সিংহভাগ নির্ভর করে 'মাতা বৈষ্ণু' দেবীর গুহার উদ্দেশ্যে অগণিত হিন্দুধর্মাবলম্বী মানুষের তীর্থযাত্রার ওপর। কেবলমাত্র ওই গুহায় মানুষের উৎসর্গের যে অর্থ তা দিয়ে চলে একটি পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়: 'মাতা বৈষ্ণুদেবী বিশ্ববিদ্যালয়'। এছাড়া ওই তীর্থযাত্রাকে কেন্দ্র করে হোটেল, দোকানপাট, যোগাযোগ সেবা ও রেস্তোরাঁর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন চলে। জম্মুর এই ধর্মীয় পর্যটন কাশ্মীরি শুকনো ফল ও শাল-চাদরেরও একটি বিশাল বাজার। কাশ্মীর থেকে পাকিস্তানমুখী শ্রীনগর-মুজাফফরাবাদ রাস্তাটি উন্মুক্ত না থাকায় কাশ্মীরের সঙ্গে বহির্বিশ্বের যোগাযোগের একমাত্র পথ হচ্ছে এখন জম্মু। এছাড়া আছে বিমান। জম্মু-শ্রীনগর মহাসড়কটি অন্তত ৬০০০ ফুট উঁচু এবং সামান্য বৃষ্টিতে ধস নামার কারণে বন্ধ রাখতে হয়। তুষারপাত হলেও বন্ধ রাখা হয় এই রাস্তা। স্বাভাবিকভাবেই, জম্মু এবং কাশ্মীরের মধ্যে যে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য তাও রাজ্যটির অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামান্য অস্থিরতা সৃষ্টি হলেই সেই বাণিজ্য ব্যাহত হয়। এ প্রসঙ্গে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। সে সময় গরুর চামড়া বহন করার অভিযোগে জম্মুর উদমপুরে এক কাশ্মীরি ট্রাকচালককে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মেরে ফেলে হিন্দু মৌলবাদী একটি গ্রুপ। এ নিয়ে জম্মু এবং কাশ্মীরর রাজনীতিকরা মুখোমুখি অবস্থান নেন। কাশ্মীরে ব্যাপক প্রতিবাদ হয়। অন্যদিকে জম্মুর হিন্দু নেতারা মহাসড়ক বন্ধ করে দিয়ে কাশ্মীরিদের সব ধরনের পণ্যসরবরাহ বন্ধ করার ঘোষণা দেয়। তখন জম্মু চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রধান রাকেশ গুপ্ত কাশ্মীরে গিয়ে গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকারে

এ নিয়ে কথা বলেছিলেন।[১১] তিনি বলেন, 'রাজনীতিবিদরা বিভক্তি সৃষ্টি করছে। অন্যথায় ব্যবসায়ী এবং জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক ও যোগাযোগ সবসময়ই ভাল ছিল।' তিনি দুই এলাকার অর্থনীতির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে বলছিলেন, 'জম্মুতে ম্যানুফ্যাকচারিং কার্যক্রম বেশি। কিন্তু, কাশ্মীরকে পুরোপুরি কনজিউমার এলাকা বলতে পারি না। কাশ্মীরের হর্টিকালচার ও ফ্লোরিকালচার রয়েছে। আপেল, স্যাফরন (জাফরান) এবং রয়েছে হ্যান্ডিক্র্যাফট। সব মিলে জম্মু আর কাশ্মীর উভয়ই ক্রেতা এবং বিক্রেতা একই সঙ্গে। অর্থাৎ, একে অপরের ওপর নির্ভরশীল'।[১২]

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের অর্থনীতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো হাইড্রোপাওয়ার বা জলবিদ্যুৎ। হিমালয়ের অসংখ্য জলপ্রপাত আর স্রোতস্বিনী ঝরনা রয়েছে কাশ্মীরে। প্রাকৃতিক ওই জলপ্রবাহ থেকে অন্তত ১৩-১৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। অনেকে ২২ হাজার মেগাওয়াট সম্ভাবনার কথাও বলেছেন। ২০১৪ সালে জুলাইয়ে নরেন্দ্র মোদি উরিতে[১৩] ২৪০ মেগাওয়াটের (উরি-২) একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প উদ্বোধনকালে বলেছিলেন, পরিবেশবান্ধব জলবিদ্যুৎ খাতে ভারত খুবই মনোযোগী। এজন্য সবরকমের সহায়তা দেওয়া হবে। ওই একই এলাকায় উরি-১ প্রকল্পটি ইতিমধ্যেই চালু আছে যেখান থেকে ৪৮০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এ মুহূর্তে জম্মু-কাশ্মীরের মোট বিদ্যুৎ উপাদনের পরিমাণ আড়াই হাজার মেগাওয়াটের কাছাকাছি। যার মধ্যে রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে আছে ১৪১৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যা মোট উৎপাদনের ৪৫ শতাংশ। বাকি উৎপাদিত বিদ্যুৎ সরাসরি ভারত সরকারের (এনএইচপিসি) তত্ত্বাবধানে। সাধারণত, শীতকালে সেখানে বিদ্যুতের চাহিদা বেড়ে যায়। কারণ, তখন হিটার, বৈদ্যুতিক কম্বলসহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহার বেড়ে যায়। পাশাপাশি শীতকালে প্রাকৃতিক ঝরনাগুলো থেকে পানির প্রবাহ কমে যাওয়ায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদনও কম হয়। তখন কেন্দ্রীয় সরকারের উত্তরাঞ্চলীয় গ্রিড থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করে রাজ্য সরকার। সম্প্রতি প্রকাশিত পাওয়ার বাজেট[১৪] অনুসারে সেখানে ১০৭টি গ্রাম তথা তিন লাখ ৫৬ হাজার বাড়ি বিদ্যুতায়নের আওতার বাইরে রয়েছে। তাতে আরও বলা হয়, রাজ্য সরকার প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের জন্য ৭.৭২ রুপি ব্যয় করে। জনগণ ইউনিট প্রতি ৩.৬৪ রুপি হারে পরিশোধ করে। বাকি ৪.১৮ রুপি রাজ্য সরকার ভর্তুকি দেয়। অবশ্য, সেখানে মিটারবিহীন বিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রবণতা রয়েছে। বিদ্যুতের মালিকানা নিয়েও রয়েছে রাজ্যের সঙ্গে ভারতের টানাপড়েন। কাশ্মীরি নেতারা সবসময়ই দাবি করেন, দিল্লির সরকার কাশ্মীরে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় (ভারতীয়) গ্রিডে নিয়ে যাচ্ছে। আর সেখান থেকে রাজ্যসরকারকে তার জনগণের জন্য বিদ্যুৎ কিনতে হচ্ছে। এটাও ভারতের বিরুদ্ধে কাশ্মীরিদের ক্ষোভের অপর এক কারণ। ২০১৫'র নির্বাচনে মুফতির অন্যতম নির্বাচনী ওয়াদা ছিল ভারত সরকারের কাছ থেকে অন্তত একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে আনা হবে। যদিও তা বাস্তবায়নে সমর্থ হননি

তিনি বা তার মেয়ে মেহবুবা। অন্যদিকে, ভারতবিরোধী শিবিরের দাবি, আজাদি ছাড়া এ অবস্থার অবসান সম্ভব নয়।

কাশ্মীর সমস্যার অন্যতম দিক হচ্ছে পানির উৎসের নিয়ন্ত্রণ। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সিন্ধুবেসিনের ছয়টি নদী বহমান রয়েছে। এগুলো হলো সিন্ধু (ইন্দাস), ঝিলাম, চিনভ, সাতলেজ, রাভি ও বেইস। এগুলো ব্যবহার বণ্টনের জন্য দুই দেশের মধ্যে বিশ্বব্যাংকের মধ্যস্থতায় ইন্দাস ওয়াটার ট্রিটি (সিন্ধু পানি চুক্তি) নামে একটি চুক্তি হয় ১৯৬০ সালে।[১৫] সেই চুক্তি অনুসারে তিনটি নদী নিয়ন্ত্রণ করবে ভারত আর তিনটি নদী নিয়ন্ত্রণ করবে পাকিস্তান। দুই দেশের কূটনৈতিক প্রেক্ষিতে এটি মোটামুটি ভাল চুক্তি বলা যায়। কিন্তু প্রতিটি দেশেই অভ্যন্তরীণভাবে এই চুক্তি সমস্যা হিসেবে হাজির হয়েছে। দেখা গেছে, ভারতের নিয়ন্ত্রণে যে তিনটি নদী রয়েছে তার উৎস কাশ্মীর হলেও মূলত প্রবাহিত হয়েছে পাঞ্জাব এলাকায়। ফলে ওই তিনটি নদীর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভারতের পাঞ্জাব এলাকা ব্যাপক উপকৃত হচ্ছে। বঞ্চিত হচ্ছে পাকিস্তানের পাঞ্জাব। এ নিয়ে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে পাকিস্তানি পাঞ্জাবের রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষোভ আছে।
আবার পাকিস্তানের হাতে ছেড়ে দেওয়া তিনটি নদীর উৎসস্থল হচ্ছে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীর ও তিব্বত। সেখানে পানির অভাবে বিদ্যুৎ সংকটে ভুগছে মানুষ। কাশ্মীরের নাগরিক সমাজ ও রাজনীতিকরা দাবি করে আসছে কেন্দ্রীয় সরকার (ভারত) পাকিস্তানের সঙ্গে এ চুক্তি করেছে। কিন্তু তা জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের সরকারের অজ্ঞাতে। পানির উৎস যেহেতু কাশ্মীরে সেহেতু পানি বণ্টনের চুক্তিতে কাশ্মীরি রাজ্য সরকারকে আস্থায় নেয়া উচিত। ১৯৬০ সালে সিন্ধু পানি চুক্তি ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিকভাবে করেছে। এখন সে চুক্তি পুনরায় সংশোধন করে কাশ্মীরিদের তাতে স্টেকহোল্ডার হিসেবে যুক্ত করার দাবি করা হচ্ছে। প্রায়ই কাশ্মীরি নেতারা বলে থাকেন, যেহেতু ভারত সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে পানি ভাগাভাগি করেছে সুতরাং এখন তাদের উচিত কাশ্মীরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া।
কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত ও পাকিস্তানের আপসহীন মনোভাবের এটাও একটা বড় কারণ যে, কাশ্মীরে তাদের অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ রয়েছে। পাকিস্তানের কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় সেচ ব্যবস্থায় ৬০ শতাংশ পানি সরবরাহ হয় ইন্দাস নদী থেকে, যার উৎস কাশ্মীর। ইন্দাসকে বলা হয় পাকিস্তানের ওয়াটার টাওয়ার। সিন্ধু চুক্তির আগে ১৯৪৮ সালের এপ্রিলে ভারত সিন্ধুর পানি বন্ধ করে দিয়েছিল। এতে পাকিস্তান মারাত্মক বিপদে পড়েছিল। ওই সময় ডেভিড লিলিয়েনথাল (David Lilienthal) দুই দেশের মধ্যে সিন্ধুর পানি সংকট পর্যবেক্ষণ করে লিখেছিলেন, 'বোমা কিংবা কামানের গোলা নিক্ষেপ করে কোনো সৈন্যবাহিনী পাকিস্তানকে এতটা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না, যতটা ক্ষতি করা সম্ভব পানির উৎস স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দিয়ে। এই নদীর পানিই পাকিস্তানের জনগণের কৃষিক্ষেতগুলোকে বাঁচিয়ে রাখছে।'[১৬] অবিভক্ত/বৃহত্তর জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যটি যদি

ভারতের নিয়ন্ত্রণে আসত তাহলে আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলোসহ গোটা আরব বিশ্বে পাকিস্তানের ভূখণ্ড ছাড়াই যুক্ত হতে পারত ভারত। পাশাপাশি চীনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত পাকিস্তানের যোগাযোগ। এটা ভারতের জন্য কৌশলগত বিরাট সুবিধা বয়ে আনত। ফলে, কাশ্মীরের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। একই কারণে পাকিস্তানের পক্ষেও কাশ্মীরকে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়। এই মুহূর্তে কাশ্মীরের একাংশ নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে পাকিস্তান চীনের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছে। সেখানে চীনের অর্থায়নে তৈরি হচ্ছে ইকোনোমিক করিডোর/হাইওয়ে। অন্যদিকে, ভারতকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়া থেকে। ভারতকে এখন আফগানিস্তান যাওয়ার জন্য সমুদ্রপথে ইরান গিয়ে সেখান থেকে ট্রানজিট নিতে হচ্ছে। এই কৌশলগত কারণেই দখল ছাড়তে দুই দেশই নারাজ। এমনকি সুউচ্চ হিমালয়ের বরফ আচ্ছাদিত সিয়াচেনেও দুই দেশের সৈন্যরা অবস্থান নিয়ে আছে তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে।

ক্যামেরন স্ট্রেচারের (২০১১) উপন্যাস 'দ্যা ওয়াটার ওয়ারস' অনুসারে 'এক দেশের সরকার পানি অপচয় করে, নদীতে বাঁধ দেয়, মেরুর জমাটবাঁধা বরফ এমনকি মেঘগুলোকেও নিঃশেষ করে। তারপর বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। ওই উপন্যাসের মূল চরিত্র ভেরা এবং তার ভাই কোনো একটা দেশে চরম পরিবেশ বিপর্যয়ের মধ্যে টিকে থাকার চেষ্টা করে।' কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধাবস্থাকে ২০১৬ সালে জুনে ডিপ্লোম্যাট ম্যাগাজিনের একটি নিবন্ধে ওই উপন্যাসের সঙ্গেই তুলনা করা হয়েছে।

নোট/সূত্র

১. Mani Shankkar Aiyar,; October 14, 2002; *Great Sop Story*; India Today; http://indiatoday.intoday.in/story/jammu-and-kashmir-most-pampered-state-in-india/1/218463.html

২. Fida M Hassnain; *The Impact of Muslim Rule on the Kashmiri Society;* Journal of Kashmir Studies (Vol:III), 2009, pp: 6-36.

৩. Javed Iqbal, Zaldagar 1865; Greater Kashmir, P9; May 2, 2015.

৪. Sheikh Mohammad Abdullah (1983), *Flames of Chinar*, Penguin Books, P2.

৫. Sajad Padder (Feb 15, 2015); *Kashmir's Walnut Industry is Dying Unattended*, Greater Kashmir.

৬. বন্যাপরবর্তী এক সেমিনার হয় কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের গান্ধী ভবনে। সেখানে লেখক উপস্থিত ছিলেন।

৭. 'A Cruel Joke': Centre Diverts Rs 500 Cr To Pay Army *Bill For Flood Rescue* (30 June, 2015).

৮. Bashaarat Masood & Mir Ehsan (03/03/2016); *Why the Food Security Act has Kashmir in a rage*; The Indian Express.
http://indianexpress.com/article/explained/foodsecurityactjammuandkashmirpoklocinarage/

৯. Abid Bashir (June 9, 2015); *Swallow Ego, Seek Funds From Delhi*;
http://www.greaterkashmir.com/news/kashmir/swallow-ego-seek-funds-from-delhi-omar-to-drabu/188682.html

১০. Umar Maqbool (Feb 17, 2016), Greater Kashmir.

১১. Riyaz Ul Khaliq (Oct 19, 2015); *You Never Know Who is Behind Such Attacks. There Are So Many Agencies Working on the Gorund*; kashmirlife.net/

১২. Riyaz Ul Khaliq (Oct 12, 2015); *K-J Chambers Join Hand to Ffight Divisive Elements, Protact J-K's special Status*; Kashmirlife.net/

১৩. IANS (July 14, 2014); *All Help to Exploit Kashmir's Huge-Hydro-power Potential-Modi*; http://www.business-standard.com/article/news

১৪. Department of Ecology Environment and Remote Sensing J&K, http://jkenvis.nic.in/energy_introduction.html

১৫. JK Power Budget 2016-17: *All you wanted to Know*; http://kashmirreader.com/2016/05/30/

১৬. Baba Umar (June 9, 2016); *Kashmir: A Water War in Making?* http://thediplomat.com/2016/06/kashmir-a-water-war-in-the-making/

১৫

রূপের মঞ্জরি, বেদনার নিনাদ

একটা সমাজের চিত্র আঁকছি এই বর্ণনায়। তার ভেতরের নারীদের অবস্থা আলাদা করে না বললে সে চিত্র পূর্ণতা পায় না। তাই কাশ্মীরের কন্যা ও ললনাদের রূপ, গুণ এবং জীবনের কথা কিছুটা তুলে ধরা যাক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে, হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে পুরুষদের পাশাপাশি দেখেছি নারীদের। দেখেছি বৃদ্ধা-যুবতী, ভীত ও সাহসী নারীদের। ঠাণ্ডায় অথবা লজ্জায়, সঠিক কারণটা আমার অজানা, লাল হয়ে যাওয়া গাল দেখেছি নারীর। স্কুল ছুটির পর লাইন ধরে হেঁটে চলা ছোট্ট কিশোরীদের রক্তাভ কপলে কতবার যে হাতের ছোঁয়া দিতে ইচ্ছা হয়েছে তা বলে বোঝাতে পারব না। কিশোরীর চেয়ে একটু বয়সী, তরুণীর দিকে যখন দৃষ্টি দিয়েছি, মনে হয়েছে, গাল ফেটে রক্ত বেরিয়ে এসে এখনি বুঝি আমাকে আহত করবে। তাই দৃষ্টি নত করতে বাধ্য হয়েছি। কালো দীঘল কেশরাশি হাঁটুর নিচে দোল খেতে দেখেছি; তবে খুবই কম, শতকরা দু'একজনের। অধিকাংশের চুল কিছুটা বাদামি আঁচ লাগা হালকা কোঁকড়ানো। রূপসী নারীর দিকে দৃষ্টি পড়ার পর সরিয়ে নিতে ভুলে গিয়েছি কখনও। কারও নির্লজ্জ হাসি আর দুষ্টুমির কাছে আমিই বোকা বনেছি। কেউ সাবলীলভাবে সামনে এসে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ক্যামেরা এগিয়ে দিয়ে একটি ছবি তুলে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে। ছবিটি ক্লিক করেছি। আর কোনো আলাপের সুযোগ না রেখে ধন্যবাদ দিয়ে হাসতে হাসতে চলে গিয়েছে। কারও কারও নীরবতা আর লজ্জার খোলস ভেঙে ভেতরে ঢুকতে ব্যর্থ হয়ে ফিরেছি। পথে চলতে চলতে এক নারীর রূপ দেখে চমকে উঠেছি। পলক ফেরানোর আগেই আরেকজনের দিকে তাকিয়ে হয়েছি স্তম্ভিত। একি? এত রূপসী হয় নাকি! তবে, দূর থেকে উজ্জ্বল-ঝলমল নারীর মুখ দেখে যতটা চমৎকৃত হতাম, কাছে গেলে তার অনেকখানি যেত ফিকে হয়ে। অতি-সুন্দর যেন আমার চোখে সইত না।

বাংলাদেশে প্রচলিত আছে কাশ্মীরের মেয়েরা সুন্দর। শুধু বাংলাদেশ কেন, এ খবর সারা পৃথিবীরই জানা। যদিও সেই সুন্দরের সংজ্ঞা বড্ড পুরুষালি। কাশ্মীরে যাওয়ার আগে ফেসবুকে লিখেছিলাম, 'নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব মানুষই সুন্দও; রূপসী বা রূপময়। কারও রূপ লজ্জার আবরণে আবৃত, লুকায়িত কিংবা পাপাড়ির ভাঁজে মোড়া মঞ্জরির মতো। কারও রূপ আবার উজ্জ্বল, উন্মুক্ত উদ্দাম; উল্লাসে হেসে খেলে কাছে আসে; দৃষ্টি কাড়ে সহজে। সহজে দৃষ্টি কাড়ে বলেই আমরা বলি

'সুন্দর' বা 'সুন্দরী'। সুন্দরের খোঁজে আমরা অনুসন্ধানে ব্যপৃত হই না; আমরা 'চক্ষুমেলিয়া' দেখি না। যাদের লুকায়িত সৌন্দর্য আমাদের দৃষ্টিতে আসে না আমরা বলে দেই তারা অসুন্দর।' এই সুন্দরের বৈচিত্র্যের মধ্যে কাশ্মীরি মেয়ের রূপ হলো যেন আবৃত রাখার পরও অনাবৃত। সে যেন গভীর কোনো খাদ, যার কিনারে গেলে ডুবতে হয়।

এমন সুন্দরের মেলা দেখে একদিন কাশ্মীরের বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সব মেয়েই তো সুন্দর! তোমরা কাশ্মীরি যুবকেরা এত সুন্দরের মধ্য থেকে একটা মেয়েকে বৌ হিসেবে কিভাবে বাছাই করে থাকো? বন্ধুও ঠাট্টা করে জবাব দিল, এজন্যই অনেক (সবাই নয়) কাশ্মীরি যুবক একাধিক প্রেম করে। আজ একজনকে কমিটমেন্ট দেয়। কাল নতুন কাউকে দেখে অস্থির হয়ে ওঠে। তবে, এই বর্ণনার বৃহদাংশ গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শ্রীনগর শহরের মধ্যবিত্তের।
সংখ্যার বিচারে পথে দেখা পাওয়া নারীদের অধিকাংশই হিজাব পরা। বোরখা বা সালোয়ার কামিজের ওপর ওড়না দিয়ে মাথা মোড়ানো, মুখ খোলা। দ্বিতীয় সংখ্যক দেখেছি সালোয়ার-কামিজ ও ওড়না পরা। সামনের দিকে মাথার চুল কিছুটা দেখা যায় এমন। ওড়নার শেষ দিয়ে পেছনের চুলের অগ্রভাগও দেখতে পেয়েছি অনেকের। তৃতীয় সংখ্যা হচ্ছে নেকাব মোড়ানো- সমস্ত শরীর। এমনকি দুই চোখেও কালো চশমার আবরণ দেওয়া। এই সংখ্যা নিরূপণের জন্য একটি সাংখ্যিক গবেষণার কোশেশ করেছিলাম কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে। ৭ই মে ২০১৫ সকাল ৯:৫০ মিনিটে প্রধান ফটকে (স্যার সাঈদ গেট) বসে পর্যবেক্ষণ করেছিলাম ক্যাম্পাসে আগমনরত নারী-মেয়েদের। ২০ মিনিটে সর্বমোট ২০৪ জন নারীকে প্রবেশ করতে দেখেছি। এর মধ্যে হিজাব পরা ছিল ১১৫ জন। সালোয়ার-কামিজ ও ওড়না পরা ছিল ৫৯ জন। কালো নেকাব মোড়ানো ছিল ২২ জন এবং মাত্র ৮ জনকে দেখেছিলাম স্যালোয়ার কামিজের ওপর কোনো ওড়না না পরেই ক্যাম্পাসে আসতে। ৪ জন নারী গাড়ি চালিয়ে এসেছিলেন, ৫ জন এসেছিলেন স্কুটি (মোটরসাইকেল বিশেষ) চালিয়ে। তাদেরও দেখেছি বেশিরভাগ হিজাব পরা। স্কুটি চালিয়ে ছুটে চলা কাশ্মীরি মেয়েদের দেখতে আমার কাছে ঘোড় সওয়ারী দুরন্ত যোদ্ধার মতো মনে হতো। আরেকদিন দুপুরে এক ঝাউগাছের ছায়ায় বসে আলাপ করছিলাম এক বন্ধুর সঙ্গে। পাশ থেকে হেঁটে যাচ্ছিল নারী-পুরুষের দল। সহসা আমার দৃষ্টি বন্দি হলো একজনের দিকে। কালো বোরখার ওপর ঘিয়ে রংয়ের হিজাব। আপাদমস্তক অদৃশ্য। কেবল মুখাবয়ব দৃশ্যমান। দুধেল সফেদ ত্বক আর রক্তাভ গাল সচারাচর দেখা পাওয়া কাশ্মীরি রমনিদের থেকে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নয়। অবনত দুই চোখ হাটার তালে তালে যেন দোদুল্যমান। দৃষ্টি সরিয়ে নিতে যাচ্ছিলাম আর পাঁচটা সাধারণ দিনের মতো। কিন্তু, শেষ মুহূর্তে আমার অনুসন্ধানী মনে একটা খোঁচা লাগল। মনে হলো, কী যেন একটা রহস্য আছে এখানে। ফের

ফেরালাম দৃষ্টি তার দিকে। নিষ্ঠুর মাইক্রোস্কোপিক দৃষ্টিতে তাকালাম তার মুখে। লক্ষ করলাম, কানের লতির পাশ দিয়ে হিজাবের ফাঁক গলে ভুলক্রমে একগাছি বাঁকা লালচুল গাল পেরিয়ে থুতনিতে গিয়ে মিশেছে।

গ্রামীণ কাশ্মীরের নারীরা এখনও সকাল সন্ধ্যা কাজ করে ফসলের জমিতে। বাড়ির মধ্যে, সবজির বাগানে। পাহাড়ি জঙ্গলে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের জন্য। কপুওয়ারা জেলার লোলাব এলাকায় এক নারী জ্বালানি কাঠের খোঁজে সুউচ্চ দেবদারু গাছে উঠেছিলেন। সেখান থেকে ভারসাম্য হারিয়ে নিচে পড়ে গিয়েছেন। স্পটডেড![১] ছোট্ট একটি খবর। কিন্তু, এই খবরটি বলছে, গ্রামীণ নারীরা কী রকম পরিশ্রম করে! ডাল লেকের আশপাশে ও মধ্যে বসবাসকারী গুজার কিংবা হাজি নারীদের দেখেছি মাছ ধরা, আর ঘাসের বস্তা বহন করে ক্লান্ত হয়ে যেতে। তারা রাজধানীর বাসিন্দা। কেন্দ্রে থেকেও তারা প্রান্তিক। কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিকাল পাঁচটার পর মানুষের দেখা মেলে কদাচিৎ। কিন্তু, ওইসব পরিশ্রমী নারীদের দেখা মেলে। তারা ক্যাম্পাসে ক্লাস শেষ হলে আসেন তাদের গরুর জন্য ঘাস কাটতে। ঘাস কেটে বস্তাভরে তারা মাথায় তুলে নিয়ে যান ঘরে। একটি-দুটি গাইগরু তাদের বেঁচে থাকার সবচেয়ে বড় অবলম্বন। ওইসব নারী মাথায় পট্টি বাঁধেন। দুই হাত উপরে তুলে শক্ত করে ধরেন শরীরের সমান ঘাসের বস্তা। তারপর সন্ধ্যার আলো আঁধারিতে হেঁটে হেঁটে ঘরে ফেরেন।

চিত্র ১৫.১: ফেরেন

কাশ্মীরের ঘরে ঘরে ঘুরেছি-বেড়িয়েছি, সেখানেও দেখা হয়েছে শিশুদের, মেয়েদের ও তাদের মায়েদের সঙ্গে। তবে কম। মনে হয়েছে ঘরের মধ্যে নারীরা বুঝি খুবই 'নিরাপদে' লুকায়িত, রক্ষিত-গচ্ছিত, নীরব, নিস্তব্ধ। আমার উপলব্ধি, ঘরে এবং বাইরে কাশ্মীরের মেয়েরা ভিন্ন রকমের। ১০ মে, ২০১৫ তারিখে গ্রেটার কাশ্মীরে (পৃ:৩) একটি খবর এলো, কপুওয়ারা জেলায় গোলাম রসুল খান নামে এক স্বামী তার তিন সন্তানের মা নাজীম জানকে (৬০) পিটিয়ে মেরেছে। উপলব্ধি করলাম, নারীর ওপর ঘরোয়া নির্যাতন কাশ্মীরেও হয়। আরেকটি রিপোর্টে জানাল, নারীদের ওপর বিভিন্ন সহিংসতার ৩-৪টি অপরাধ প্রতিদিন নিবন্ধিত হয় কাশ্মীরের পুলিশের খাতায়। ২০১৪ সালে নারীকে হয়রানি ও উত্যক্তকরণের ১৩০০ ঘটনা পুলিশের কাছে নিবন্ধিত হয়েছে। স্টেট উইমেনস কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে ২০১৪ সালে ১৯০০টি পারিবারিক কলহের ঘটনা

নথিবদ্ধ হয়েছে। এসএমএইচএস হসপিটালের হিসেবে বাড়িতে সহিংসতার জেরে প্রতিদিন ২/৩টি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। এছাড়া অসংখ্য ঘটনা রয়ে গেছে অনুল্লেখিত'।[২] একটি গবেষণার তথ্য অনুসারে কাশ্মীরের ৬২.০৮ শতাংশ পরিবার যৌতুক দিয়ে কন্যার বিয়ে সম্পন্ন করেছে। প্রায় ২০ শতাংশ মুসলিম মেয়ের বিয়ের সময় নির্ধারিত মোহর বাস্তবে পরিশেষ করা হয়নি।[৩] একই গবেষণা অনুসারে প্রায় ৮% পুরুষ দুইজন স্ত্রী গ্রহণ করেছেন। তিন ও চার স্ত্রীর সংখ্যা অবশ্য সীমিত, এক শতাংশের কম। ৪৩ শতাংশ নারী ধর্মীয়ভাবে (ইসলামী শরিয়ত) নির্ধারিত উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বলে দাবি করেছেন।[৪] ফিদা ইকবাল তার কলামে মন্তব্য করেছিলেন, 'Marriage made in heaven and celebrated in Kashmir end at the burn word অর্থাৎ, জান্নাতে সংঘটিত, কাশ্মীরে উদযাপিত বিয়ের সমাপ্তি হয় হাসপাতালের অগ্নিদগ্ধ-ওয়ার্ডে'।[৫] ন্যাশনাল ফেমিলি হেলথ সার্ভে-৩ অনুসারে জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের (আগের তথ্যগুলো কেবল কাশ্মীরের) অন্তত ১৫% নারী কোনো না কোনোভাবে ঘরোয়া নির্যাতনের শিকার হন।[৬] নিবন্ধের শুরুতে তুলে ধরা কাশ্মীরি নারীদের রূপ আর রহম তাদের ঘরোয়া নিপীড়ন নির্মূল করতে কোনো ভূমিকা রাখছে না। এই বক্তব্যটিকে হয়তো ভারত অথবা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য এলাকার নারীদের অবস্থা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত দিয়ে তুলনা করা যায়। কিন্তু, আমার দৃষ্টিতে এটি তুলনা যোগ্য বিষয় নয়। কোনো সমাজে একজন নারীও যদি নিপীড়িত হন, ঘরে কিংবা বাইরে, তাহলে সেটির প্রতিবিধানের উদ্যোগ নেয়া জরুরি। অন্য অনেকের চেয়ে সংখ্যায় কম এই যুক্তিতে নিপীড়নের দায়মুক্তি হতে পারে না। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে নারীদের মোট সংখ্যা পুরুষের চেয়ে সামান্য কম। তবে, গড়ে ৫০:৫০ বলা যায়। শতাব্দী ধরেই অধিকাংশ নারী অর্থনৈতিকভাবে উৎপাদনক্ষম। কাশ্মীরি হস্তশিল্পের বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তাই এর কারণ। তবে, অন্যান্য দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের মতোই কাশ্মীরেও অর্থনীতিতে নারীদের অবদান বা উৎপাদন পরিবারের যৌথ উৎপাদন হিসেবে বিবেচিত হতো। আবহমান কাশ্মীরি সমাজে নারী অসম, অনুত্তম, দুর্বল হিসেবেই চিত্রিত ও চিহ্নিত হয়ে এসেছে।[৭] তবে একথা সত্য, কাশ্মীরের নারীদের আর্থসামাজিক অবস্থা অন্য অনেক স্থানের চেয়ে ভাল। সমাজবিজ্ঞানী ও জেন্ডার স্পেশালিস্ট হুমায়রা শওকত ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় একাধিকবার দাবি করেছেন, জম্মু কাশ্মীরের সমাজ বর্তমানে কম পুরুষতান্ত্রিক। বশির আহমেদ ডাবলা লিখেছেন, জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের নারীদের অবস্থার ব্যাপক উন্নতি শুরু হয়েছে ১৯৩০এর স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরুর পর থেকে। সে সময়ে ঘোষিত নয়া কাশ্মীর মেনিফেস্টে নারী ও পুরুষকে সবক্ষেত্রে সমান অধিকার প্রদানের ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণা ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের নারীদের জন্য সর্বপ্রথম। ১৯৪৭ সালের পর ভারত শাসিত কাশ্মীরে নারীদের টেকনিক্যাল ও প্রফেশনাল শিক্ষা ফ্রি করা হয়।[৮]

অনেক মেয়েকেই, (বিশেষ করে শ্রীনগরের) পরিবারের অগোচরে প্রেম করে দেখেছি। একদিন ক্লাস শেষে ডাল লেকের পাশে বসেছিলাম। লক্ষ করলাম, ছোট্ট একটি ঝাউ গাছের নিচে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে বেশ নিবিড় হয়ে বসে কথা বলছে। মেয়েটার মাথা ওড়না দিয়ে ঢাকা। ছেলেটা তার কোট খুলে মাথার উপর দিয়ে আড়াল সৃষ্টি করে আছে। কিছুক্ষণ যেতেই দূর থেকে তিনজন স্থানীয় যুবক এলো। ওরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই তিন যুবক পৌঁছে গেল ঝাউগাছের পাশে। কোমরের বেল্ট ততক্ষণে তাদের হাতে শোভা পাচ্ছিল আঘাতের অস্ত্র হিসেবে। কোনো কথা-বাত-চিতের আগেই শপাং-শপাং আঘাতে লুটিয়ে পড়ল ছেলেটা। মেয়েটা উঠে দাঁড়াল। হতবিহ্বল হয়ে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল। তারপরই, পেছন ফিরে সোজা হেঁটে চলে গেল। ছেলেটা মার খেতে থাকল। কিছুক্ষণ পর ছেলেটা উঠে দিলো দৌড়। যুবকেরা পেছনে পেছনে মারতে মারতে তাকে নিয়ে গেল। উপলব্ধি করলাম, মেয়েদের প্রতিবাদের ভাষা নেই সেখানে। অবশ্য, উন্মুক্ত স্থানে মুখোমুখি বসে আলাপরত জুটিদের এমন অবস্থায় পড়তে দেখিনি। কাশ্মীরের বন্ধুর কাছে জেনেছিলাম, বোটানিক্যাল গার্ডেনের ভেতরে উন্মুক্ত আলিঙ্গনের সুযোগ মেলে জুটিদের। অধিকাংশ মানুষ একে মনে করে 'ভারতীয়' সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফল।

শ্রীনগরের বাইরে অবশ্য অন্যরকম। দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাঁম জেলার এক গ্রামের নাম জঙ্গলপুরা। সেখানে একটি বাড়িতে কাটিয়েছিলাম একরাত। রাতে খাবার খেয়েছি, সকালে পান করেছি কুলচার সঙ্গে নুনচায়। কিন্তু, নারীদের দেখা মেলেনি। সকালে বেরিয়ে যাবার সময় হয়েছে। আমার বন্ধুরা বেরিয়ে পড়েছে। আমি জুতার ফিতা বাঁধছিলাম সিঁড়িতে বসে। তখন দেখা হলো, ওই বন্ধুর দাদার সঙ্গে। তার হাতে হুকা, পরনে ফেরেন। আমি সালাম দিলাম। তারপর দেখা হলো, ওই বন্ধুর মায়ের সঙ্গে। গায়ে সবুজ ফেরেন। মাথায় আলাদা কাপড়ের পট্টি। আমার দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে হাসছিলেন। আমি সালাম বললাম। পেছন থেকে শুনলাম কেউ বেরিয়ে এসে বলছে আসসালামু আলাইকুম। জুতার ফিতা বাঁধতে বাঁধতে ফিরে তাকালাম। ১২/১৩ বছরের কিশোরী। তার গায়েও ফেরেন। দুই গালে তার টোল পড়া, ভুবনভোলানো হাসি তার ঠোঁটে। নিঃশব্দ দৃষ্টিতে দেখছে আমাকে। সেই দৃষ্টির মধ্যে ছিল বিস্ময়। আমার পাল্টা দৃষ্টি তাতে ছেদ ঘটাল। তার বিস্ময়কে আচ্ছন্ন করল এক রাশ লজ্জা। আমার বন্ধুরা রাস্তায় অপেক্ষা করছে তখন। আমিও বেরিয়ে এলাম।

তিন কাশ্মীরি বন্ধুর সঙ্গে একদিন গেলাম কোকরনাগ বেড়াতে। ফেরার পথে এক মাটির ঘরের সামনে থামলাম। বন্ধুদের পূর্বপরিচিত, তাই দেখা করাই ছিল উদ্দেশ্য। বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যার কাছাকাছি তখন। বৈকালিক নুনচায় পানের ওয়াক্ত হয়েছে। ঘরের মধ্যে ঢুকলাম, শিশু-কিশোরেরা বেরিয়ে এল। সালাম বিনিময় হলো। অতিথি কক্ষে কার্পেট বিছানো। তার ওপর বসলাম। কিছুক্ষণ পরে এলেন,

ষাটোর্ধ্ব এক মা। বন্ধুরা সালাম দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। মা তাদের কাছে গিয়ে একে একে মাথায় হাত বুলিয়ে গালে চুমু খেলেন। আমিও দাঁড়ালাম। সালাম বললাম। মা হাসিমুখে আমাকে শুধালেন, ঠিক পইঠ? আমি মাথা নাড়লাম। বললাম, 'আস্‌ল পইঠ। ঠিক পইঠ?' তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন না। মাথায় হাত দিলেন না। গালে চুমুও খেলেন না। অপরিচিত-বিদেশি বলেই হয়তো। আমার এখনও মনে

চিত্র ১৫.২: মে'রাজের মা চরকা ঘুরিয়ে সুতা তৈরি করছেন, বিমানবন্দর এলাকা, শ্রীনগর

হয়, ওই মায়ের আদর থেকে বঞ্চিত হলোম! পরে আরেকদিন আমার সবচেয়ে সহজ-সরল বন্ধু মেরাজের বাড়িতে দ্বিতীয়বার গিয়েছিলাম। সেদিন ওর মোজি আমার কপালে চুমু খেয়েছিলেন। আমার কাছে, মে'রাজের মা আসলে কাশ্মীরের আমারই মা। মে'রাজের বোনেরা যেন আমারই বোন। প্রথমবার যখন গিয়েছি তখন আমি কাশ্মীরি ভাষার কিছুই বুঝতাম না। দ্বিতীয়বার বেশ কিছু কাশ্মীরি শব্দ বুঝতে শুরু করেছিলাম। আমার মুখে দুচারটা কাশ্মীরি শব্দ শুনে তিনি কী যে খুশি হয়েছিলেন!

শ্রীনগরের লোকাল বাসে যাতায়াত করছি একদিন। মধ্য বয়সী এক মা'র কোলে বছর দুয়েকের শিশু। তার পাশে আমি বসলাম। পিচ্চিটা বড্ড দুষ্টু। ব্যাপক হইচই করছিল। জানালার বাইরে দুই হাত দিয়ে করছিল চিৎকার। কখনওবা আমার দিকে তাকিয়ে ওর মা'কে কী যেন বলছিল। হয়তো আমার গায়ের রং দেখে শিশুটাও বুঝেছিল, আমি বিদেশি। বাচ্চাটার বাঁদরামিতে বিরক্ত মা তখন অতিষ্ঠ। বারবার জড়িয়ে ধরেন। মুখ চেপে ধরেন। কিন্তু, তাতে থামছে না পিচ্চিটা। কাশ্মীরি ভাষায় চিউচিউ করে কী যেন বলছেন মা। ক্ষেপে যাচ্ছেন। আমি বাবুটার গাল ধরে বললাম, চুপ রহ! ইহা পর বেঠো! কাজ হলো না। সে আরও মজা পাচ্ছে। হাসছে। ফের শুরু করেছে হইচই। ত্যক্ত-বিরক্ত মা এবার চপাস-চপাস করে কয়েকটা চড় বসালেন সন্তানের গালে। তারপর বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল মায়ের কোলে নিষ্পাপ শিশুটি। আমি তার লাল গাল, রক্তিম ঠোঁট আর ধবধবে সাদা কপালের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম, কী নিখুঁত সৃষ্টি বিধাতার।

মেরাজের বাড়িতে ওর দুই ভাতিজি মিল্লাত আর মিদ্দাতকে আমি ভালবাসি। চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ুয়া বড়বোন মিল্লাত বড় লাজুক। কাছে আসেনি। দূর থেকে কেবল হেসেছে। ছোটবোন মিদ্দাত পড়ে দ্বিতীয় শ্রেণিতে। মেরাজের বাড়িতে আমার অবস্থানকালে মিদ্দাত ছিল যেন প্রিয় সঙ্গী। আমি বসে ছিলাম বারান্দায়। আশপাশের তিনচারটা শিশু এসে আমার চারদিকে ঘিরে দাঁড়াল। আমি হাতবাড়িয়ে দিলে হ্যান্ডসেক করল। তারপর ক্রমে শুরু হলো হইচই। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের অদ্ভুত খেলার উপকরণ হয়ে পড়লাম। সবাই মিলে আমার চারপাশে ঘুরছে আর কী কী যেন বলছে। আমি মনোযোগ দিয়ে উপলব্ধির চেষ্টা করলাম। একটা শব্দই কেবল বুঝতে পারলাম, 'পা-গল'। খানিক পরে মিদ্দাতকে ডেকে কোলে নিয়ে শুধালাম, কী বলছে ওরা? ও বলল, 'ও বোল রাহা হ্যায়, তুম পা-গাল হ্যায়'। আমি হাসলাম। মজা পেলাম এই ভেবে যে, অনেক অমিলের মধ্যেও 'পাগল' শব্দে মিল পাওয়া গেছে।

সোপিয়ান জেলায় এক বাড়িতে ছিলাম এক রাত। সেখানে দুই শিশু ফারহান ও হানান। তারা রাতে খাবারের প্লেট নিয়ে এসেছিল ভেতরের ঘর থেকে। আমি কাছে ডাকলাম। একজন আসি আসি করে, অন্যজন বলে না। বড়রা অভয় দিলো। বলল, মেহমান। দুজন। করল হ্যান্ডসেক। মুখে তাদের ভাষা নেই। আমি বললাম, কারু কা'থ? কাশীর পইঠ। ঠিক পইঠ? আসল পইঠ ছুয়া? দুজন এমন ভাবে হেসে উঠল যেন, রাজ্যের সব খুশি ওদের ভর করেছে।

আরেকবার বাসের সিটে বসে আছি। বেশ ভিড়। এক মাঝারি বয়সের মা উঠলেন। সঙ্গে বছর দুয়েকের ছেলে আর কিশোরী মেয়ে। সিট না পেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মা-মেয়ে-ছেলে সবাই। আমি ছেলেটাকে কাছে টেনে কোলে বসিয়ে বললাম, 'আপ ইহা পর বেঠিয়ে'। ছেলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে কেঁদে উঠল। আমার মনে পড়ল, আমিতো ভিনদেশি। আমি ওর কাছে অস্বাভাবিক এক ভূত।

কাশ্মীরি ভাষায় ভূত হলো 'ব্রামব্রামচোক'। মাথায় দুইটা মশাল জ্বালানো বিশাল ভয়ঙ্কর ভূতের নাম ব্রামব্রামচোক। মুহূর্তে উঠে দাঁড়ালাম। মাকে বললাম, 'মাজি, আপ বেঠিয়ে'। তিনি বসলেন। বললেন, 'শুকরিয়া'। ছেলেটার কিশোরী বোন আমার দিকে বারবার ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছিল আর হাসছিল। কৃতজ্ঞতার হাসি। ও হয়তো জানে না, বাস-গাড়িতে মা-বোন কিংবা মুরব্বিকে বসতে দেওয়া কেবল কাশ্মীরের সংস্কৃতি নয়, ওই সংস্কৃতি আমারও।

এবার নিয়ে যাই ইতিহাসে। কাশ্মীরি লোককথা, গান-কবিতায় নারীরা আছেন। কেবল উপমা হিসেবেই নয়, কবি হিসেবেও। কেবল নিপীড়নের লক্ষবস্তু নয়। প্রতিবাদের ভোকাল হিসেবেও। ষোড়শ শতকের হাব্বা খাতুন কাশ্মীরি সাহিত্যের এক স্তম্ভ। তিনি ছিলেন ফার্সি ও আরবি ভাষায় দক্ষ। তার বিয়ে হয়েছিল এক নিরক্ষর কৃষকের সঙ্গে। সে বিয়ে টেকেনি। পরে, কাশ্মীরের শাসক[১] ইউসুফ শাহ চাক তাকে বিয়ে করেন। নিরক্ষর কৃষকের স্ত্রী থেকে তিনি হন 'ফার্স্ট লেডি'। মোগল সম্রাট আকবরের শঠতায় নির্বাসিত হন (১৫৮৬) ইউসুফ শাহ। হাব্বা খাতুন সেই বিরহের কথা তুলে ধরেন তার কাব্য আর গানে। এখনও তা কাশ্মীরের লোককথা। পরে খাতুনকে পাঠানো হয় বিহারে। সেখানেই শেষ হন এই নারী কবি আর স্বাধীন কাশ্মীরের শেষ শাসক।

আর গত শতকের শেষের দিকে শুরু হওয়া সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম আর তার রাষ্ট্রীয় প্রতিক্রিয়ায় কাশ্মীরের অর্ধেক জনসংখ্যা নারীদের জন্য বয়ে এনেছে সীমাহীন অনিশ্চয়তা। সারা পৃথিবীর নারী অধিকার কর্মীরা এ বিষয়ে একমত যে, যেখানেই সশস্ত্র সংঘাত হয়, সেখানেই নারীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। তাই নারী অধিকারের আলোচনা হয় দুই পরিবেশে, যুদ্ধকালীন ও শান্তিকালীন। কাশ্মীরও তার ব্যতিক্রম নয়। সংঘাতের জের ধরে স্বজনহারা, বৈধব্য ওখানে নারীর ওপর চাপিয়ে দিয়েছে আরও বেশি দায়িত্ব। তার ফলেই সম্ভবত কাশ্মীরি নারীদের কোমল দৃষ্টির মধ্যে লক্ষণীয় আশ্চর্য রকমের কঠোরতা, আপসহীনতা আর আত্মবিশ্বাস। যুদ্ধে নিখোঁজ হয়েছে যার স্বামী তার জন্য সেখানে রয়েছে আরেকটি নাম। 'অর্ধবিধবা'। এমন নারীর সংখ্যা সেখানে অন্তত দুই হাজার। তাদের কেউ কেউ দুই দশক ধরে অপেক্ষা করছেন প্রিয়জনের ফিরে আসার। তারা জানেন না, তাদের স্বামী আদৌ বেঁচে আছে কিনা! সংঘাতসংকুল সমাজের নারীর জীবনের সকরুণ সেই গল্প আলাদাভাবেই বলতে হবে।

নোট/সূত্র

১. Greater Kashmir; August 30, 2015; 13.
২. The Kashmir Monitor; May 12, 2015; 1.
৩. Bashir Ahmed Dabla, Multi-Dimensional Problems of Women in Kashmir, New Delhi: Gyan Publishing House, 2007. 17-18.
৪. প্রাগুক্ত, ১৬৯
৫. Fida Iqbal; The brutalized society; Greater Kashmir, 15 October, 2015; P8.
৬. Greater Kashmir, May 16, 2015; 1.
৭. Bashir Ahmed Dabla, 2007. 43-44.
৮. প্রাগুক্ত, ৯
৯. শেষ স্বাধীন শাসক ইউসুফ শাহ্ চাক ও হাব্বা খাতুন সম্পর্কে বিস্তারিত পড়ুন চতুর্থ অধ্যায়ে।
১০. এই অধ্যায়টি কাজল ঘোষ সম্পাদিত দৈনিক মানবজমিনের ঈদ সংখ্যা ২০১৬-এ একই শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে মূল লেখাটির সঙ্গে তথ্যসূত্র যুক্ত করা হয়েছে।

১৬
ফৌজিতন্ত্র ও নারী

> ২৫ হাজার সেনা সদস্য মোতায়েন করা সেখানে। এক সময় ওই জায়গার নাম ছিল নাগাম। এখন তা পরিচিত এলাকা-এ-চারার-ই-শরীফ। ভাবখানা এমন যেন, একটা বিজয়ী সৈন্যবাহিনী পরাজিত শত্রুর ঘাঁটিতে প্রবেশ করছে। কয়েক ডজন বিদ্রোহীকে দমনের জন্য তাদের গতি দেখে মনে হচ্ছিল তারা এলাকার সব জনগণকেই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। গোলাম হাসান শাহ দুঃসাহস করে একজন জেসিওকে এই ঔদ্ধত্যের কারণ জিজ্ঞাসা করেছিল। তিনি ওই কর্মকর্তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে তারা যেন কাশ্মীরের মাটিতে ভারতের দূতের ভূমিকা পালন করে। অফিসার এর বিপরীতে জবাব দিয়েছিল, 'দেখনি, পাকিস্তানি আর্মি ঢাকায় মুসলমানদের ওপর কী করেছিল?' একটা মেয়ে এক অফিসারের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আনলেও তা বৈধতা পায় এ কারণে যে, পাকিস্তানের একজন সৈন্যও একই কাজ করেছিল![১]

এভাবেই একটি সেনানিয়ন্ত্রিত এলাকায় নারীর বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত হয়। এভাবে ফৌজিতন্ত্র তার পূর্ণরূপে হাজির হয় একটা সেনানিয়ন্ত্রিত এলাকায়। এক এলাকায় সৈন্যরা তাদের অপরাধগুলোকে এভাবে বৈধতা দেয় অন্য এলাকার দোহাই দিয়ে। ২০০৯ সালে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কাশ্মীরকে গ্রহের সর্ববৃহৎ সৈন্যমোতায়েনকৃত বিরোধপূর্ণ এলাকা[২]। সেখানে আনুমানিক ৬ লাখ ৫৬ হাজার ৬৩৮ থেকে ৭ লাভ ৫০ হাজার ৯৮১ জন সৈন্য মোতায়েন (২০১৫) আছে বলে ধরা হয়[৩]।

এই অবস্থা বুঝতে হলে ফৌজিতন্ত্র (Militarism) সম্পর্কে একটু আলোচনা জরুরি। ফৌজিতন্ত্র এমন এক দর্শন যা বিশ্বাস করে 'অন্যের ওপর বল প্রয়োগে'। বল প্রয়োগের মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান হয় এটা ফৌজিতন্ত্রের মূল বিশ্বাস। সংঘাত নিরসনের জন্য সহিংসতাই সমাধান। রাষ্ট্রীয়-অরাষ্ট্রীয় সবাই ফৌজিতান্ত্রিক হতে পারে। কাশ্মীরিদের মধ্যে কাশ্মীরি জাতিবোধ আছে। তারা মনে করে কাশ্মীরি জাতিসত্তাকে 'স্বাধীন' বা 'মুক্ত' করতে হলে শক্তিপ্রয়োগ করতে হবে। এডমন্ড বার্ক[৪] বলেছেন, প্রত্যেকটা দেশই বলপ্রয়োগে বিশ্বাস করে। জাতীয়তাবাদ সবসময়ই মানুষকে 'আমরা' বনাম 'অন্যরা' এভাবে আলাদা করে। আর যখন জাতীয়তাবাদ যুক্ত হয় ফৌজিতন্ত্রের সঙ্গে তখন ওই 'অন্যরা' হয়ে পড়ে 'শত্রুরা'। আর তখন তাদের হত্যা করা বৈধ হয়ে পড়ে। ফৌজিতন্ত্রের এই চরিত্রের মধ্যে

সবসময়ই নারীকে ভাবা হয় দুর্বল ও অক্ষম হিসেবে। ভাবা হয়, নারী হচ্ছে এমন একটা পক্ষ যাদের নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব পুরুষদের। আর এই ভাবনার কারণেই নারী হয়ে পড়ে নির্ভরশীল। এই ধারণার ভিত্তিতেই যুদ্ধকালে একপক্ষের নারীরা হয়ে পড়ে অন্যপক্ষের টার্গেট। শত্রুপক্ষের নারীদের অমর্যাদা করা হলো তাদের সুরক্ষিত বুহ্য ভেঙে দেওয়ার শামিল। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই পৃথিবীর প্রায় সব যুদ্ধক্ষেত্রে নারীর মর্যাদাহানিকে যুদ্ধের 'অস্ত্র' হিসেবে কল্পনা করা হয়। কাশ্মীরের চিত্রও তার ব্যতিক্রম নয়।

চিত্র ১৬.১: শিশুরা বেড়ে উঠছে সামরিকতন্ত্রের মধ্যে

অধিকাংশ গবেষক একমত যে, নারীরা নিজেরাও এই অবস্থাটিকে মেনে নেয় তাদের ভাগ্য হিসেবে। অনেক সময় মা' নিজেই একজন সামাজিকীকরণের এজেন্ট হিসেবে তার সন্তানকে গড়ে তোলেন এই শক্তিপ্রয়োগের মন্ত্রে। উদাহরণস্বরূপ, সায়রা বানু, একজন কাশ্মীরি বিধবা যার স্বামী নিহত হয়েছেন যুদ্ধে। তিনি তার ১০ বছরের

ছেলেকে একটা খেলনা বন্দুক নিয়ে খেলতে উৎসাহ দেন। আর গর্বের সঙ্গে বলেন, একজন যোদ্ধার সন্তান যোদ্ধাই হবে।[৫] ৬৭ বছর বয়সী এক অবসরপ্রাপ্ত স্কুলশিক্ষিকার নাম হানিফা বেগম। স্বাধীনতার দাবিতে সশস্ত্রবাহিনীর গুলিতে জীবন দিয়েছিল তার দুই ছেলে। তিনি বলেছিলেন, 'আমি আমার দুইটি সন্তানকেই কওমের জন্য উৎসর্গ করলাম। আরও কিছু যদি থাকে আমার, আমি তাও উৎসর্গ করব।'[৬] কাশ্মীরের সাহিত্যও একইভাবে তুলে ধরে বলপ্রয়োগের সংস্কৃতির প্রতি মানুষের সহজাত আস্থা ও বিশ্বাসের কথা। আখতার মুহিউদ্দীন নামে এক লেখক (প্রয়াত) ১৯৯০ সালে তার এক গল্পে লিখেছেন,

> এক মা তার শিশুকে কোলে করে যাচ্ছিলেন। পথে দাঁড়িয়েছিল সশস্ত্র জওয়ান। শিশুটি তাকে দেখে কাঁদছিল। জওয়ান এগিয়ে এসে শিশুটির গালে-মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন। বললেন, 'কুচ পরওয়া নেহি। গোলি নেহি কারুঙ্গা'। মা জবাব দিলেন, 'ও ভয় পাচ্ছে কে বলেছে? ওতো তোমার হাতের বন্দুকটা নিতে চায়।' জওয়ান চিৎকার করল, 'বাস্টার্ড!'

এভাবেই সামাজিকভাবে বেড়ে ওঠে 'আতঙ্কবাদী'। গল্পটির নাম হচ্ছে, 'আতঙ্কবাদী'[৭]। এই গল্পটি থেকে উপলব্ধি করা যায়, সংঘাতপ্রবণ এলাকায় কিভাবে শিশুরা বেড়ে ওঠে আর সেখানকার সাহিত্যও কিভাবে সেই চিত্র তুলে ধরে। ফিলিস্তিনের ফ্রন্টলাইনার্স বা আলজিরিয়ার স্বাধীনতা যোদ্ধাদের ইতিহাসেও এমন অসংখ্য অনুষঙ্গ আছে। নাদীরা সালাউব কিভরকেন (Nadera Shalhoub-Kevorkian) তার লেখায় বলছেন, 'আমেরিকার গণমাধ্যম মনে করে ফিলিস্তিনের মায়েরা খারাপ। তারা তাদের সন্তানদের সন্ত্রাসের প্রতি উৎসাহ দেন। তারা চরমপন্থা সমর্থন করেন। এবং সাধারণত সহিংসতার পৃষ্ঠপোষকতা করে।'[৮] অনুরাধা এম চিনয় (২০০২) তার বইয়েও লিখেছেন[৯] একই কথা দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতে। কাশ্মীরের মেয়েরাও মনে করে, তাদের ছেলেরা বিপুল সংখ্যায় জীবন দিয়েছে, মেয়েরা মর্যাদা ও ইজ্জত হারিয়েছে কওমের স্বার্থে। তাদের অধিকারের জন্য এই সংগ্রামের বৈধতা আছে তারা মনে করে।

কাশ্মীরি নারীদের অবস্থা বুঝতে হলে ধর্মের সঙ্গে তাদের অবস্থানও স্পষ্ট হওয়া জরুরি। সাধারণত কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্যের উপস্থিতিকে বলা হয়, 'একটি মুসলিম জনপদে হিন্দু সৈন্যবাহিনী'। আর সেখানে সশস্ত্র বিদ্রোহকে স্থানীয়ভাবে ব্যাখ্যা করা হয় 'মুসলিম ভূখণ্ড' এবং মুসলিম 'নারী'দের নিরাপত্তার জন্য 'হিন্দু'রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হিসেবে। এমনকি কাশ্মীরি জনগণের অধিকাংশই পাকিস্তানি বা আফগান লোকদের বেশি ভালবাসেন এবং বিশ্বাস করেন কাশ্মীরি পণ্ডিতদের চেয়ে। যদিও পণ্ডিতরা জাতিগতভাবে কাশ্মীরি ভাষা ও সংস্কৃতির অংশ। কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াত অধ্যাপক বশির আহমেদ ডাবলা তার এক গবেষণায় তুলে ধরেছেন, 'উত্তরাধিকার বণ্টনে ধর্ম বঞ্চিত করেছে বলে আপনি মনে করেন কি?' এমন প্রশ্নের

জবাবে ৬২.১৬% নারীই বলেছেন 'না'। বঞ্চিত হইনি।[১০] এ থেকে স্পষ্ট হয়, কাশ্মীরে ধর্মকে প্রশ্ন করার দুঃসাহস সামান্য সংখ্যক লোকই করে। ধর্মের প্রতি এই অগাধ বিশ্বাসকে পুঁজি করে সশস্ত্রপন্থাকে বৈধতা দেওয়া সহজ হয়েছে কাশ্মীরে। ফলে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রাষ্ট্রীয় ফৌজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে অরাষ্ট্রীয় ফৌজের প্রতিরোধকে সমর্থন করেছে। যেমনটা হানিফা বেগম বলছিলেন তার সন্তানের মৃত্যুর পর, 'আমি আমার সন্তানকে আজকের দিনটির জন্যই বড় করেছিলাম। আমি তার শাহাদাতে গর্বিত'[১১]। এভাবে, ধর্ম 'প্যাট্রিয়টিক মাদার' তৈরিতে ভূমিকা রাখে।

অপর একটি বিশেষ ব্যাপার হলো, একজন পুরুষের যখন মৃত্যু হয় এই যুদ্ধে তখন তাকে 'শহীদ' হিসেবে মর্যাদার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। আর একজন নারী নিপীড়িত বা ধর্ষিত হলে কিংবা তারপর মারা গেলে তাকে তেমনভাবে স্মরণ করা হয় না। তার পরিবার বরং এটাকে অমর্যাদার বিষয় মনে করে, যা ধর্ম সাধারণত বলে না। এটা একটা দ্বৈততা। মূলত, একদিকে ধর্মের প্রতি মানুষের রয়েছে অগাধ বিশ্বাস অন্যদিকে ধর্মের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণগুলো ব্যাপকভাবে পিতৃতান্ত্রিক এবং সামাজিক বিধি দ্বারা প্রভাবিত।

অনস্বীকার্যভাবেই, কাশ্মীরে রাষ্ট্রীয় পক্ষ বেশি ক্ষমতাধর এবং তারা সেটা ব্যবহার করেছে। রাষ্ট্রীয় ফৌজিতন্ত্র ব্যাপক সহিংসতা, মৃত্যু ও মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। ফলে, দীর্ঘস্থায়ী 'সামাজিক মূল্য' (Social Cost) দিতে হয়েছে কাশ্মীরি নারীদের। এবং এর সমাপ্তির ব্যবস্থা হয়নি আজও। জম্মু-কাশ্মীরের সাবেক প্রধান বিচারপতি বাহাউদ্দিন ফারুকী মন্তব্য করেছিলেন, 'তিন রকমের সহিংসতা আছে। শাসকদের দ্বারা সংঘটিত টাইরানিক্যাল ভায়োলেন্স (সহিংসতা), যা জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটা বিপরীত দিক থেকে বিপ্লবী সহিংসতার জন্ম দেয়, যা মূলত আত্মরক্ষার নামে শুরু হয়। এরপরে শোষকরা (টাইরান্টস) বিপ্লবীদের জবাব দেয় রিপ্রেসিভ (ধ্বংসাত্মক) সহিংসতা দিয়ে।'[১২]

ইয়োহান গালটুং এজন্যই সহিংসতাকে বলেছেন একটি চক্র যা শেষ হয় না। তিনি সহিংসতাকে বলেছেন 'কাঠামোর মধ্যে লুকায়িত'[১৩]। কাশ্মীরি কলামনিস্ট মেহমুদ-উর-রসিদ লিখেছেন, 'একটা সংঘাতপ্রবণ এলাকায় দৃশ্যমান আর অদৃশ্যমান কাঠামোবদ্ধ সহিংসতাগুলোর গভীর ভিত্তিভূমি থাকে। হঠাৎ করে, একটা নতুন ধরনের সহিংসতার উদ্ভব হওয়া সেখানে সবসময়ই স্বাভাবিক'[১৪]। স্বাভাবিকতাই সেখানে অস্বাভাবিক।

যেমনটা এক যুবক মন্তব্য করেছিল, 'আমি সংঘাতের মধ্যে জন্ম নিয়েছি ১৯৯২ সালে। এই সংঘাতের মধ্যেই বেড়ে উঠেছি। সৈন্য নেই, সংঘাত নেই– এমন

শান্তিপূর্ণ অবস্থা কেমন তা সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। সুতরাং, এখন যদি কাশ্মীরে ফৌজিতন্ত্রের অবসান হয় আমার আচরণ কেমন হবে? আমি আমার মা, বোন কিংবা অন্য কোনো নারীর সঙ্গে কী আচরণ করব?'

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে কাশ্মীরের ফৌজিতন্ত্র এবং নারীর ওপর তার প্রভাব সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করা সম্ভব। ১. কাশ্মীরে রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় উভয় ধরনের ফৌজিতন্ত্র উপস্থিত। ২. ধর্ম ও তার সমাজপ্রদত্ত ব্যাখ্যাসমূহের একটা ভূমিকা আছে ফৌজিতন্ত্র বিকাশের সঙ্গে। এর মাধ্যমে নারীকেও ফৌজিতন্ত্রের অনুসরণে আগ্রহী করে তোলা হয়। সমাজের মধ্যে 'নিজেদের' লোকেরা শত্রুপক্ষের কোনো নারীর সম্ভ্রমহানি করলে তা 'দায়মুক্তি' পেয়ে যায়। আর, 'নিজেদের' সমাজের কোনো নারী 'শত্রুপক্ষ' দ্বারা আক্রান্ত হলে তা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা হয়, অস্বীকার করার চেষ্টা হয়, গোপন করার চেষ্টা হয়। সংঘাতে 'আমাদের' কোনো পুরুষ প্রাণ দিলে তাকে মহান হিসেবে উল্লেখ করা হয়, কিন্তু, কোনো নারী জীবন দিলে তা খুব একটা স্মরণ করা হয় না। ৩. যেহেতু কাশ্মীরের সংঘাত সীমিত হয়ে পড়েছে। এখন সেখানকার ফৌজিতন্ত্র মানুষের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। মানুষের ঘরে, পরিবারে– সবখানে ঢুকে পড়েছে ফৌজিতন্ত্র।

সর্বোপরি, নারীরা সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ধর্ষিত হয়, নিপীড়িত হয় এ পক্ষ অথবা ওই পক্ষের হাতে। যেমনটা, নাঈমা মেহজুর লিখেছেন,

> '১৯৯৫ সালে চারার-এ-শরীফে অভিযানের পর সেখানে অনিরাপদভাবে হনুফা নামে এক যুবতীকে রেখে চলে যায় সবাই। তার ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়, মা-বাবা নিহত হয়েছিল, ভাইয়েরা আত্মগোপন করেছিল, তার বাগদত্ত যুবক অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। তাকে ফেলে রাখা হয়েছিল প্রতিবেশীর করুণার উপর। তারা তাকে ফেলে গিয়েছিল 'আজাদি পছন্দী'দের ভরসায়, তারাও ওকে ফেলে গিয়েছিল 'মূলধারার' ক্ষমতাসীনদের কাঁধে সর্বশেষ সে এসে পড়ল সমাজের ঘাড়ে। শেষমেশ, তাকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল 'অমুক-তমুক' গ্রুপের সমর্থক বলে।'[১৫]

উপরের বর্ণনায় ফৌজিতন্ত্রের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ও স্বাধীনতাকামী সশস্ত্রতার মধ্যে নারীর অবস্থাকে ওই চিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। স্বভাবতই, যেকোনও সংঘাতপ্রবণ এলাকায় নারীর ভোগান্তির কয়েকটি সাধারণ দিক থাকে। সেগুলো হলো, ১. সেখানে নারীর শরীরকে আলাদা যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে মনে করা হয়। ফলে নারীদের নিপীড়ন করা হয়। মনে করা হয় প্রতিপক্ষের নারীর অমর্যাদা করা মানে হলো তার কওমকে অমর্যাদা করা। এজন্য ধর্ষণকে যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে দেখা গেছে প্রায় সবখানে। ২. কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারী নিজেই যুদ্ধে যোগ দেয়। সেখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুদ্ধে অংশ নিয়ে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। ৩. নারী নানাবিধ কারণে পতিতাবৃত্তিসহ নানা অসম্মানজনক কাজের দিকে ঝুঁকে পড়তে বাধ্য হতে পারে। ৪. সর্বোপরি, নারীর

জীবনে নেমে আসে অবর্ণনীয় 'সামাজিক অবমূল্যায়ন' (Social Cost)। এই চারটি দিক থেকেই কাশ্মীরি নারীদের অবস্থা ব্যাখ্যা করা দরকার।

প্রথমত, নারীকে কল্পনা করা হয় জাতীয় নিরাপত্তা ও মর্যাদার প্রতীক। এ কারণে, কোনো জাতির নারী ধর্ষণ করাকে মনে করা হয় ওই জাতিকেই ধর্ষণ করা। কাশ্মীরের ক্ষেত্রেও এমনটি হয়েছে বলে মনে করা হয়। ১৯৯৫ সালে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের রিপোর্টে বলা হয়, নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা যেসব নারীকে বিদ্রোহীদের সহানুভূতিদানকারী বলে মনে করে তাদের টার্গেট করে ধর্ষণ করে থাকে। তাদেরকে ধর্ষণের মাধ্যমে নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা পুরো জাতিকে মর্যাদাহানির মাধ্যমে শাস্তি দিয়ে থাকে।'[১৬]

সাধারণত মিলিটারি টহল দলের ওপর কোনো হামলা হলে তার প্রতিক্রিয়ায় তারা আশপাশের দুই-একটা এলাকায় ঢুকে সেখানকার নারীদের ধর্ষণ করে আসত। এমন একটা ঘটনা ঘটে ১৯৯২ সালের ১ অক্টোবর। হান্ডওয়ারা জেলার বাখিকার গ্রামে একটা অপারেশন চালিয়ে ফেরত যাওয়ার সময় বিএসএফের একটা দলের ওপর হামলা চালায় বিদ্রোহীরা। একজন বিএসএফ সদস্য এতে প্রাণ হারান। এর প্রতিক্রিয়ায় বিএসফের ওই দলটি পাশের বাতেকোত গ্রামে হামলা চালিয়ে ১০ জন মানুষকে হত্যা করে। ঘরবাড়ি ও ধানের গোলায় আগুন লাগিয়ে দেয়। ওই গ্রামে হামলার পর তারা পাশের গুরিহাকার গ্রামে গিয়ে বেশ কয়েকজন নারীকে ধর্ষণ করে।[১৭]

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের রিপোর্টে একই রকম কিছু ঘটনা ছিল যেখানে বিদ্রোহীরা নারীদের ধর্ষণ করেছে এ কারণে যে, তাদের পরিবারের লোকেরা সরকারি বাহিনীকে তথ্য সরবরাহ করেছে অথবা বিদ্রোহীদের বিরোধিতা করেছে, অথবা অন্য বিদ্রোহী গ্রুপের সমর্থক ছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, একটি বিদ্রোহী গ্রুপের লোকেরা নারীকে ধর্ষণের পর হত্যা করেছে অন্য বিদ্রোহী গ্রুপের পরিবারের হওয়ার কারণে। কোথাও নারীকে জিম্মি রাখা হয়েছে তাদের স্বজনদের ধরার জন্য। অন্য এক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এক দল বিদ্রোহী একসঙ্গে কোনো নারীকে আটকে রেখে অপমানিত করেছে এবং তার পরিবারের বাকি সবাইকে হুমকি দিয়েছে যে বিদ্রোহীদের নেতার কাছে ওই নারীকে তুলে না দিলে সবাইকে হত্যা করা হবে। এমন ঘটনাকে 'জোরপূর্বক বিয়ে' হিসেবে স্থানীয়রা স্বীকার করেছিল।[১৮] এভাবেই নারীর শরীরকে আলাদা যুদ্ধের ময়দান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে কাশ্মীরেও।

দ্বিতীয়ত, অনেকে মনে করেন পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও সশস্ত্র হওয়া দরকার। এ নিয়ে জেন্ডার বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। অনেকে মনে করেন, রাষ্ট্রে পুরুষ যেমন সৈন্যবাহিনীতে অংশ নেয়, নারীকেও সমান হারে অংশ নিতে হবে। আবার অন্যপক্ষ মনে করে, নারীরা শান্তির দূত। নারী যুদ্ধবাজ হতে পারে না। তারা যুদ্ধ ও অস্ত্রের বিরুদ্ধে মায়া, মমতা, সহানুভূতির ছোঁয়া দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। অনেকে আবার মনে করে যুদ্ধক্ষেত্রে নারীরা অনিরাপদ। গ্যালিয়া

গোলান (১৯৯১) ইসরাইলের প্রেক্ষিতে যেমন বলছিলেন, 'ইসরাইলি ডিফেন্স ফোর্সে পুরুষরা হলো একমাত্র লিঙ্গ যারা থাকতে পারে। কেননা, নারীরা শত্রুপক্ষের হাতে বন্দি হতে বা ধর্ষিত হতে পারে।'[(১৯)] এই অবস্থা কেবল ইসরাইল নয় অন্যত্রও আছে। ভারতে সর্বমোট ২৬টি সৈনিক স্কুল আছে যেগুলোতে শিশুদের সেনাবাহিনীর উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা কারিকুলাম রয়েছে। এ সব স্কুল সম্পূর্ণভাবেই ছেলেদের জন্য। অনুরাধা এম চিনয় লিখেছেন, এমনকি যদি কোনো মেয়ে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেয়, তাকে শেখানো হয় তোমার মধ্যে লুকায়িত নারীটিকে হত্যা করো।[(২০)] অর্থাৎ, ফৌজিতন্ত্রে শক্তিপ্রয়োগের যে দর্শন তাতে 'কোমলমতি নারী'র কোনো স্থান নেই। এ কারণেই অনেকে নারীর সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের বিরোধিতা করেন।

কাশ্মীরে সশস্ত্র বিদ্রোহ বা স্বাধীনতার জন্য জিহাদ চলেছে প্রায় তিন দশক ধরে। কিন্তু, কোনো নারী অস্ত্র তুলে নিয়েছে বা বিদ্রোহী দলে যোগ দিয়ে জঙ্গলে অবস্থান করেছে এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। নারীদের সরাসরি সশস্ত্র সংগ্রামে যোগ দিতে দেখা গেছে শ্রীলঙ্কার তামিল টাইগারদের কিংবা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মাওবাদীদের মধ্যে। ১৯৫৪ সালের ফরাসিদের বিরুদ্ধে আলজিরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনে[(২১)] দেখা গেছে মুসলিম নারীদের সরাসরি অস্ত্র হাতে নিতে।

কাশ্মীরি নারীরা সরাসরি অস্ত্র তুলে না নিলেও তারা যে মনস্তাত্ত্বিকভাবে তীব্র ভারতবিরোধী তা বলার অবকাশ নেই। তারা বরং ছেলেদের চেয়ে বেশি আপসহীন। উইমেন্স টেস্টিমনিতে লেখা হয়েছে, 'কাশ্মীরের প্রত্যেক নারী হচ্ছেন একজন সত্যিকার মুজাহিদ– ন্যায়ের পথে যুদ্ধরত। তারা একটা অহিংস প্রতিরোধ পরিচালনা করে যা স্বাধীন কাশ্মীরের স্বপ্নকে সাহসের সঙ্গে বাঁচিয়ে রেখেছে। কাশ্মীরি নারীরা ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর নিষ্ঠুর নিপীড়নের টার্গেট ছিল এই সংগ্রামে তাদের সমর্থনের শাস্তি হিসেবে।[(২২)] অর্থাৎ, কাশ্মীরি সশস্ত্রতায় নারীর অংশগ্রহণ পরোক্ষ। নারী সেখানে সশস্ত্রতার সমর্থক এক সক্রিয় এজেন্ট। কিন্তু, সশস্ত্রতায় সরাসরি অংশ নেয়া কোনো পক্ষ নয়।

তৃতীয়ত, ইরাক যুদ্ধের ক্ষেত্রে অনেক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে যেখানে দেখা গেছে যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যরা নানাভাবে পতিতাবৃত্তির পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। সশস্ত্র গাড়িতে করে কুয়েত থেকে বাগদাদে পতিতাদের পরিবহন করা হয়েছে (হাফিংটন পোস্ট ২০০৮)। বসনিয়ায় মার্কিন কোম্পানি ডিনকর্প (DynCorp) সৈন্যদের জন্য যৌনদাসী সরবরাহের অভিযোগও প্রচারিত হয়েছিল ২০০২ সালে। ডিনকর্পের কর্মকর্তারা ধরা পড়েছিল নারী পাচারের সময় বসনিয়ায়। কিছু কিছু তথ্য প্রমাণ করে, এমন ঘটনা ইরাকেও ঘটেছিল। ফিলিপাইন, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ডেও মার্কিন সৈন্যদের বিরুদ্ধে নারী পাচার ও পতিতাবৃত্তির পৃষ্ঠপোষকতার অভিযোগ আছে। গালফ ওয়ার, আফগান ও ইরাকের যুদ্ধেও আমেরিকান সৈন্যরা মধ্যপ্রাচ্যে নারীপাচারে জড়িত হয়েছিল।

গালফ ওয়ারের পরে কঠিন অর্থনৈতিক অবরোধ অনেক ইরাকি নারীকে পতিতাবৃত্তির দিকে ঠেলে দিয়েছে। যৌন ব্যবসা এতটা বেড়েছিল যে, ১৯৯৯ সালে সাদ্দাম হোসেন বাগদাদে একটা এলাকা গুড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যা অনেক নারীর জীবন কেড়ে নেয়। ইরাকের মধ্যে চীনা, ফিলিপিনো, ইরানি ও পূর্ব ইউরোপের নারীদের আমেরিকান ও অন্যান্য পশ্চিমা সৈন্যদের বিনোদনের জন্য ইরাকে সাপ্লাই দেওয়া হয়। আফগানিস্তান-কাতারসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে যেখানে স্থানীয় নারীদের সহজে পাওয়া সম্ভব নয় সেখানে চীনা মেয়েদের পাচার করা হয়েছে।[২৩] এসব তথ্য থেকে নিশ্চিত করে বলা যায়, যুদ্ধক্ষেত্রে নারীদের পতিতাবৃত্তির দিকে ঠেলে দেওয়ার প্রবণতা থাকে। অনুসন্ধান ছিল যে, কাশ্মীরে এমন ব্যাপার ঘটেছিল কিনা? বা ঘটে থাকলে তা কী মাত্রায় হয়েছিল। বস্তুত কাশ্মীরের প্রেক্ষিতে এই বিষয়টির পক্ষে সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ পাওয়া খুবই কঠিন। কারণ, দুই দেশের গণমাধ্যম এখানে সুস্পষ্টভাবেই পরস্পরবিরোধী তথ্য হাজির করে থাকে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিষয়ে কিছু তথ্য দু-একটা পাকিস্তানি খবরের মাধ্যমে এসে থাকে, যা যথেষ্টই অতিরঞ্জিত মনে হয়। এমনকি পশ্চিমা গণমাধ্যমও সেখানে বিশ্বাসযোগ্য কিনা তা নিয়ে তর্ক হতে পারে। ডেইলি মেইল ২০১০ সালে লিখেছে,

> 'ভারতীয় বাহিনীতে নিযুক্ত প্রথম নারী ব্যাটালিয়ান মূলত যৌন কর্মীদের দিয়ে গঠিত। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে গোয়েন্দা সংস্থা র' তাদের সংগ্রহ করে এনে কাশ্মীরের সীমান্তে মোতায়েন করেছে ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বরে। তারা মূলত সেনাদের, যাদের অনেকেই আত্মহত্যা করেছে, বিনোদনের কাজে নিয়োজিত। ওই ব্যাটালিয়ানের নারীরা অনিরাপদ যৌনতার ফলে এখন কিছু সিরিয়াস স্বাস্থ্যগত সমস্যায় ভুগছে। সেখানে মোট ১৭৮ জনের মধ্যে অন্তত ৬৩ জন নারী সৈন্য, যারা নর্দার্ন কমান্ডের অধীনে নিয়োজিত ছিল, প্রেগনেন্সি পরীক্ষায় পজিটিভ চিহ্নিত হয়েছেন। তাদের মিলিটারি হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। সেখানে অনেক পুরুষ সৈন্যও মারাত্মক যৌন সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছে।'[২৪]

এই প্রতিবেদনটি মিথ্যা হওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রিপোর্টটি প্রকাশের পর এর প্রতিক্রিয়া দিয়েছিল ভারতীয় পক্ষ থেকে। সেই প্রতিক্রিয়া উল্লেখ করে লন্ডনভিত্তিক টেলিগ্রাফ একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ভারতীয় পক্ষের বরাত দিয়ে টেলিগ্রাফ লেখে, ডেইলি মেইলের প্রতিবেদনটি 'ভুয়া' এবং এটা ভারতীয় সৈন্যদের ডিমোরালাইজ করতে আইএসআই-এর প্রপাগান্ডা'। যাই হোক, এখানে সন্দেহ রয়েছে এই খবর ও পাল্টা খবরের সত্যতা নিয়ে। তবে, সৈন্যবাহিনীর দ্বারা পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য হওয়ার মতো ঘটনা ঘটে থাকতে পারে, সে সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা যায় না। কাশ্মীরের নারী অধিকার কর্মী ও সাংবাদিক আলিয়া বশির তার এক নিবন্ধে লিখেছেন, কাশ্মীরের ১৯৯০-এর ফৌজি সহিংসতা অনেক মেয়েকে

শিশু যোদ্ধা বা সেনাদের যৌন দাসী (Concubines) হতে বাধ্য করেছে। এসবের পাশাপাশি ধর্ষণের মতো অপরাধের শিকার হলেও এর বিরুদ্ধে নালিশ করার ক্ষমতা কাশ্মীরে নারীদের নেই।'[২৫] এই মন্তব্যটির মাধ্যমে অনুমান করা যাচ্ছে যে, সংঘাত কাশ্মীরি নারীদের পতিতাবৃত্তির দিকে ঠেলছে। তবে, এর সঠিক সংখ্যা অনুমান করা কঠিন। প্রসঙ্গত কাশ্মীরের কোথাও প্রকাশ্যে কোনো যৌনপল্লীর খবর পাওয়া সম্ভব নয়। এমনকি সিনেমা হলোগুলোও বন্ধ সেখানে। জম্মুতে অবশ্য সবই মেলে।

ফৌজি ব্যবস্থার অধীনে নারীর কষ্টের আরেকটি দিক রয়েছে যাকে উন্নয়ন গবেষকরা 'সোশাল কস্ট' বলে উল্লেখ করে থাকেন। এটা হলো নারীর জন্য সবচেয়ে কষ্টকর এবং দীর্ঘস্থায়ী। এই কষ্টের শুরু হয় যুদ্ধের সময় আর তা চলতে থাকে শান্তিকালেও। যুদ্ধের শেষ হলেও নারীর কষ্টের শেষ আর হয় না। যে নারী তার স্বামীকে হারিয়েছে তার হয়তো আবার বিয়ে হয়। কিন্তু শিশু সন্তানগুলোর জন্য কে থাকে? ওই শিশু সন্তানটির কষ্টই হলো 'সামাজিক মূল্য', যা অর্থের অঙ্কে পরিমাপযোগ্য নয়। ১৯৯২ সালে মোহাম্মদ আমীন নামে ২৩ বছর বয়সী এক হাসপাতাল কর্মী সৈন্যদের হাতে নিহত হন। তার স্ত্রীকে পুনরায় বিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ওই মাকে তার দুটি সন্তান ফেলে রেখে যেতে হয় ওদের দাদা-দাদির কাছে। মুনীরা নামের এক নারী তার স্বামী নিহত হওয়ার পর নিজেই মাঠে কাজ আর কাঠখড়ি সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। পাহাড়ে বসবাসকারী পশুপালন নির্ভর গুজার সম্প্রদায়ের বৃদ্ধ নাদের আলী খান (৬৫) সোপুর এলাকার একটি বাড়িতে কাজ করতেন। ওই বাড়িতে সৈন্যরা আগুন ধরিয়ে দিলে আরও তিনজন মানুষসহ বৃদ্ধ নাদের আলী পুড়ে মারা যান। তার স্ত্রী মারজান এবং পাঁচটি মেয়ে, যারা সবাই ছিল অশিক্ষিত, জীবিকার প্রয়োজনে ভিক্ষাবৃত্তি বেছে নেয়।[২৬] এভাবেই দারিদ্র্যের কষাঘাতে নারী জর্জরিত হয়ে আরও বেশি অসহায় হয়ে পড়ে। বিশেষজ্ঞরা এই অবস্থাকে বলে থাকেন ফেমিনাইজেশন অব পভারটি।

নিপীড়িত নারীদের সামাজিকভাবে হেয় করার নিরবিচ্ছিন্ন চেষ্টা সেখানে নারীকে আরও বেশি অসহায় করে তোলে। কুনান নামের একটি গ্রামে ১৯৯১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ৩০ জন নারীকে একযোগে ধর্ষণ করে সশস্ত্র বাহিনীর একটি প্লাটুন। সর্বাধিক আলোচিত ওই গণধর্ষণ নিয়েও আছে সংখ্যার রাজনীতি। প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া অনুসন্ধান শেষে ওই ঘটনার উপসংহার টেনে বলেছে, সেখানে কেউ ধর্ষিত হয়নি। কারণ, 'ধর্ষিত মেয়েদের এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার পর তারা হাসছিল'।[২৭] যদিও কোনো কোনো রিপোর্টে ধর্ষিত নারীদের এই সংখ্যা বলা হয়েছে ৬০। আর তাদের সেই বেদনার স্মৃতি রোমহর্ষক।

> ওই গ্রামে পরের তিন বছরে কোনো বিয়ের প্রস্তাব যায়নি। ধর্ষিত এবং অ-ধর্ষিত সকল মেয়েই ছিল 'বিবাহঅযোগ্য'। বিবাহিত মেয়েদের মধ্যে যারা ধর্ষিত হয়েছিলেন তাদের পরিত্যাগ করেছিল তাদের স্বামীরা। সশস্ত্র যোদ্ধা ও বয়স্কদের প্রচেষ্টায় দুজন স্বামী

তাদের স্ত্রীদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়েছিল। একজন নিয়েছিল এই শর্তে যে, তাদের মধ্যে কোনো দাম্পত্য সম্পর্ক থাকবে না। অন্যজনের শর্ত ছিল যে, সে তার স্ত্রীর থেকে দূরে শহরে গিয়ে বসবাস করবে। ছয় সন্তানের মা শরীফা এবং অন্য এক ধর্ষিত আত্মহত্যা করেছিলেন। সাত সহোদর বোনকে একই সঙ্গে ধর্ষণ করা হয়েছিল। সমাজ পরিত্যাগ করেছিল ওই সাতবোনকে। নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা এক নারী আটজন জওয়ানের কাছে ধর্ষিত হয়েছিলেন। তার তিন দিন পর ওই নারীর সন্তানটি দুই হাত ভাঙা অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়।[২৮]

১৯৯৩ সালে মরিয়ম নামে অপর এক গ্রামের এক নারীকে জনসম্মুখে ধর্ষণ করা হয়। তার স্বামীকে হত্যা করা হয়। ধর্ষণের পর তিনি ১৯৯৪ সালে একটি সন্তান জন্ম দেন। গ্রামের কেউ তার সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। এ হলো সামাজিক মূল্য, যা নারীকে পরিশোধ করতে হয় প্রতিনিয়ত। সমাজ নিজেও ফৌজিতন্ত্রকে বিশ্বাস করে। সমাজ নিজেকে লজ্জিত ও অপমানিত বোধ করে যখন তার নারীরা অন্যের দ্বারা ধর্ষিত হয়। তাই তারা ধর্ষিত নারীকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। তাই তারা শত্রুসৈন্যের দ্বারা ধর্ষণের ফলে তাদের নারীদের গর্ভে জন্ম নেওয়া শিশুকে আপন ভাবতে পারে না। এভাবেই নারী 'অনিরাপদ' থাকে যুদ্ধক্ষেত্রে আর অগ্রাহ্য হয়ে যায় 'যুদ্ধের পরেও'। যুদ্ধের পরও নারীকে মোকাবিলা করতে হয় আরেক যুদ্ধ। যেখানে নারীর নিজের সমাজের লোকেরাই হয়ে ওঠে নতুন শত্রু। ধর্ষিত যুবতীরা রাস্তায় বের হতে পারেনি। স্কুলে যেতে পারেনি। কারণ, বন্ধুরা তাদের জিজ্ঞাসা করত, 'তুমি তখন আনন্দ পেয়েছিলে? আরও চাও?'। এভাবেই ফৌজিতন্ত্র নারীকে সার্বক্ষণিক হয়রানির মধ্যে রাখে। ওই গ্রামের ছেলেদের অন্য গ্রামের লোকেরা চিহ্নিত করত, 'তুমিতো ধর্ষিত গ্রাম থেকে' এসেছো। এভাবে, একটা নারীর ধর্ষিত হওয়াকে একটা গ্রামের বা একটা সম্প্রদায়ের ধর্ষণ হিসেবে তরজমা করা হয়। এভাবে ফৌজিতন্ত্রের অধীনে নারীর কষ্ট পরিমাপযোগ্যতার ঊর্ধ্বে চলে যায়। ফৌজিতন্ত্র নারীকে উভয় দিক থেকে আক্রমণ করে। নারী আক্রান্ত হয় তার নিজের সমাজ দ্বারা রক্ষার নামে, অন্যদিকে নারী আক্রান্ত হয় শত্রুর দ্বারা।

কাশ্মীরের প্রায় ১৫০০ নারী[২৯] (কোনো কোনো তথ্য অনুসারে ২৩০০) আছে যাদের বলা হয় অর্ধবিধবা (Half Widow)। তাদের স্বামীরা নিখোঁজ। তার এখনও স্বামীর আগমনের অপেক্ষায় আছেন। কিন্তু, তারা জানেন না যে আদৌ ওইসব স্বামী বেঁচে আছে কিনা। আলেমরা বিষয়টির ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ঐক্যমতে আসতে ২২ বছর কাটিয়ে দিয়েছেন। 'প্রথম কোনো নারীর স্বামী নিখোঁজ হওয়ার ২২ বছর পর কাশ্মীরের আলেমরা ফতোয়া দিয়েছেন ২০১৪ সালে। ফতোয়ায় তারা বলেছেন, কাশ্মীরের নারীরা তাদের স্বামী নিখোঁজ হলে চার বছর পর পুনরায় বিয়ে করতে পারবেন।'[৩০] আল জাজিরার প্রতিবেদন (২০১৩) অনুসারে ওইসব নারীসহ নিখোঁজ মানুষের সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার।[৩১] ১৯৯২ সালে

অন্তঃসত্ত্বা নারী জুনা, প্রসবকালে মৃত্যুবরণ করেন, তাকে হাসপাতালে নেওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ বাইরে ছিল কারফিউ। ২১ বছর বয়সী খালেদাও বরণ করেছিল একই ভাগ্য। কাশ্মীরের খবরের কাগজ খুললে এখনও এমন খবরের দেখা মেলে। এভাবেই ফৌজিতন্ত্রের অধীনে মানুষের নিরাপত্তা অবহেলিত থেকে যায়।
যদিও সরাসরি তুমুল যুদ্ধ এখন আর নেই কাশ্মীরে। সশস্ত্রতা স্থবির হয়েছে। হয়তো অনেকে ধারণা করবেন, নারীরা তাহলে নিরাপদ আছে। কিন্তু, এখনও সেখানে মিলিটারির উপস্থিতি আছে। এখনও জারি আছে আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট (আফসপা), যা সৈন্যদের দিচ্ছে অপরাধের দায়মুক্তি। কাশ্মীরের এক সাংবাদিক একবার জানালেন, ওখানে গৃহে নারীর ওপর নির্যাতন বাড়ছে। কিন্তু, খবরের কাগজে ঘরোয় নির্যাতন তেমন একটা প্রচার হয় না। কারণ, 'ওখানে যুদ্ধের খবরই বেশি চলে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম আর জনগণের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের অ্যাকশনই ওখানে খবরের ভাল আইটেম। মৃত্যুর সংখ্যা হিসেবে খবরের গুরুত্ব বাড়ে।' এভাবেই ফৌজের উপস্থিতিতে নারীর ঘরোয়া নিরাপত্তার কথা চাপা পড়ে যায় সেখানে।

[নোটঃ কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. হুমায়রা শওকত এবং এই লেখকের যৌথভাবে লেখা ইংরেজি নিবন্ধ Militarism in Kashmir: Looking the World from Kashmir ২০১৬ সালের মার্চে ব্যাঙ্গালুরু ভিত্তিক গবেষণা জার্নালে [International Journal of Management and Social Science Research Review; Vol.1, Issue.3, Pp: 284-291] প্রকাশিত হয়। এ অধ্যয়টি মূলত ওই নিবন্ধের একটি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। এখানে নতুন কিছু সংযোজিত হয়নি।]

নোট/সূত্র

১. Gauhar, G.N; *Military Operation in Kashmir: Insurgency at Charar-e-Sharief*; New Delhi: Manas Publication; 2001. 184-5.
২. Umar, Baba; The dilemma of kashmir's half-widows; 13th October, 2013; http://www.aljazeera.com/news/asia/2013/09 (Accessed on: 13th June, 2015)
৩. Iqbal, Javid; Structures of Violence: A Comprehensive report on HR Violations in JK; Greater Kashmir; September 19, 2015; P: 11.

৪. Burke,Colleen (2012); http://wilpf.smilla.li/wp-content/uploads/2012/10/Unknownyear_Women_and_Militarism.pdf; (Accessed on: 23rd May, 2015).
৫. Choudhury, Gouri & et al; Women's Testimonies from Kashmir, Bombay: Women's Initiative, 1994: 1
৬. Greater Kashmir; 2015: 1
৭. Handoo, Bilal; Literature: The Prophecy; Kashmir Life, July (5-11), 2015; P: 22-23.
৮. Kifurkiyan, N Shalhub-; Introduction, Militarisation and Violence Against Women Conflict Zones in Middle East: Palestinian Case Study; http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/law/human-right (accessed on 15th May' 2015).
৯. Chenoy, Anuradha M; Militarism and Women in South Asia; New Delhi: Kali for Women; 2002: 3.
১০. Dabla, Bashir Ahmed; Multi-Dimensional Problems of Women in Kashmir; New Delhi: Gyan Publishing House; 2007: 171.
১১. Greater Kashmir; 2015: 1
১২. Choudhury, Gouri & et al; Women's Testimonies from Kashmir, Bombay: Women's Initiative, 1994: 34.
১৩. Gultung, Johan; Violence, peace and peace research; Journal of Peace research, Vol: 6; 1969; 167-185.
১৪. Rashid, Mahmood-Ur-; Discontents of Massage; Srinagar: Greater Kashmir; 6th June, 2015; P: 11.
১৫. Mahjoor, Nayeema Ahmad; Un-wed widows: A heart rending story of pain and longing; Srinagar: Greater Kashmir; 25th May 2015; 8.
১৬. Human Rights Watch Report, 1995; 56.
১৭. প্রাগুক্ত, 68.
১৮. প্রাগুক্ত, 75.
১৯. Golan, Galia; Militarisation and Gender: The Israeli Experience; 1997; (journals.lub.lu.se /index.php/st/article/download/3049/2611)

২০. Chenoy, Anuradha M; Militarism and Women in South Asia; New Delhi: Kali for Women; 2002: 3.
২১. Leonhardt, Adrienne; Between Two Jailers: Women's Experience during Colonialism, War, and Independence in Algeria; Portland State University: network.bepress.com (Accessed on: 12th June, 2015).
২২. Choudhury, Gouri & et al; Women's Testimonies from Kashmir, Bombay: Women's Initiative, 1994: 21
২৩. Mcnutt, Debra; http://www.commondreams.org/views/2007/07/11/iraq-occupation-enabling-prostitution (accessed on: 22/05/2015).
২৪. Nelson, Dean (Sep 2009); http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/india/6239790/First-female-Indian-troops-are-prostitutes.html (Accessed on: 29th May 2015).
২৫. Bashir, Aliya; http://womennewsnetwork.net/2012/07/03/kashmir-india-sex-workers-victims-victimless/ (Accessed on: 29th May 2015).
২৬. Choudhury, Gouri & et al; Women's Testimonies from Kashmir, Bombay: Women's Initiative, 1994: 9
২৭. প্রাগুক্ত: 10
২৮. প্রাগুক্ত: 11
২৯. Kandwal, Ana; The Shocking Tale Of Half Widows And Half Orphans: Enforced Disappearances In Kashmir!; http://www.youthkiawaaz.com (Accessed on: 13th June, 2015).
৩০. Indian Express, 2nd March, 2014
৩১. Umar, Baba; The dilemma of kashmir's half-widows; 13th October, 2013; http://www.aljazeera.com/news/asia/2013/09 (Accessed on: 13th June, 2015).

১৭
ভাষা : কা'শুর পৈঠ

কাশ্মীরি ভাষা। ভাষাটির অভ্যন্তরে অন্যরকম শক্তির ছোঁয়া পেয়েছি। পেয়েছি যজবা। মনে হয়েছে এ ভাষার শব্দভাণ্ডার সীমিত, কিন্তু আবেগ অসীম। ছোটখাটো বাক্য, কিন্তু তীব্র প্রভাব সৃষ্টিকারী। তুলনামূলকভাবে বাংলাভাষার চেয়ে অনেক কম শব্দ আছে এর অভিধানে। এতে সংস্কৃত, ফার্সি, আরবি, উর্দু, ইংরেজি, হিব্রুসহ অনেক ভাষার শব্দ আছে। কিন্তু, এই ভাষার নিজস্ব শব্দসংখ্যা খুবই কম। অন্যভাষায় কাশ্মীরি ভাষার শব্দ রপ্তানি হয়েছে এমনও খুব একটা পাওয়া যায় না। স্পষ্টতই, কাশ্মীরি ভাষা একটা রিসিভার ল্যাঙ্গুয়েজ। গ্রাহক ভাষা। বিতরণকারী নয়। ভাষা হলো একটা সমাজের প্রবেশ দুয়ারের মতো। ভাষা বুঝতে পারলে ওই সমাজকে বুঝতে পারা যায়।

কাশ্মীর পৌঁছার পর থেকেই এই টিপিক্যাল ভাষাটি খানিকটা উপলব্ধির চেষ্টা করেছিলাম। প্রথম দেড় বছরে সামান্যই বুঝতে পেরেছি। এরপর যখন ভাষাটির মর্ম বুঝতে শুরু করলাম, দেখলাম অপূর্ব ক্ষমতাধর একটি ভাষা। এই বুঝ হতে না হতেই ফেরার সময় এসে গিয়েছিল। ওই সময়ের মধ্যে কাশ্মীরি ভাষা সম্পর্কে যা বুঝতে পেরেছি তা এ অধ্যায়ে তুলে ধরেছি। মূলত, কাশ্মীরি ভাষাকে বাংলার পাশে রেখেই বুঝতে চেষ্টা করেছি। বাংলার সঙ্গে এর মিল-অমিল আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই ভাষাটিকে শেখার বা বোঝার চেষ্টা করেছি।

শুরুতেই কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। কাশ্মীরি সমাজে 'হাজাম' নামে একটা বংশ আছে। নামের শেষে এই শব্দটি পাওয়া যায়। এক বন্ধু জানিয়েছিল এই হাজাম মানে হলো, 'নাপিত'। যারা বংশগতভাবে ছুরি-কাঁচি' দিয়ে মানুষের মাথা কামায়। মজার ব্যাপার হলো, খুলনার শিরোমণি গ্রামে 'হাজাম'পাড়া বলে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া এক গোষ্ঠী লোক আছে। ওই হাজামরা বংশগতভাবে কাঁচি বা ছুরি দিয়ে ছেলেদের 'খৎনা' করে। এটা তাদের পেশা। এই দুই হাজাম শব্দের মধ্যে কোনো মিল আছে কিনা তার পক্ষে আরও কোনো যুক্তি আমার কাছে নেই। তবে, নিঃসন্দেহে এটা দারুণ সংযোগ। অবশ্য আরবি ভাষায় 'হাজামাত' বলে একটি শব্দ আছে। একই শব্দ আছে পোশতুন (পাঠান) ভাষায়ও।

কাশ্মীরি ভাষায় এগারকে বলে 'কাহ'। বাংলায় সুপারি গণনায় একটা শব্দ প্রচলিত

আছে– 'গাহ'। সুপারির চাষ-বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িতরা জানবেন ১১টা সুপারিকে এক 'গাহ' বলে। 'কাহ' এবং 'গাহ' একই সূত্র থেকে জন্ম নিয়েছে বলে ধারণা করা যায়।

বরিশালের ভাষায় 'পইড' বলে একটা শব্দ পরিচিত। এর মানে হলো, কোনো কিছু সোজা হওয়া বা খাপে-খাপে মিলে যাওয়া। কয়েকটি জিনিস একই সরল রেখায় এলে টিপিক্যাল বরিশাইল্যা ভাষায় বলে, 'পইড়ে পইড়ে মিল্যা গ্যাছে'। জানিনা এই শব্দটির মূল কোথায়। তবে, তাজ্জব হয়েছি কাশ্মীরি ভাষার শব্দভাণ্ডারে 'পইঠ' শব্দের ব্যবহার দেখে। সে ভাষায় এর অর্থ হলো কোনো কিছু 'ঠিকঠাক' বা 'নির্দিষ্ট' থাকা। ভাল আছি বোঝাতে কাশ্মীরিতে বলে 'ঠিক পইঠ'। আবার কখনও বলে 'আসল পইঠ'। সুনির্দিষ্ট কোনো কিছু বোঝাতেও ব্যবহার করা হয় এই 'পইঠ'। কাইথ পইঠ ছু? এর মানে হলো, কোনো যায়গা থেকে (এসেছেন)? আবার কোনো কিছুর ওপর নির্ভর করা বা ভরসা করা বোঝাতেও ব্যবহৃত হয় 'পইঠ'। যেমন, 'খোদায়েছ পইঠ হাওয়ালাহ'। মানে, খোদার ওপর হাওলা করলাম। বিদায় বেলায় বয়োবৃদ্ধ-গ্রামীণ কাশ্মীরিরা এখনও এই বাক্য বলেন। যে কোনো গাড়ির পেছনে উর্দু অক্ষরে এই লাইন লেখা থাকতে দেখা যায়। যেমন, বাংলাদেশে গাড়ির গায়ে লেখা হয় 'আল্লাহর নামে চলিলাম'। অবশ্য, শহরাঞ্চলের অনেকে বলেন খোদা হাফেজ, গুডবাই ইত্যাদি।

নির্ভুলভাবে দাবি করা যায় কাশ্মীরি ভাষায় 'পইঠ' শব্দটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত। এর মানে অনেক, তবে আসল অর্থ হলো ওপরে (ইংরেজি on)। মূলত এর দ্বারা কোনো অবস্থান বোঝানো হয়। যেমন, আমি চৌরাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে আছি বলতে হবে, 'চৌওয়াথ'স পৈঠ'। একইভাবে, পাশে/কাছে/ধারে বোঝাতে বলা হয় 'নীশ'। যেমন, 'মার্কেট'স নীশ' মানে হলো, বাজারের পাশে। মধ্যে বোঝাতে বলা হয় 'মাঞ্জ'। যেমন, 'ছে কাইথ ছু' (তুমি কোথায়)? উত্তরে বলা হবে, 'ক্লাস'স মাঞ্জ' (ক্লাসের মধ্যে)।

যাই হোক, দুর্বোধ্য এই ভাষাটির শব্দাবলীর মধ্যে বাংলার এমন কিছু মিল খুঁজে পাওয়ার পরই আমি অদ্ভুত একটা নেশায় আক্রান্ত হই। তা হলো, বাংলার সঙ্গে এই ভাষার মিল অমিল আবিষ্কারের চেষ্টা। প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার, ভাষা বেঁচে থাকে মানুষের কথায়, গানে, সুরে ও সঙ্গীতে। দেবতার বাণী ভাষা বটে। কিন্তু, তাকে মানুষের কাছে আনতে না পারলে পৃথিবীতে ওই ভাষার মৃত্যুই স্বাভাবিক। আর ভাষা এক দেশ থেকে আরেক দেশে যখন স্থানান্তরিত হয় তখন উচ্চারণ বদলায়। হয়তো উচ্চারণ বদলাতে বদলাতে এক সময় ভাষাই বদলে যায়। যেমন, ঢাকার বাংলা 'হলাম'কে কলকাতায় গিয়ে শুনতে হবে 'হলুম'। ইংরেজি পার্ক আরবিতে শোনা যাবে বার্ক। পাকিস্তানকে আরবরা বলে বাকিস্তান। বাংলা শব্দ পরী আরবের মানুষের মুখে উচ্চারিত হবে 'বরি'।

বাংলা ও কাশ্মীরি নিয়ে এই অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের কিছু বইপত্রও পড়া শুরু করি। খুঁজতে শুরু করি বাংলার সঙ্গে কাশ্মীরের অতীত

সংযোগের সূত্রগুলো।[১] জানতে পেলাম ১৯১৫ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাশ্মীর ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি তার এক বন্ধুকে কাশ্মীর সম্পর্কে লিখেছিলেন,

> 'আমি কাশ্মীরে ছিলাম। এক সন্ধ্যায় আমি ঝিলাম নদীর তীরে বসে। চারদিকে নীরবতা। আমি অনুভব করলাম যেন পদ্মার পাশেই বসে আছি। অবশ্য, যখন পদ্মার পাশে থেকেছি তখন আমি এক তরুণ আর এখন বৃদ্ধ। এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান যেন উবে গেছে। একঝাঁক বলাকা আমার মাথার উপর দিয়ে উড়ে ঝিলামের ওপারে চলে গেল।... মনে হলো, আমি অদৃশ্য এক আহ্বান শুনতে পেলাম। আমাকে আরও দূরের পথে যেতে হবে'।[২]

রবীন্দ্রনাথ তার 'বলাকা'র বেশ কিছু কবিতা কাশ্মীরে বসেই লিখেছিলেন। ঝিলাম (কাশ্মীরি উচ্চারণ জেহলাম) নদীর রূপ বাংলা কবিতায় তুলে ধরেছেন যে, সে রবীন্দ্রনাথ। তার 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলামের স্রোতখানি বাঁকা'– এই কবিতায় ঝিলামকে যেভাবে পড়েছি, ঝিলামের পাশে গিয়ে প্রতিবারই তার প্রতিধ্বনি আর প্রতিচ্ছবি খুঁজেছি এবং পেয়েছি।[৩] কবিতায় তিনি বর্ণনা করেছিলেন, আকাশে উড়ন্ত বলাকাদের কাছ থেকে পাওয়া বার্তা। তিনি অনুভব করেছিলেন, বকেদের বিরতিহীন পাখাগুলো এক অসমাপ্ত যাত্রার কথা বলছে। 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্যকোনো খানে'। বলাকার মূল বার্তাই হলো, গতিময়তা। যেমনটা মোবারক হোসেন খান লিখেছেন, বলাকা হচ্ছে গতির প্রতীক।[৪] ঝিলামের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের এই বর্ণনার পর ফিরে আসা যাক রবীন্দ্রনাথের পদ্মায়।

তিনি তার কবিতায় লিখেছেন, 'আমার প্রিয়তম পদ্মা, সহস্রবার মিলেছি তোমার সাথে..'। তিনি তার যৌবনের অনেকটা সময় অতিবাহিত করেছিলেন পদ্মার পাড়ে। সেখানে বসে তিনি লিখেছেন অনেক। কিন্তু, পদ্মা ও ঝিলামের মধ্যে তিনি একটি বিষয়ে মিল খুঁজে পেয়েছেন। তা হলো, 'জীবনের গতিময়তা'। যদিও ভৌগোলিকভাবে বৈপরীত্য আছে দুইয়ের মধ্যে।

যাই হোক, এই অধ্যায়ের মূল মনোযোগ হচ্ছে ভাষার মধ্যে মিল খোঁজা। রবীন্দ্রনাথ বলাকা কবিতায় লিখেছেন বকের কথা। বাংলায় বককে বলা হয় বগি, বগা ইত্যাদি। কাশ্মীরি ভাষায় এই পাখিকে বলা হয় 'বগলি' অথবা 'ব্র্যাগ'। বক বা বলাকার সঙ্গে কাশ্মীরি শব্দটি মেলেনি। কিন্তু, বগির সঙ্গে বগলি অন্তমিল সৃষ্টি করেছে।

অধিকন্তু, ভাষার মিল খুঁজতে গিয়ে প্রকৃতি ও তার মর্মবাণীর মধ্যে এক মিল আবিষ্কৃত হয়েছে। ভাষা দুটির মধ্যে সখ্য খুঁজতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকেই আবিষ্কার করা গেল। এ কথাতো কারও অজানা নয় যে, নদীরা পর্বতের ঝরনা থেকে সৃষ্টি হয়ে সাগরের দিকে বয়ে চলে। তারা সভ্যতা আর শহরগুলোর ওপর দিয়ে বয়ে যায়। একের সঙ্গে অন্যটিকে যুক্ত করে। আর যখন মানুষ নিজেই নদীর মতো

বহমান হয় তখন সে বহন করে সংস্কৃতি ও জ্ঞান। পরিভ্রমণের সময় মানুষ অচেনা লোকেদের সঙ্গে পরিচিত হয় আর যুক্ত হয় ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সঙ্গে। এটা একটা দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। ভাষা সংস্কৃতিগুলোকে যুক্ত করে। আবার সংস্কৃতি ভাষাসমূহকে যুক্ত করে। যেমনটা গবেষকরা বলেন, 'ভাষাকে সংস্কৃতির বাচিক প্রকাশ হিসেবে ভাবা যেতে পারে। এটা সাংস্কৃতিক বন্ধন এবং সংস্কৃতিকে ধারণ ও প্রচারের জন্য ব্যবহৃত হয়'।[৫]

মনে রাখা দরকার, দুটো ভাষার মধ্যে মিলগুলোর মাধ্যমে তাদের মধ্যকার অমিলগুলোকে অস্বীকার করা যাবে না। দুটো স্থান একে অপরের থেকে যত দূরের হবে তাদের ভাষা পরস্পরের থেকে ততটাই ভিন্ন হবে। তথাপি, বিশেষজ্ঞরা বলেন, ভাষা আমাদের চিন্তার প্রক্রিয়াকে পরিচালিত করে। আবার আমাদের চিন্তার প্রক্রিয়াও ভাষাকে পরিচালিত করে।

বেঞ্জামিন লি ওরফ তার তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে বলেছেন, ভাষা আমাদের চিন্তার পন্থাকে কাঠামোবদ্ধ করে। আমরা যে বিষয়ে চিন্তা করি তা নির্ধারণ করে দেয় ভাষা। তিনি মনে করেন, ভাষার ওপর নির্ভর করে আমরা কথা বলি। আমরা জগৎটাকে দেখি একেকজন একেকভাবে। তিনি উদাহরণ দিয়েছিলেন যে, একজন ইংরেজের কাছে এবং একজন এস্কিমোর কাছে তুষারের ধারণা ভিন্ন। এস্কিমোর অনেক শব্দ আছে তুষারকে বর্ণনা করার জন্য। কিন্তু, ইংরেজিতে একটিই আছে। তা হলো স্নো (Snow)। একজন এস্কিমোর সুনির্দিষ্ট শব্দ আছে ভেজা তুষার, বর্তমানে পতনশীল তুষার ইত্যাদি বোঝাতে। সে কারণে, একজন এস্কিমো স্নো সম্পর্কে যা ব্যাখ্যা করতে পারেন তা ইংরেজের চেয়ে ভিন্ন।[৬]

কাশ্মীরি ভাষায়ও দেখা গেছে এরকম বিশেষত্ব। প্রাকৃতিক এবং সামাজিক বৈপরিত্যের কারণে ভাষারা আলাদা হয়। কাশ্মীরি ভাষায় তুষারকে ব্যাখ্যা করার জন্য অসংখ্য শব্দ পেয়েছি, যা বাংলায় নেই। কাশ্মীরি ভাষায় তুষারকে বলা হয় 'শীন'। আবার শিশির বিন্দুকে বলা হয়, 'শুশুর'। প্রচণ্ড শীতে শিশির বিন্দুরা কোনো গাছের ডালে বা ঘরের চালে ঝুলন্ত অবস্থায় জমাট বেঁধে বরফে রূপান্তরিত হয়। কাঁটার মতো ঝুলে থাকা ওই শিশিরের স্ফটিককে বলা হয় 'তুল কাতুর'। এরকম নানা সময়ের শিশির ও তুষারের নানা রকমের নাম সেখানে আছে। অন্যদিকে নদীকে বর্ণনা করতে গিয়ে বাংলায় যত শব্দ পাওয়া যায় তা কাশ্মীরিতে নেই।

একেক এলাকার আর্থসামাজিক অবস্থার মাধ্যমে ভাষায় নতুন শব্দ যুক্ত হতে পারে। যেমন, বাংলায় গত তিন দশকে বেড়ে ওঠা পোশাক শিল্প 'বস্ত্রবালিকা' বা 'সেলাইদিদিমনি'-এমন শব্দের জন্ম দিয়েছে। অন্যদিকে কাশ্মীরিতে সুদীর্ঘ সংঘাত আর যুদ্ধের মধ্যদিয়ে জন্ম নিয়েছে একটা শব্দ: 'সয়েথ'। এর মূল আভিধানিক অর্থ হলো লণ্ঠনের সলতে। কিন্তু, শ্রীনগরবাসীর মুখে 'সয়েথ' মানে হলো একজন যোদ্ধা, যে স্থানীয়ভাবেই তার অস্ত্রের প্রশিক্ষণ নিয়েছে, প্রশিক্ষণের জন্য যে অন্য দেশে যায়নি। এতেই স্পষ্ট হয় যে, বাংলা আর কাশ্মীরি এক নয়। কিন্তু, এসব

অমিলের মধ্যেও মিল আছে। একেই বলে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'। কাশ্মীর আর বাংলাদেশের দূরত্ব হচ্ছে আড়াই হাজার কিলোমিটার। গবেষণার তথ্যমতে, কাশ্মীরি ভাষাভাষি মোট জনসংখ্যা হলো ৯২ লাখ, যা জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের ৪২ শতাংশ।[৭] অন্যদিকে বাংলায় কথা বলে অন্তত ২১ কোটি লোক[৮] যা পৃথিবীর সপ্তম সংখ্যাগরিষ্ঠ। অন্য হিসেবে বলা হয় প্রায় ১৯ কোটি[৯] লোক বাংলাভাষি। সুতরাং, দুই ভাষার মধ্যে বৈপরিত্য স্বাভাবিক।

এবার দুটো ভাষার জিনিওলজি পর্যবেক্ষণ করে দেখা যাক। কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক ড. মুসাবিরের মতে, বিভিন্ন জায়গার লোকেরা একই ভাষা আলাদা আলাদাভাবে উচ্চারণ করে। শতাব্দী অন্তরে এই আলাদা আলাদা উচ্চারণ আলাদা ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে পড়ে। ফলে, এটা বলা যায়, ভাষাগুলো পূর্ববর্তী ভাষার মধ্য দিয়েই জন্ম নিয়েছে (২০১৫: সাক্ষাৎকার)। অধিকন্তু 'তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের' বিশেষজ্ঞরা বিশ্বের ভাষাগুলোকে বিভিন্ন পরিবারে ভাগ করেছেন। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের সংরক্ষিত নথি The Archives of Languages of the World অনুসারে বাংলা এবং কাশ্মীরি উভয় ভাষাই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবারের বিভিন্ন শাখা থেকে সৃষ্ট। ওই আর্কাইভ ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারের আওতায় হাজার হাজার ভাষাকে লিপিবদ্ধ করেছে। Edgar H. Sturtevant ১৯৪৭ সালে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবারের মধ্যে সংস্কৃত, গ্রীক ও ল্যাটিনকে প্রাচীনতম ভাষা হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছেন।[১০] ইরানিয়ান, ইন্ডিক, দারদিক-এসব ভাষা পরিবারও এই বৃহৎ ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। বাংলা এবং কাশ্মীরি ভাষার মূল নিহিত এই তিনটি প্রাচীন ভাষায়।

কিন্তু, বিশেজ্ঞদের মধ্যে এ বিষয়ে মতৈক্য নেই। গ্রিয়ারসন নামে একজন বিশেষজ্ঞ কাশ্মীরি ভাষাকে দারদিস্তানের (পশ্চিম হিমালয়) দারদ ভাষা-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তার মতে, এই দারদ ভাষা-পরিবার হলো ইন্দো-ইরানিয়ান ভাষা পরিবারের শাখা। তিনি আরও মনে করেন, দারদ ভাষাগুলো খানিকটা মূল মা-ভাষা থেকে বিকৃত। অন্যদিকে পরিষ্কারভাবে বলা যায় বাংলার সৃষ্টি হয়েছে সংস্কৃত ভাষার কোনো একটি শাখা থেকে। সুতরাং বলা যায়, ভাষাগুলোর মধ্যে একে অপরের মধ্যে সম্পৃক্ত হওয়ার মতো বৈশিষ্ট্য (Overlapping features) রয়েছে, যা মূলত পরিবারগুলোকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করেছে। ড. মুসাবিরের মন্তব্য এখানেও উল্লেখযোগ্য। 'ভাষাগুলো তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য স্বভাবতই অন্য ভাষা থেকে কিছু গ্রহণ করার এবং নিজে পরিবর্তিত হওয়ার বিষয়ে উদার।'[১১] অধ্যাপক ফিদা এম হাসনাঈনের একটি তথ্য এখানে জরুরি। তিনি কাশ্মীরি ভাষা সম্পর্কে লিখেছেন, 'বর্তমানের কাশ্মীরি ভাষায় ৩০ ভাগ ফারসি, ২৫ ভাগ আরবি এবং ৪৫ ভাগ সংস্কৃত শব্দ আছে। এছাড়া হিব্রুসহ আরও কিছু ভাষার শব্দ রয়েছে'[১২]। অন্যদিকে বাংলাভাষায় সিংহভাগ শব্দ সংস্কৃত থেকে এসেছে। তারপর ফারসি, আরবি, ইংরেজি, পর্তুগীজ ভাষার শব্দ নানাভাবে গৃহীত বাংলায়।

কাশ্মীরিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় জানা গেছে, দুটো ভাষার বিভিন্ন প্রবাদের মর্মার্থে মিল আছে। যদিও তাদের উচ্চারণ ও শব্দাবলী আলাদা। যেমন, দক্ষিণ কাশ্মীরে 'ওয়াতাল হোম' নামে একটা গ্রাম আছে। কোনো এক কারণে ওই গ্রামের লোকদের বোকা বা আহাম্মক মনে করা হয়। শ্রীনগরে যে কোনো মানুষকে 'ওয়াতাল হামুক' বলে গালি দিলে সে ক্ষুব্ধ হয়। কারণ, এর মানে হলো নির্বোধ।[১৩] বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের লোকদের একইভাবে 'মফিজ' বলে গালি দেওয়া হয় ঢাকায়। ধারণা করা যায়, দুই ভাষায় এই দুটি গালি গড়ে উঠেছে একই প্রক্রিয়ায়।

বাংলা প্রবাদ 'দশে মিলে করি কাজ/হারি জিতি নাহি লাজ' সকলেরই জানা। চতুর্দশ শতকের কাশ্মীরি জনপ্রিয় আধ্যাত্মিক কবির একটা বিখ্যাত কবিতা আছে। তাতে বলা হয়েছে, 'সারি সামতাও, আকসাই রাজি লামতাও/আদমা রায়হা কাহ'ন গাও'। এর অর্থ হলো, 'সবাই একসঙ্গে হয়ে দড়িটা শক্ত করে ধরো। অন্যথায় ১১ জন মিলেও গরু হারানো ঠেকাতে পারবে না'। এই কবিতা থেকেই একটা প্রবাদ জনপ্রিয় হয়েছে। তা হলো, 'কাহ'ন রমিজ গাও' বা 'যেখানে ঐক্য না থাকবে সেখানে ১১ জন মিলেও গরু রাখা যায় না'। যে কোনো কাশ্মীরি এই কবিতা ও প্রবাদ বলে দিতে পারবেন। অনৈক্যের সমালোচনার জন্য এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।[১৪]

এবার দুই ভাষার কিছু শব্দের মধ্যে তুলনা করা যাক, যার উচ্চারণে এবং অর্থ প্রায় একই রকম। কাশ্মীরিতে 'আখ' মানে বাংলায় 'এক'। দুই বোঝানো হয় 'জ্যো' দ্বারা। তিন হলো 'ত্রে'। চারকে কাশ্মীরিতে বলে 'চুয়ার'। বাংলা প্রত্যেক বোঝাতে কাশ্মীরিতে ব্যবহৃত হয় 'প্রাত্‌হাক'। দুই ভাষায় বেশ কিছু শব্দ আছে যা উচ্চারণ ও অর্থে একেবারে অভিন্ন। যেমন, কাশ্মীরি ভাষায় 'ঠিক' বা 'আসল' পাশাপাশি ব্যবহৃত হয় 'সঠিক' বা সুস্থ থাকা বোঝাতে। ঠিক পৈঠ? আসল পৈঠ? এই প্রশ্নগুলোর মানে হলে, কেমন আছেন? ভাল আছেন তো? নামবাচক বা বিশেষ্য, ক্রিয়াবাচক, বিশেষণ– সব ধরনের শব্দেই মিল আছে। কাশ্মীরি শুশুর (শিশির), বাত (ভাত), গার (ঘর), গুর/গুড়া (ঘোড়া), কাম্বল (কাওলা/জন্ডিস), ছায় (ছায়া) এসব নামবাচক শব্দে বাংলার সঙ্গে মিল আছে। ক্রিয়াবাচক চমু (চুমুক দেওয়া/পান করা অর্থে), রানুন (রান্না), খেয়ন (খাওয়া), পারান (পড়া), চকরা (চক্কর দেওয়া/ঘুরে বেড়ানো অর্থে), কা'থ (কথা), সেরান (স্নান), করান (করা) শব্দগুলোও ভিন্ন নয়।

খাবারের স্বাদ বোঝাতে কাশ্মীরি ভাষার টুট মানে বাংলা তেঁতো, মুদুর মানে মিঠা, চুক মানে টক/চুকা, গারাম মানে ঝাল। বিশেষণ হিসেবেও মিল আবিষ্কার করা গেছে কিছু শব্দে। কাইথ মানে কথা। 'ক'শুর পইঠ কাইথ করান'– এই বাক্যের অর্থ হলো, কশ্মীরিতে কথা বলুন। যেমন, বাংলায় তাপদাহ কাশ্মীরিতে বলা হয় তাফ দ্রাহ, বড়কে বলা হয় 'বুড', খারাপকে বলা হয় 'বদ'।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে এক ভাষার বিশেষ্য বা নামবাচক পদ অন্য ভাষার বিশেষণ হয়ে গিয়েছে। যেমন, বাংলায় তৃষা বা তৃষ্ণা একটা অবস্থা। বিশেষণ। অথচ কাশ্মীরিতে 'ত্রেষ' মানে হলো পানি। 'পানি খাব/পানি পান করব' বোঝাতে বলতে হবে 'ত্রেষ চমু'। বাংলায় কোনো বস্তু নিচে শব্দ করে পড়লে ওই শব্দ বোঝাতে বলা হয় 'ঠাস'। সাধারণত, শুধু 'ঠাস' শব্দটি বাংলায় কোথাও ব্যবহৃত হয় না। কোনো বস্তু বাংলায় বললে 'ঠাস-ঠুস করে পড়ে'। কিন্তু কাশ্মীরিতে কোনো বস্তু শুধুই 'ঠাস'– মানে পড়ে গেল। একই রকম হলো কাঁপন। বাংলায় কাঁপনের তীব্রতা বোঝাতে বলা হয় 'থর থর করে কাঁপে'। কাশ্মীরিতে 'থার থার' মানে হলো কোনো জিনিস কাঁপছে। টেবিলটা থর থর করে কাঁপছে, এই বাক্যটি কাশ্মীরিতে বোঝাতে বলা হবে 'টেবিল/ থারথার'। তবে, এই দুটি শব্দ বলার সময় যে অঙ্গভঙ্গি দেওয়া হবে তা বাংলা ভাষায় বর্ণনা করে বোঝানো/দেখানো সম্ভব নয়।

আরও কিছু শব্দজোড় আছে যা বাংলার সঙ্গে মেলে না। যেমন, 'ওয়াইওয়াই' মানে হলো শরীরের কোনো অঙ্গে ঝিঁঝিঁ লাগা। আরেকটি শব্দজোড় 'ওয়ারওয়ার'-এর মানে ধীরে-ধীরে। দক্ষিণাঞ্চলে ধীরে ধীরে বোঝাতে ভার-ভার বলা হয়। আঞ্চলিক বাংলায় ভার-ভার আর কাশ্মীরি ওয়ারওয়ার একই মূল থেকে ব্যুৎপত্তি পেয়েছে বলে ধারণা করা যায়। কারণ, আরবি 'ওয়াও' অক্ষরটি বাংলায় অনেকটা 'ওয়া' আর 'ভ'-এর মাঝামাঝি।

বাংলায় 'বদল' একটা ক্রিয়াপদ। এর মানে হলো পরিবর্তন করা। বদল মূলত উর্দু শব্দ। ফায়েজ আহমেদ ফায়েজের কবিতায় আছে 'বদল চুকা হ্যায়', মানে বিপ্লব হয়ে গেছে। কাশ্মীরিতে বদল মানে আলাদা। যেমন, 'অন্য একটা জিনিস'কে কাশ্মীরিতে বলবে, 'বদল চিজ'। অন্য একটা জানোয়ারকে বলা হবে 'বদল জানোয়ার'। ব্যাপারটা অনেকটা ফার্সি 'খুব' আর বাংলা 'ভালো'-এর মতো। ফার্সি ভাষায় 'খুব' মানে ভাল। কিন্তু, বাংলায় 'খুব' বলা হয় ভালর মাত্রা কতটুকু তা বোঝাতে। খুব ভাল।

শেষ করার আগে খাপছাড়াভাবে ভাষাটি সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য জানিয়ে দেওয়া যাক। কাশ্মীরি ভাষায় কুকুরকে বলে 'হুন'। লতি মানে অপেক্ষা। যেমন, এক সেকেন্ড অপেক্ষা করুন বোঝাতে বলতে হবে 'লতি কইরু, আখ সেকেন্ড' বা 'আখ সেকেন্ড কাইরু লতি'। চলো মানে হলো 'পাকো'। অঞ্চল বিশেষে বলে 'পাইকু'। আর 'নীরো/নেরো' মানে আসো। কাশ্মীরি ভাষায় নারীকে বলে 'জেনান'। মূল শব্দটি আরবি 'জেনানা'। আবার কুমারি নারীকে বলে 'কুর'। 'কাশ্মীরি কুমারি' বোঝাতে বলতে হবে 'ক'শুর কূর'। শহরের মেয়ে বোঝাতে বলা হবে 'শাহর'স কুর'।

নোট/সূত্র

১. শ্রীনগরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে বাংলা ও কাশ্মীরি ভাষার সম্পর্ক নিয়ে একটি নিবন্ধ (Discovering Bridge through Language: A Study of Bengali and Kashmiri) উপস্থাপন করেছিলেন লেখক। নিবন্ধটি তৈরিতে লেখকের সহযোগী ছিলেন তার কাশ্মীরি সহপাঠী ফায়েজ রাহী ও রিয়াজ খালিক। ইংরেজিতে লেখা ওই নিবন্ধের তথ্যগুলোও এ অধ্যায়ে যুক্ত করা হয়েছে। তার সঙ্গে কিছু নতুন উদাহরণ ও তথ্য যোগ করা হয়েছে।

২. Mota, Autar (2013); Website: Chinar Shade (http://autarmota.blogspot.in/2013/03/gurudev-rabindra-nath-tagore-and-river.html?m=1) এখানে রবীন্দ্রনাথের ওই চিঠির বরাত দেওয়া হয়েছে। ইংরেজি থেকে চিঠিটি বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে।
আরও দেখুন, Sen, Kshitimohan; Balaka-Kabya-Parikrama, p.55
আরও দেখুন, Razdan, Vinayak (2012) Website: Search Kashmir (http://www.searchkashmir.org/2012/10/tagores-balaka.html?m=1)

৩. 'কাশ্মীর: ঝিলাম নদের মূলে'– শিরোনামে লেখকের একটি লেখা এনটিভি অনলাইন (ntvbd.com)-এ প্রকাশিত হয় ২০১৫ সালে।

৪. মোবারক হোসেন খান, দৈনিক যুগান্তর, ২ আগস্ট, ২০১৩; অথবা, স্বাগত গুপ্ত (২০১৩); পদ্মার তীর: রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য, কালি ও কলম; (kaliokalam.com/2013/04/17)

৫. Emma (2010); The Relationship between Language and Culture; http://www.lexiophiles.com/uncategorized/ (accessed on: July, 28, 2015).

৬. Babla, Do Language Shape the Way we Think: http://www.lexiophiles.com/english/language-culture-and-thoughts

৭. X-MITA study (11/08/2015); Srinagar: Kashmir Life

৮. Flamiejamie, 2008; Top ten most spoken languages in the world; *web: listverse.com.*

৯. Thompson, Irene 2015; *aboutworldlanguages.com/bengali* (accessed: 15/07/2015).

১০. Voegelin, C.F and F.M 1965; *Languages of the World: Indo-European Fascicle One*; Anthropological Linguistics, Vol.: 7, No.: 8; Archive of Language of The World, Anthropology Department; Indiana University; USA. Pp: 2, 182.
১১. Musavir 01/08/2011, *Language and Times*, Srinagar: Kashmir Life.
১২. Hassnain, Fida 2007; *Kashmiri with Jewish Roots;* The Journal of Kashmir Studies; Vol: II, 2007; Pp: 34-35.
১৩. Majeed, Gulshan; A Discourse on a few Expressions of Abuse and Curse in the Kashmiri Language; The Journal of Kashmir Studies; Vol: II, 2007; Pp: 34-35.
১৪. Saleem, Shahzada; Reaction to some Sociological Variables: Some Proverbs of Kashmiri Language; The Journal of Kashmir Studies; Vol: II, 2007; Pp: 135-140.
১৫. কাশ্মীরি ভাষা সম্পর্কে আরও তথ্য পেতে দেখুন 'মধুর সন্তুর' : মনকাড়া সুর অধ্যায়।

১৮
কাশ্মীরিদের ধর্মবোধ ও সংস্কৃতি

সবাই জানে, ধর্ম অদৃষ্টে বিশ্বাস করতে বলে। অনেকেই বলেন, মানুষের বিশ্বাস আর ভক্তিতে ভর করে ভগবান টিকে থাকে; বেঁচে থাকে। ইসলামী দার্শনিকদের মতে, আল্লায় বিশ্বাস করতে হয় মানুষের একালের সুখ আর ওকালের মুক্তির জন্য। ভয়, ভক্তি ও বিশ্বাস মানুষকে দেয় প্রশান্তি। কিন্তু, কালক্রমে ভক্তির লক্ষ্য/গন্তব্য আল্লাহ আর ভগবান থেকে নেমে আসে জীবিত কিংবা মৃত মানুষে; পাথর কিংবা কবরে। পীর-বুজুর্গ, ওলি-আওলিয়া, গাউস-কুতুব আর সাধু-ঋষিরা হয়ে পড়েন ভক্তের ভক্তিগুরু। এভাবেই মাজার আর কাবার মর্তবা এক হয়ে পড়ে। ধনীর ধন তাকে কাবা শরীফে নিয়ে যায়। গরিবের দারিদ্র্য তাকে নিয়ে যায় মাজারে। কাশ্মীর এরই এক জীবন্ত চিত্র আজও। ওয়াল্টার লরেঞ্জ লিখেছিলেন, 'প্রত্যেক কাশ্মীরি বিশ্বাস করে যে, মানুষ ডাকলে বুজুর্গরা সাহায্য করবেন। তারা মনে করে, মৃত বুজুর্গ হচ্ছেন অধিকতর কার্যকর একজন জীবিত পীরের চেয়ে।' কাশ্মীরিদের বিদেশিরা পীর-পরাস্ত বা পীরের উপাসনাকারী হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেও লিখেছেন লরেঞ্জ।[১]

লরেঞ্জের এই অভিজ্ঞতা শতাব্দীকাল আগের। এখন অবশ্য প্রত্যেক কাশ্মীরি এমনটি বিশ্বাস করে না। তবে, অধিকাংশই করে। কাশ্মীরকে পীর-ওয়ার (পীরদের পবিত্র ভূমি) বলে উল্লেখ করলে তারা খুশি হয়। এখনও কাশ্মীরি গাড়িচালকেরা কোনো মাজার অতিক্রমকালে বন্ধ করেন তাদের গানের রেকর্ড। এখনও আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা অশ্রুসিক্ত বদনে নতমস্তকে মাজারের সিঁড়িতে চুমু খান। কল্যাণ কামনা করেন নিজের এবং সকলের। অধিকাংশ মানুষ পর্বতের গুহায় গড়ে ওঠা মাজারের মধ্যে যান। বুজুর্গের কবরের মাটিতে চুমু খান। সেখানকার আথুরে দেয়ালের গায়ে সিঞ্চিত পানি ভক্তিভরে গায় মাখেন।

২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫। ঈদুল আজহার নামাজ পড়তে গিয়েছিলাম হজরতবাল মসজিদে। সচরাচর, মসজিদের ভেতরে ঢোকার সময় মেলে না। ভিড়ের কারণে জায়গাও পাওয়া যায় না। ঈদের দিন মূল ঈদের জামায়াত অনুষ্ঠিত হয় মসজিদের পশ্চিম দিকের মাঠে। ফলে মূল মসজিদের মিম্বর ফাঁকা থাকে। তবে, মসজিদের মধ্যেও কাতারবন্দি হয়ে ঈদের নামাজ পড়ে মানুষ। আমিও সেই কাতারে যোগ দিলাম। গিয়েছিলাম প্রায় দুই ঘণ্টা আগে। নামাজের পাশাপাশি উদ্দেশ্য ছিল ভেতরের দৃশ্য দেখা। আগে অবশ্য মসজিদের পূর্বদিকে নারী ও পুরুষদের দেখেছি

ফটকে চুমু খেতে, মাথা ঠেকাতে। মানুষের হাত-মুখের ছোঁয়ায় সাদা পাথরের দেয়াল কালো হয়ে গেছে সেখানে। মিম্বরের দৃশ্যও একই রকম। সেখানে চারটি পিলার আছে। সাদা পাথরের মোজাইক করা। সেখানে মানুষ একে একে আসে। পিলার জড়িয়ে ধরে। দুই হাতে শীতল পিলারের পরশ নেয়। তারপর মুখে হাত বোলায়। চকাস চকাস করে পিলারের গায়ে চুমু খায়। মিম্বরের দুই পাশে দুটি দরজা আছে। লোহার দরজা। তালাবদ্ধ। সেখানে রক্ষিত আছে কথিত 'হজরতবাল' বা 'মুঈ-মুকাদ্দাস'। প্রতিটি দরজার সামনে পর্দা ঝোলানো। মানুষ সেখানে যায়। কেউ পর্দা সরিয়ে দরজায় চুমু খায়। কেউ পর্দা জড়িয়ে ধরে কাঁদে যতক্ষণ পারে। কেউ কেউ পাশে বসে দোয়া করেন হাত তুলে, কেউ ঢুলে ঢুলে। কেউ হন নামাজরত। কিছুক্ষণ পর পর মসজিদের সেবকরা আসেন। সুগন্ধী মেশানো পানি ছিটিয়ে দেন প্রত্যেকের গায়ে। মানুষ সেই সুগন্ধী জল মুখে-মাথায়-গায়ে মাখে। মাইকে আওয়াজ করে, সুর করে দরুদ-দোয়া কালাম পড়া চলে। অশুদ্ধ আরবি উচ্চরণে কিন্তু হৃদয়কাড়া সুরে মানুষ পড়তে থাকে, 'আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়াসাল্লিম আলা, সাইয়্যিদিনা...' অথবা 'ইয়া.. আ..র হামা..রা... হীমী...ন'।

ডাল লেকের পশ্চিম তীরে অবস্থিত কাশ্মীরি মুসলমানদের বৃহত্তম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এই হজরতবাল। কথিত আছে, ১৭ শতকে নবীজীর (সা) এক বংশধরের মাধ্যমে তাঁর একগাছি চুল-মুবারক ভরতবর্ষে আসে। খাওয়াজা নূরুদ্দীন নামে এক কাশ্মীরি ব্যবসায়ী তা নিয়ে যান কাশ্মীরে। তার উত্তরসূরিরা প্রতিষ্ঠা করেন ওই মসজিদ। ১৯৬৩ সালের ২৬শে ডিসেম্বর মুঈ-মুকাদ্দাস চুরি হয়ে যাওয়ার খবরে গোটা ভারতবর্ষে শুরু হয় দাঙ্গা। কাশ্মীরের হিন্দু-মুসলিম-শিখ সব ধর্মের পক্ষ থেকে ওই পবিত্র রিলিক চুরির প্রতিবাদে প্রদেশ জুড়ে বিক্ষোভ হয়। এ ঘটনায় বাংলাদেশের খুলনা ও ঢাকায়ও দাঙ্গা সংঘটিত হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু 'পবিত্র' চুল চুরির ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়ে বিবৃতিও দেন। ১৯৬৪ সালের ৪ জানুয়ারি এটি আবার পুনরুদ্ধার করে স্থাপন করা হয় বলে জানা যায়। তবে, সব কাশ্মীরি এমনটা বিশ্বাস করে কিনা তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। ওই মসজিদে নিয়মিত নামাজ, উর্দু ও কাশ্মীরি বয়ান হয়। মসজিদের নিরাপত্তায় রাখা হয়েছে ব্যাপক পুলিশি প্রহরা। সেখানে মহিলাদের জন্য রয়েছে আলাদা নামাজের ব্যবস্থা। ঢাকার মসজিদের সঙ্গে কাশ্মীরের মসজিদের পরিবেশের রয়েছে বেশ ফারাক। জুতা নিয়ে মসজিদের ভেতরে ঢোকা নিষিদ্ধ। কেউ ঢুকলে পুলিশি বাধার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চড়-থাপ্পড়ও জুটতে পারে ভাগ্যে। মসজিদের বারান্দায় জুতা-সেন্ডেল রাখার জায়গা আছে। সেখানে জুতা চুরির ঘটনা শোনা যায় না। সবাই নামাজে দাঁড়ায় একেবারে গাদাগাদি করে। একজনের পায়ের সঙ্গে আরেজনের পা লাগিয়ে।

মসজিদ-মাজারে মানুষের এই পাগলপারা ভক্তির কারণ হয়তো সহজেই বোধগম্য। কিন্তু কবরের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ নিয়ে রহস্যের উন্মোচন আমি এখনও করতে

পারিনি। প্রথমবার কাশ্মীরে পৌঁছে যখন দেখেছি গোরস্থান, রীতিমতো অবাক হয়েছি। প্রতিটি ছোটবড় কবর কংক্রিটের স্লাব বাঁধানো। লাশের মাথার দিকে উঁচু প্ল্যাকার্ডের মতো। তাতে নাম লেখা মরহুমের। বাংলাদেশে কোথাও কোথাও একটি-দুটি কবর দেখা যায় বাঁধানো।

আর পাবলিক গোরস্থানের চারপাশে বিরাট এলাকাজুড়ে দেয়াল ঘেরা থাকে। ভেতরে সারি সারি কবরের সঙ্গে কাঠের খুটিতে টিনের টুকরায় হয়তো লেখা থাকে মৃত মানুষের নাম। কিন্তু, প্রতিটি কবরের ওপরে কংক্রিটের চৌকোনা স্লাব দেখে প্রথম খ্রিস্টানদের কবরের কথা মনে হয়েছিল, শুনেছি খ্রিস্টানদের দাফন করা হয় খাড়াভাবে। যখন জানলাম, এগুলো মুসলমানদের কবর ভাবলাম, হয়তো যুদ্ধে অসংখ্য মানুষ শহীদ হয়েছে। তাদের স্মৃতিফলক! কিন্তু তাও না। যুদ্ধে নিহত মানুষের গণকবরের অস্তিত্ব আছে বটে। তবে, কবরের এই সজ্জার সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। পরে জানলাম, ১৪ শতকে শাহ-ই হামদান (র.) প্রথম কাশ্মীরে কবর বাঁধানোর অনুমোদন দিয়েছিলেন।[২]

আরেক দৃশ্য দেখে একদিন বিস্মিত হলাম। দেখলাম, একটি কবরের উপর অনেক চাল (প্রায় কেজি খানিক) পড়ে আছে। আরেকদিন দেখলাম একাধিক কবরের ওপর! কোথাও স্তুপাকারে, কোথাও ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে। দু-চারটি পাখি এসে সেগুলো খুঁটে খাচ্ছে। ভাবলাম, হয়তো প্রকৃতিপ্রেমী কোনো মানুষ পাখিদের জন্য দিয়েছেন ওগুলো। ঈদুল আজহার দিন দেখলাম, একটি কবরের ওপর হলুদ আর লাল ফুলেল সজ্জা। তার দুই কোণে দুইটি ছোট্ট পেয়ালা। একটিতে একমুঠি চাল, অন্যটিতে খানিক তরল-কালচে কিছু একটা। পাশে দাঁড়িয়ে দুই হাত তুলে দোয়া করছেন একজন মানুষ। তখনও হিসাব মেলাতে পারছিলাম না। এই রহস্য উদঘাটন করতে পারিনি। একাধিক বন্ধু বলেছে, গোরস্থানের পাখিদের খাওয়ার জন্যই এগুলো দেওয়া হয়, যদিও উদ্দেশ্য থাকে স্বজনের কল্যাণ কামনা বা সওয়াব।

জাইনুদ্দীন শাহ নামে এক বুজুর্গের মাজার আছে অনন্তনাগে (স্থানীয়রা বলে ইসলামাবাদ)। অত্যন্ত জনপ্রিয় ওই মাজারে বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুরা মিলে গিয়েছিলাম। সেখানে সুর করে কাওয়ালী গান হয়। মূল মাজারটি একটি গুহা। প্রায় বিশ ফুট দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পেরিয়ে সেই গুহায় ওই বুজুর্গ ধ্যান করেছিলেন বলে জানা যায়। সুড়ঙ্গের বাইরে এখন মসজিদ আছে, আছে অন্য ভক্তদের বিশ্রামাগার। প্রতিদিন শত শত লোক ওই গুহায় ঢোকেন। সারিবদ্ধ হয়ে আমরা প্রবেশ করছিলাম। সুড়ঙ্গের মাঝ বরাবর পাহাড়ের পিঠ গম্বুজের মতো আকার নিয়েছে। ভেতরে নারী পুরুষরা দোয়া করছে। কাঁদছে। আমরা সারিবদ্ধ। অপেক্ষা করছি ভেতরে যাওয়ার। ওই গম্বুজাকৃতির পাহাড়ের গা বেয়ে পানি পড়ছে। আমার এক সহপাঠিনীকে দেখলাম সেই ফোঁটা ফোঁটা পানি ধরে গায়ে মাখছে। আমি একটু আরাম করতে পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম। আমার সহপাঠিনী আমাকে যথেষ্ট তিরস্কার করে বলেছিল, এখানে ওয়ালী সাহেব বিশ্রাম নিতেন। এখানে

তোমার হেলান দেওয়া ঠিক নয়। ভক্তির গভীরতা আমাকে আশ্চর্যান্বিত করেছে। একই রকম ভক্তিগদগদ উপাসনা দেখেছি বাডগাম জেলার চারার-ই-শরীফে। চারার-ই-শরীফ হলো নূর উদ্দীন ওয়ালী (রহ.)-এর মাজার। দেখেছি গুলমার্গ এলাকার এক মাজারে। দেখেছি বারামুলার 'বাংলাদেশ' গ্রামের পার্শ্ববর্তী বাবা
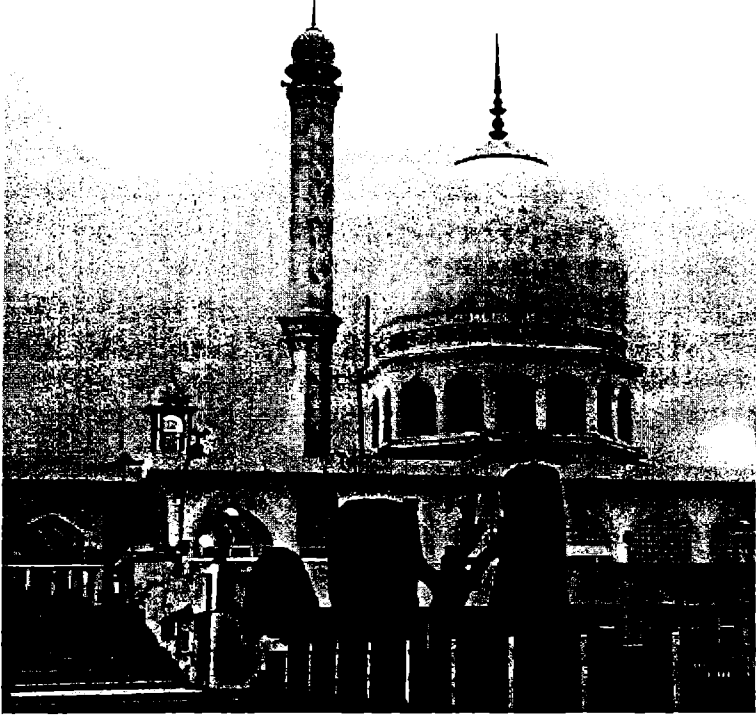
চিত্র ১৮.১: হজরতবাল মসজিদ, শ্রীনগর

শুকুরুদ্দীন-এর মাজারেও।

কাশ্মীরি সংস্কৃতির আরও কিছু রহস্যময় বিষয় রয়েছে যার মর্ম উদঘাটন করতে ব্যর্থ হয়েছি। অধ্যাপক শফি শাউকের লিখেছেন, 'গৃহস্থালির হাতে তৈরি করা নানা সামগ্রী, ফেরেন আর কাংড়ির মতো পোশাক, ভাত, শুকনা সবজি ও ডাল, খড়ের মাচা-মাটির ঘর এবং নিজস্ব উপায়ে তৈরি পানীয়- নুনচায় সঙ্গে করে মানুষ বসবাস করছে সহস্রাব্দ ধরে। কখনও সূর্যের বদান্যতা আবার কখনও নিষ্ঠুর মেঘের কাছে অনুগত হয়েছে জীবন। অস্পষ্ট চাঁদ, চতুর্দিক ঘেরা পর্বতরাজি, গভীর জঙ্গল আর খামখেয়ালিপূর্ণ আকাশের নিচে এই জীবনধারা অনেকটা একঘেয়ে। এমন

জীবনধারাই জন্ম দিয়েছে অগণিত লোককথা, কাল্পনিক মিথ (পুরাকথা), প্রবাদ ও গীত আর 'মাইক্রো-ন্যারেটিভ'। এখনও কাশ্মীরের ঘরে ঘরে *ওয়ানয়ুন, রফ, হিকিত, পিঠির* আর *ভায়ুন* ছাড়া অনুষ্ঠানাদি চলে না। এসবের মধ্যে লুকিয়ে আছে গোটা সমাজের গাঠনিক ভিত্তি। মনজুর ফাজিলির মতে, এগুলো হলো সুখ আর দুঃখ উভয়ের বাহক। গান কিংবা সঙ্গীতের কথা আলাদা একটি অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে কাশ্মীরিদের ধর্মবোধ আর ধর্মের মর্মবোধ নিয়েই কথা বলতে চাই। উপরের বর্ণনায় তাদের ধর্মচর্চার বাহ্যিক রূপটি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। ওই সমাজের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল মিলে মিশে আমার অভিজ্ঞতা হলো, তাদের পরিচিতির মধ্যে (আইডেনটিটি) মুসলমান বোধ সুগভীর। কিন্তু, ধর্মের চর্চায়– নামাজে কালামে অনেকে সে অর্থে ততটা সক্রিয় নয়। সেখানে অবস্থানকারী যে কেউ উপলব্ধি করবেন, হয়তো অনেক কাশ্মীরিই নামাজে অনিয়মিত। কিন্তু, দৈনন্দিন যোগাযোগে, মানুষের সঙ্গে লেনদেন বা সম্পর্কের ক্ষেত্রে তারা সৎ। ওয়াল্টার লরেঞ্জ (১৮৯৫) অবশ্য লিখেছেন, কাশ্মীরিরা সরকারি কর্মকর্তার সামনে সত্য বলেন না। কিন্তু, বাকি ক্ষেত্রে তাদের সততা প্রশংসনীয়।

মানুষের মধ্যে হৃদ্যতার গভীরতা বোঝাতে আরেকটি স্মৃতিচারণ জরুরি। এক অনুষ্ঠানে গিয়েছি একদিন। অচেনা বলেই, দূরে এক কোনায় বসেছিলাম চুপচাপ। লক্ষ করলাম, কাশ্মীরি মানুষের সাক্ষাতের উচ্ছ্বাস! অনুষ্ঠানস্থলে একেকজন মানুষ আসেন আর একে একে সবার সঙ্গে করেন মোলাকাত, কোলাকুলি। যখন কোলাকুলি হয় তখন ছোটর গালে চুমু খায় বড়রা। এ এক দারুণ সখ্য, মিল, মোহাব্বত। মনে হলো, আমরা বাঙালিরা কোলাকুলি ভুলে গেছি। দীর্ঘ সময়ের সাক্ষাৎ-বিচ্ছিন্ন আলাপচারিতার পর শুরু হলো আলোচনা। কিন্তু, আলোচনার গাম্ভীর্য কখনোই আসেনি সেখানে। বরং, খানিক পর পর যখনই নতুন কেউ এসেছেন, পর্বের পর পর্ব কোলাকুলির দৃশ্যই ছিল মূল হৃদ্যতার বিষয়। এই উচ্ছ্বসিত হৃদ্যতার দৃশ্য কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়েও হরহামেশা দেখা যায়। এমনকি সদর রাস্তার মধ্যখানে গাড়ি থামিয়ে, গাড়ির দরজা খোলা রেখে শার্ট-কোট পরা ভদ্রলোকদের দেখেছি কোলাকুলি করতে। এ কারণে পেছনের গাড়িগুলো ব্রেক কশে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু, কেউ এর প্রতিবাদ করেনি। সবাই এ অবস্থায় অভ্যস্ত যেন। এক বন্ধুকে একবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলাম, 'পাবলিক প্লেসে এতটা হৃদ্যতা আন-প্রফেশনাল'। তরপর থেকে সে নিজে প্রায়ই আমার সঙ্গে দেখা হলে সদর রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে জড়িয়ে ধরে বলত, 'আমরা এমনই'।

সুফিভাবধারার প্রতি কাশ্মীরিদের সখ্যের সূত্র বুঝতে আবারও ইতিহাসের আশ্রয় নেওয়া জরুরি। ইতিহাস বলছে, কাশ্মীরে ইসলামের আবির্ভাবই হয়েছে সুফিদের মাধ্যমে। অসংখ্য সুফি ও বুজুর্গ এসেছেন বিভিন্ন এলাকা থেকে কাশ্মীরে। আবার অনেকের জন্ম হয়েছে কাশ্মীরে। তারা আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রচার করেছেন। রাজারা

ক্ষমতায় এসেছেন এবং মুসলিম সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ করেছেন। বণিকরা এসেছেন রাজাদের সহায়তায়, করেছেন বাণিজ্য। একই সঙ্গে সুফিরা চালিয়েছেন শান্তিপ্রতিষ্ঠা ও মানুষের হৃদয় পরিশুদ্ধির কাজ। এর মাধ্যমে কোটি হৃদয় তারা শুধু পরিশুদ্ধই করেননি, দখলও করেছিলেন।

কাশ্মীরে প্রথম এসেছিলেন হজরত বুলবুল শাহ কালান্দার (১৩৩৮)। তিনি ইরানের খোরাসান থেকে এসেছিলেন।[৩] অন্য একটি সূত্রে জানা যায়, তিনি তুর্কিস্তান[৪] থেকে এসেছিলেন। শাসক রিনচান ইসলাম গ্রহণ করেন বুলবুল শাহের হাতেই। সৈয়দ আলী হামদানি, তৈমুর লঙের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। পরে তিনি মধ্য এশিয়া থেকে কাশ্মীরে আসেন ১৩৯৪ সালে। সিকান্দার শাহের শাসনামলে।[৫] অন্য একটি সূত্র বলছে, হামদানী একাধিক বার কাশ্মীরে এসেছিলেন। প্রথমে আসেন ১৩৭২ সালে। পরে ১৩৭৯ সালে। শেষবার এসে এখানে বসতি স্থাপন করেন ১৩৮৩ সালে।[৪] হামদানী কাশ্মীরে নতুন সভ্যতা, নতুন জ্ঞান এবং নতুন শিল্পকর্ম শুরু করেন। তিনি আওরাদ-ই-ফাতিহা ও উচ্চ কণ্ঠে জিকির চালু করেন। যেমনটা ব্রাহ্মণরা তাদের ভজন সঙ্গীতের সময় করে। তার হাতে ৭০০০ কাশ্মীরি হিন্দু ও বৌদ্ধ ইসলাম গ্রহণ করে। তিনি ৭০০ বয়ন শিল্পীকে ইরান থেকে নিয়ে আসেন। কাশ্মীরের শাল বা চাদর শিল্পের বিকাশ সেখান থেকেই শুরু বলে মনে করা হয়। তিনি পারস্য ও মধ্য এশিয়ার জ্ঞানীদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য ফার্সি ভাষা শিখতে উৎসাহ দিতেন।[৪] তিনি সুলতানের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তার পরামর্শে ওয়াইনসহ অন্যান্য অ্যালকোহল সেবন নিষিদ্ধ করা হয়। জুয়া, গান ও পতিতাবৃত্তির ওপর কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। সুহাভট্ট ছিলেন তখন সুলতানের প্রধানমন্ত্রী। তিনি কাশ্মীরি প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন ওই সময়ে হামদানীর হাতে এবং সাইফুদ্দীন নাম গ্রহণ করেন।

শেখ নূর-উদ্দীন নূরানী (১৩৭৭-১৪৩৮) কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি হামদানির দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তিনি সাম্য ও মানবতার জন্য সংগ্রাম করেছেন। তিনি কাশ্মীরের নিজস্ব ঋষি ধারার প্রবর্তক। তিনিও ছিলেন মহান সাধক যিনি কাশ্মীরি সমাজকে হিন্দুত্ব থেকে ইসলামী সমাজে রূপান্তরে বিপুল ভূমিকা রেখেছেন। শান্তিপ্রিয় ধর্মপীর হওয়ায় কাশ্মীরি ব্রাহ্মণরাও তাকে 'নান্দ ঋষি' (শান্তিকামী) বলে ডাকত। শামসুদ্দীন ইরাকি কাশ্মীরে এসেছিলেন ১৫ শতকের শেষ দশকে। তিনি ধর্মান্তরের দীক্ষা না দিয়েই সোমচন্দ্রের গুরুতে পরিণত হন। পরে তিনি আবার কাশ্মীরে আসেন ১৫০১ সালে। তিনি বাবা আলী নজর এবং তার মুরিদদের সমর্থন পান। নকশাবন্দিয়া সুফি ধারাও শামসুদ্দীন ইরাকিকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু, বায়হাকী সাঈদেরা তাকে সমর্থন করেনি। ফলে, সেখানে দুই সুফি তরিকার মধ্যে দ্বন্দ্ব বিরাজ করেছে। শামসুদ্দীন ইরাকি ইসলামী চর্চার বিষয়ে শক্ত ছিলেন।

সারকথা, ইসলাম একটি আদর্শ হিসেবে কাশ্মীরে এসেছিল পরিবর্তনের বার্তা নিয়ে

এবং তা বহু সুফি ও দরবেশের হাত ধরে। সুফিবাদের চারটি তরিকার (কাদেরিয়া, চিশতিয়া, মুজাদ্দেদিয়া, নকশাবন্দিয়া) সবগুলোই মধ্য এশিয়ায় প্রভাবশালী ছিল। তারা সাবাই কাশ্মীরে এসে তাদের প্রভাব রেখেছেন। পরে কাশ্মীর তার নিজস্ব ধারার সুফিবাদের জন্ম দিয়েছে, যার নাম ঋষি ধারা। তবে, মৌলিকভাবে ইসলামের দুটি ধারা যা রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে তা হলো শিয়া ও সুন্নী। এই দুটি পক্ষেরই উপস্থিতি আছে কাশ্মীরে। ইতিহাস বলে, অনেক শাসক ছিলেন শিয়া মতাবলম্বী আবার অনেকে ছিলেন সুন্নী। এই শিয়া-সুন্নী বিভেদও কাশ্মীরে আসে মধ্য এশিয়া ও ইরান থেকে। সবকিছু সত্ত্বেও কাশ্মীরের সংস্কৃতিতে সুফিবাদের শেকড় সুগভীর।

নোট/সূত্র

১. Niazmand, M. S; *The Role of Khanqas;* Journal of Kashmir Studies; Vol:III; 2009; Pp: 57-64.
২. Khayal, G. N; *Role of Islam in Transforming Kashmiri Society*; Koumal of Kashmir Studies; Vol:III; 2009, Pp: 73-79.
৩. Fazili, Manzoor; Kashmir Miths; Journal of Kashmir Studies; 2007; Pp: 9-15.
৪. Shauq, Shafi; Kashmiri Folklore: A language with thousand dialects; Journal of Kashmir Studies, 2007, Pp: 3-7.
৫. Hassnain, Fida M; *The Impact of Muslim Rule on the Kashmiri Society;* Journal of Kashmir Studies (Vol: III), 2009, pp: 6-36.

১৯

মধুর সন্তুর, মন কাড়া সুর

সঙ্গীত আর কাব্য নিঃসন্দেহে একটি সমাজের নিজস্ব চেহারা তুলে ধরে। ওই সমাজের নিজস্ব ধাঁচের রোমান্টিকতা আর বেদনা উপমা হয় সঙ্গীতে। একবার কাশ্মীরি এক গজল সন্ধ্যায় গজল শুনে মনে মনে গেয়ে উঠেছিলাম, 'সব গানেরই একই কথা। প্রেম-প্রীতি, দুঃখ-ব্যথা'। কথাগুলো একই হলেও প্রেক্ষাপট ভিন্ন। একটি সমাজের সঙ্গীতই বলে ওই সমাজের মূল কোথায় গ্রোথিত।

কাশ্মীরের সঙ্গীত ও শিল্প সাহিত্যের ইতিহাস মূলত বৈদিক যুগের ইতিহাস। সংস্কৃতিকর্মীদের এ কথা অজানা নয় যে, মঞ্চনাটক আর সঙ্গীত একে অপরের পরিপূরক এক প্রাচীন শিল্প। আর 'নাট্যশাস্ত্র' হচ্ছে এই শিল্পের বাইবেলসম। ভারতমুণী নাট্যশস্ত্রের রচয়িতা। তিনি ছিলেন কাশ্মীরি। তার নাট্যশাস্ত্রের ৩৬টি অধ্যায়। আর কাশ্মীরি শেভিস্ট দর্শনেরও ৩৬টি বিশ্বাস। পৃথিবীতে প্রথম নাটক ও সঙ্গীতের চর্চা কোথায় হয়েছে তা স্পষ্ট বলা কঠিন। তবে ধারণা করা যায়, ভারতীয় সঙ্গীতকে ব্যকরণবদ্ধ বা নিয়মাধীন করেছে প্রথমে কাশ্মীরিরাই। নাট্যশাস্ত্রকে বলা হয় পৃথিবীর মঞ্চাভিনয়ের প্রথম লিখিত গ্রন্থ[১]। ধারণা করা হয় এর রচনাকাল খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক। ভারতমুণী তার ওই সংস্কৃত গ্রন্থে বলেছেন, নাট্য সৃষ্টি হয় চারটি বিষয়ের সমন্বয়ে; যথা– পাঠ, গীত, অভিনয় ও রস। এই চারটি বিষয় এসেছে যথাক্রমে বেদ-এর চারটি খণ্ড থেকে। ঋগবেদ থেকে পাঠ, সমবেদ থেকে গীত, আয়ুর্বেদ থেকে অভিনয় আর অথর্ভবেদ থেকে এসেছে রস। এভাবে চারটি বেদ সমন্বিত করে নাট্যশাস্ত্র নিজেই বেদ-এর পঞ্চম পাঠ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ওই গ্রন্থেই ভারতমুণী তার ৩৬টি অধ্যায়ের মধ্যে পাঁচটি অধ্যায় লিখেছিলেন সঙ্গীত সম্পর্কে। সেখানে অন্তত ২২টি শ্রুতির বর্ণনা দিয়েছেন। আরও দিয়েছেন বীণ ও ধ্রুপদ সঙ্গীতের কৌশল। অর্থাৎ, একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, প্রাচীনকালে কাশ্মীরি বিজ্ঞজনেরা সঙ্গীতকেও ব্যকরণবদ্ধ করেছিলেন।

ওয়ানয়ুন আর রৌফ হলো কাশ্মীরের 'প্রাচীনতম' কিসিমের গান[২]। বিশেষ অনুষ্ঠানাদিতে এর চর্চা হয় কাশ্মীরের ঘরে ঘরে। সাধারণত সমলিঙ্গের লোকেরা, বিশেষত নারীরা, এক সঙ্গে হয়ে ওয়ানয়ুন চর্চা করে থাকে। ঈদে কিংবা বিয়ে অনুষ্ঠানে; অথবা যেকোনো খুশির দিনে কাশ্মীরের ঘরের ভেতর থেকে ভেসে আসে সমবেত নারী কণ্ঠে ওয়ানয়ুনের সুর। এক তালে, এক লয়ে গাওয়া হয় এই ফোক

গান। কিছুটা হালকা টোনের। এর মূল কথা হলো কল্যাণকামনা। নতুন জন্ম নেওয়া শিশুর কল্যাণ কামনায় গওয়া হয় ওয়ানয়ুন। বিয়েতে কন্যার সুখ শান্তি কামনায় বৌকে ঘিরে রেখে বাড়ির নারীরা একসঙ্গে গায় ওয়ানয়ুন। বরের আগমনে স্বাগতম জানিয়েও গাওয়া হয় ওয়ানয়ুন। বিয়ে বাড়ির প্রস্তুতির সময় ওয়ানয়ুনের জন্য আলাদা থাকে একটি কক্ষ। মাটির কলসির মতো দেখতে এক ধরনের বাদ্য আছে। কাশ্মীরি ভাষায় এর নাম 'তাম্বাখ নীয়ের'। মাটির তৈরি যন্ত্রটার এক মুখ ভেড়ার চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে। চামড়ায় ঢাকা ওই মুখে হাত দিয়ে টোকা দিলে ধপ-ধপ শব্দ হয়। ওয়ানয়ুনের আবহে ওই বাদ্যটি তবলার মতো তাল তোলে। মধ্যরাতে যখন স্তব্ধ হয়ে যায় প্রকৃতি তখন ওয়ানয়ুনের সুর ভেসে যায় সুদূর গ্রামে। যে কেউ বুঝতে পারে, অনেক হতাশা আর বেদনার মধ্যেও হয়তো পাশেই কোনো ঘরে খানিকটা সুখের বাতাস বইছে। গুলমার্গ থেকে ফেরার পথে একটা মাজারের নাম আস্তান-এ-বাবা ঋষি। সেখানে বেশ উঁচু একটা পাহাড়ের ওপর মাজার, একটি মসজিদ আর আছে একটি বৈঠকখানার মতো ঘর। সেখানে গিয়ে হঠাৎ কানে এল ওয়ানয়ুনের সুর। সুরের উৎসে গিয়ে দেখা গেল বাবার আস্তানে (বুজুর্গের মাজারে) একটি শিশুকে আনা হয়েছে। সঙ্গে এসেছেন ওই শিশুর মা-খালা-ফুফুরা। ওই শিশুর মাথার চুল কামানো হচ্ছে। আর সেই সঙ্গে শিশুটির কল্যাণ কামনা করে গাওয়া হচ্ছে ওয়ানয়ুন। 'বাবা সা'বোস আস্তানোস্ মাঞ্ঝ, মাক-মাদীনাস পয়গাম ওয়াল'। বাবা সাহেবের আস্তানে মক্কা মদীনা থেকে লোক এসেছে সাফল্যের পয়গাম নিয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কাশ্মীরি শিশুদের জন্মের পর মাথার চুল প্রথমবার চাঁছার জন্য তাদের নিকটবর্তী মাজারে নিয়ে যাওয়ার রেওয়াজ আছে। দিল্লিতে থাকাকালে এক কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ পরিবারের বিয়ের দাওয়াত পেয়েছিলাম। সেখানে ছিল বিশাল আয়োজন। আয়োজনের মধ্যে কাশ্মীরি, পাঞ্জাবি আর হালের ফ্যাশনের মিশেল ছিল। তবে, বর পক্ষের আগমনের পর ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে রমণীদের গেয়ে ওঠা ওয়ানয়ুনের সুর শুনে আমি আবিষ্কার করেছিলাম, হিন্দু আর মুসলিমের মধ্যে ওয়ানয়ুনের সুর তফাৎবিহীন।

রৌফ একটু রোমান্টিক। তার গুরুত্বও আলাদা। রৌফ-এ গানের সঙ্গে সঙ্গে আছে মৃদু ছন্দের নাচ। এটিও মূলত নারীরাই করে থাকে। আবহসঙ্গীত হিসেবে গান চলে। অন্তত আটজন নারী দুই সারিতে ভাগ হয়ে পাশাপাশি দাঁড়ায়। একে অপরের কাঁধে হাত দিয়ে অবিচ্ছেদ্যভাবে সারি বাঁধে। এরপর এক সারি সামনে আসে, অন্যটা যায় পেছনে। দুই সারির মেয়েরা একটা ছন্দ মিলিয়ে একে অপর থেকে দূরে আর কাছে আসে-যায়। প্রতি সারির মেয়েরা তাদের নিজেদের মধ্যে এমন সমমেল সৃষ্টি করে যেন মনে হয় শান্ত জলাশয়ের স্নিগ্ধ ঢেউ। এরই মধ্যে গানের তালে তালে একজন বেরিয়ে সামনে এসে প্রদর্শন করে মৃদু-মন্দ সব মুদ্রা। সে ফিরে গিয়ে

কাতারবন্দি হয়। অন্যজন বেরিয়ে আসে নতুন কলির সঙ্গে আপন মুদ্রার নাচ নিয়ে। তেমনি একটি রৌফ গানের দুই লাইন বিস্মৃত হবার নয়।
সেখানে শুনেছিলাম–

> 'রো'শ ওয়ালা ম্যইনে দিলবারু/পোশান বাহার আ.. ইউরওয়ালু'; 'ওগো প্রাণবন্ধু, গোস্বা হয়েছে তোমার/ফুলেল বসন্ত এসেছে/তুমিও এসো ফিরে'।

মজার ব্যাপার হলো, উর্দু দিলরুবা শব্দটি কাশ্মীরিতে দিলবারু হয়েছে। আর 'পোশান বাহার' শব্দ দুটি এসেছে ফার্সি থেকে যার অর্থ ফুলেল বসন্ত। গবেষকরা বলেন, এই গানগুলো শিক্ষাবঞ্চিত নারীদের মুক্তি দিত জীবনের একঘেয়েমি থেকে। আর গানগুলোর মধ্যে তাদের আবেগের প্রস্ফুটন ঘটত। অবদমিত স্বপ্ন-সাধগুলো প্রকাশ পেত রৌফ-এ।(৩) অন্যত্র বলেছি কাশ্মীরি নারীরা পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে মাঠে-ঘাটে, এমনকি গাছে। কিন্তু, মনে হয়েছে বিনোদনের ক্ষেত্রগুলোতে কাশ্মীরি নারীদের আয়োজন অনেকটাই তাদের নিজস্ব, ঘরোয়া। তবে, এখনকার সময়ে সংস্কৃতি হলো প্রদর্শনের বিষয়। সুতরাং, ঘরোয়া সেই সংস্কৃতির উপাদানগুলো অনুষ্ঠানাদিতে মঞ্চায়িত হয় নানা রং-ঢং মিশিয়ে।
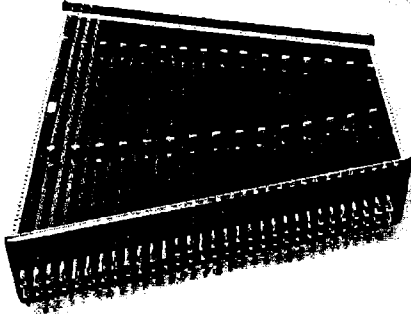
চিত্র ১৯.১: সন্তুর বা শততন্ত্রী বীণা

কাশ্মীরি সঙ্গীতের জগতে বৈচিত্র্য আর নিজস্বতার শেষ নেই। এখনকার হলিবলি'র যুগেও কাশ্মীরি ফোক সঙ্গীত যথেষ্টই জনপ্রিয় হিসেবে টিকে আছে। অস্বীকার করবো না, হুমকির মুখে আছে। অসংখ্য প্রতিভার অবদানে সিক্ত সে সঙ্গীত। এখানে স্পষ্ট, কাশ্মীরি সর্বসাধারণ শিবের উপাসনা থেকে যেমন কালক্রমে প্রথমে বৌদ্ধধর্ম এবং পরে হয়েছে মুসলিম, তেমনিভাবে তাদের সঙ্গীতও সংযোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে পেয়েছে সমৃদ্ধি। সুফি-ঋষিরা তাদের শান্তিবার্তার জন্য সঙ্গীতপ্রেমী কাশ্মীরি পরিবেশকে সহায়ক পেয়েছেন। মুসলিম সুফিরা ১৪ শতকে কাশ্মীরে যখন আসেন, তখন তারা দেখেছিলেন শিবের উপাসনা কাশ্মীরে সবচেয়ে অভিজাত মানুষের উপাসনা। শিবজী শঙ্করাচার্যকে ভক্তি করে কাশ্মীরি মন্দিরগুলো থেকে যে সঙ্গীত তখন গাওয়া হতো তার নাম 'ভজন'। আশ্চর্যজনক হলেও একথা

সর্বজনবিদিত, শিবের ভক্তি–'ভজন' আর মুসলমানদের খোদা-ভক্তি 'আওরাদ-এ-ফাতিহার' সুরে অমিল খুব একটা ছিল না। আওরাদ-এ-ফাতিহা আরবি উচ্চারণে হতো বটে। তবে, আরবির তারতিল বা শুদ্ধ উচ্চারণ সেখানে ছিল না। এখনও নেই। এখনও ভোরে ভোরে কাশ্মীরের মসজিদগুলো, বিশেষ করে বড় বড় খানকাহগুলো থেকে যে আওরাদের সুর আসে তা খাঁটি আরবি উচ্চারণ থেকে বেশ খানিকটা আলাদা। তবে, তার সুরে সুগভীর দরদ আছে, আছে হৃদ্যতা আর আত্মহারা হওয়ার মতো মর্মভেদী আবেদন।

১৬ শতকে হাব্বা খাতুন (শাসক ইউসুফ শাহ চাকের স্ত্রী) নিজেই সৃষ্টি করেছিলেন নানা নতুন ধারার সঙ্গীত। রাস্ত্ (Raast) বা কাশ্মীরি রাগ সঙ্গীত তাঁরই অন্যতম। জানা গেছে, শাসক ইউসুফ শাহ চাক শরাব পিয়ে বুঁদ হয়ে গানের আসরে, সুরের লহরে মিশে থাকতেন। আর নিজে গাইতেন, 'যত পার ভোগ কর/যতক্ষণ বেঁচে থাক'। ইরাক ও হেজাজের সঙ্গীতের ধাঁচবাহী আরেক সুরের নাম 'সুফিয়ানা' বা 'শাফীনা'। এই ধাঁচের মূল বিস্তৃতি ঘটে জাইনুল আবেদীন বাদশাহের আমলে (১৪২০-৭০ খ্রি.)।[৪] আশমোকাম নামে দক্ষিণ কাশ্মীরে একটি আস্তান আছে। সেটি মূলত হজরত জাইন উদ্দীন ওয়ালী (রহ.)-এর মাজার। রুহানীয়াত, তাসাওফ ও ঋষিয়্যাতের 'আলমবরদা'র এই বুজুর্গের আস্তানায় গিয়ে অবলোকন করেছিলাম শতাধিক শিশু-কিশোর সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গাইছিল মনোমুগ্ধকর সুফিয়ানা। একজন বুজুর্গ সুফি ছিলেন তাদের মূল গায়ক। এই শাফীনা-এ-কালামের জন্য এক অবিচ্ছেদ্য বাদ্যযন্ত্র সন্তুর। কাঠের বাক্সের ওপরে বেশ কয়েকটি সরিতে তার সাজানো থাকে। সেই সমান্তরাল তারের ওপরে সরু-কাঠের চামচের মতো দুটি দণ্ড দিয়ে আঘাত করা হয়। তাতেই নানা রকমের সুর ওঠে। সন্তুর তার আপন সুরে বলে দেয় ইরানি/ফার্সি সভ্যতার সঙ্গে কাশ্মীরিদের সখ্য কতখানি। সন্তুর হলো ইরানের জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে তবলার তাল আমার শ্রেষ্ঠ মনে হতো। প্রথমবার সন্তুরের টুনটুন শব্দের তালে আমার ধারণা বদলে গেল। সঙ্গীতপ্রেমী যে কেউই সন্তুরে মুগ্ধ হবেন বলে আমার বিশ্বাস। খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সন্তুরের প্রচলন ছিল ইরাক ও ব্যাবিলনে। সংস্কৃত ভাষায় সন্তুরের নাম হলো, 'শততন্ত্রী বীণা'।

সবশেষে গজলের কথাতো না বললেই নয়। আমাদের দেশে গজল সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। অনেকেই মনে করেন গজল মানে ধর্মীয় সঙ্গীত। আসলে গজল হলো সঙ্গীতের একটা মৌলিক ধারা, যার মূল উপজীব্য হলো, 'মরম'। কাশ্মীরিদের কাছে গজলের জনপ্রিয়তা অনেক। কাশ্মীরি গজল শিল্পী রাশেদ জাহাঙ্গীরের একাধিক লাইভ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলাম। তার ওইসব গজলের মর্মকথার সঙ্গে অগণিত বাংলা গানের মিল থাকায় তার প্রতি আমার টান

স্বভাবতই বেড়েছে অনেকগুণ। হাজার দর্শকের সামনে রাশেদ জাহাঙ্গীর সেদিন গাইছিলেন–

> 'দিল পারেশান, ছুম গমুত/ শাহে মাদীনা..স ওয়ান সালাম।
> দাস্ত্ ওয়াইল-ওয়াইল/মাওনাইস,/মাহজাবীন'স/ওয়ান সালাম।
> দিল পারেশান..'।

যার অর্থ হলো–

> ব্যাকুল হৃদয় আমার। যদি পারতাম মদীনার শাহ'র কাছে আমার সালাম পাঠাতে!/হে চন্দ্র, তুমি ওই মেহজাবিনের কাছে সালাম খানি পৌঁছে দিও।

বাংলায়ও ফকির-বাউলেরা এমন বহু গান বেঁধেছেন, আজও বাঁধেন। যাই হোক, কাশ্মীরের বিখ্যাত কবি মেহজুরের একটি কবিতা দিয়েই শেষ করা যাক। তিনি লিখেছিলেন, 'শীত শেষ হবে। বরফ গলে যাবে। এবং সত্যি সত্যিই বসন্ত আসবে ফের।' রাজনীতির চোরাবালিতে হাবুডুবু খাওয়া কাশ্মীরিরা আজও তাদের কাব্যে, গানে-সঙ্গীতে স্বপ্ন দেখে সেই বসন্তের।

নোট/সূত্র

১. Subhash Kak; *The Wander that Was Kashmir*; www.ece.lsu.edu/kak/wonder.pdf
২. Muhiud-Din Hajini; *An Outline of the Growth of Various Forms in Kashmir Literature*, In The Literary History of Kashmir (Chapter 6) by K. L. Kalla (Ed.), Mittal Publication, Delhi.
৩. Muhiud-Din Hajini; *An Outline of the Growth of Various Forms in Kashmir Literature*, In The Literary History of Kashmir. 41.
৪. Javid Iqbal; Yusuf Shah Chak: Music Loving King of Kashmir; Greater Kashmir; October 3, 2015; P9.

২০

কাশ্মীরিদের চোখে বাংলাদেশ

কাশ্মীরের একটি গ্রামের নাম 'বাংলাদেশ'। শ্রীনগরের লোকেরা এ তথ্য খুব একটা জানে না। খবরের কাগজের ভেতরের পৃষ্ঠায় একটা রিপোর্টে হঠাৎ এসেছিল তথ্যটা।[১] প্রাণের টানে ছুটে গেলাম সেখানে। শ্রীনগর থেকে অন্তত ৮০ কিলোমিটার উত্তরে বান্ডিপুরা জেলার আলুসা তহশিলে অবস্থিত 'বাংলাদেশ'। জেলা শহরেও গ্রামটি পরিচিত নয়। সোপুর-বান্ডিপুরা রোডের মধ্যখান থেকে মাটির রাস্তায় হেঁটে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার। সাধারণত বাইরে থেকে কেউ সেখানে যায় না। আমার মতো এক বিদেশি ওখানে যাচ্ছে শুনে রীতিমতো আশ্চর্য হয়েছিল পথিকেরা। সেখানকার লোকেরা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। অনেকে পানিবাদাম[২] সংগ্রহ করে। বিখ্যাত উলার হ্রদের তীরে অনেকটা ভাসমান ছোট্ট সেই গ্রাম। বিপরীত দিকে সুউচ্চ পর্বত। গ্রামটি ১৯৭১ সালে স্থাপিত। ওই গ্রামের সবচেয়ে বৃদ্ধ বাসিন্দা হাবিবুল্লাহ ভাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। তিনি জানান, পার্শ্ববর্তী জুরিমঞ্জ গ্রামের ৫/৬টি ঘর ১৯৭১ সালে হঠাৎ করে পুড়ে গিয়েছিল। তখন তারা পাশের ফাঁকা স্থানে নতুন ঘর বানায়। একই বছর যেহেতু পূর্ব পাকিস্তান আজাদ হয়ে বাংলাদেশ নাম নেয়, তাই তারাও তাদের গ্রামের নাম রাখেন বাংলাদেশ। সেই পাঁচ ছয়টি ঘর থেকে বেড়ে এখন ওই গ্রামের জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে তিনশ। ঘরের সংখ্যা ৫০টি। বান্ডিপুরা ডিসি অফিসের তালিকায় এটিকে একটি আলাদা গ্রামের মর্যাদা দেওয়া হয় ২০১০ সালে। ছোট্ট মৎসজীবী কমিউনিটির জনগণের কাছে ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘটনাটি এভাবে জমাটবদ্ধ হয়ে আছে তা সত্যিই অপূর্ব। এই গ্রামটি যেদিন আবিষ্কার করলাম সেদিন থেকে মনে হচ্ছিল কাশ্মীরের সঙ্গে বাংলাদেশের অন্যরকম এক হৃদয়ের সম্পর্ক আছে। মজার ব্যাপার হলো, এখন ওই গ্রামের সব মানুষ বাংলাদেশ নামে আরেকটি দেশের খবর জানে না। শিশুদের কয়েকজনকে দেখা গেছে ক্রিকেট খেলার মাধ্যমে বাংলাদেশকে চেনে।

বিপরীত একটা খবর দেই। বাংলাদেশের বরিশালের নাজিরপুর, নেছারাবাদ (স্বরূপকাঠী) ও বানারীপাড়া উপজেলার মধ্যবর্তী একটি দ্বীপ গ্রাম বেলুয়া মুগারঝোর। ওই গ্রামকে স্থানীয়ভাবে বলা হয় 'বাংলার কাশ্মীর'। গ্রামটি মূলত পিরোজপুর জেলার অধীনে। এই নামকরণটি নিছক একটি জনশ্রুতি। কাশ্মীরের সঙ্গে ওই গ্রামের তেমন কোনো বৈশিষ্ট্যগত মিলও নেই। তবে, এর মধ্য দিয়ে মানুষের মনে কাশ্মীরের যে একটি অবস্থান আছে তার ইঙ্গিত মেলে।

কাশ্মীরের ইতিহাসেও বাংলাদেশের সংযোগ মিলেছে খানিকটা। মৃদু রায় তার বইয়ে একটি তথ্য তুলে ধরেছেন। ডোগরা মহারাজার আমলে কাশ্মীরের মুসলিম খানকাহ ও মসজিদগুলোর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব মুসলমানদের হাতে ন্যস্ত করা হয় ১৮৮৬ সালের দিকে। সে সময় অর্থাভাবে সেগুলোর মেরামতের কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

চিত্র ২০.১: পর্বতের চূড়া থেকে নেওয়া বাংলাদেশ গ্রামের দৃশ্য

সেই বছর হজরতবাল মসজিদ ও খাজা নকশাবন্দির মাজার (টম্ব) মেরামতের জন্য ঢাকার নবাব অর্থ দিয়েছিলেন।[৩] আরেকটি তথ্য ১৯৬৪ সালের। হজরতবাল মসজিদে সংরক্ষিত হজরতের (সা) কথিত দাড়ি– 'মুঈ মুবারক' চুরি হয়েছিল তখন। কাশ্মীরের ইতিহাসের এ এক বিরাট ঘটনা।[৪] সে ঘটনার জের ধরে কলকাতা, ঢাকা, খুলনায় একের পর এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল।

সার্বিকভাবে কাশ্মীরিদের কাছে বাংলাদেশ কেমন তা জানতে শুধু ওই একটি গ্রামের কথা যথেষ্ট নয়। ওখানে নতুন কারও সঙ্গে পরিচিত হলে আমার খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন ছিল, Do you know Bangladesh? উত্তর পেয়েছি বিভিন্ন রকমের। অশিক্ষিত গ্রামীণ মানুষের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর ছিল, 'না'।

আমার বন্ধু মে'রাজের অক্ষরজ্ঞানহীন মা যখন জেনেছিলেন আমি বাংলাদেশি তখন এটা তার কাছে আলাদা কোনো অর্থ বহন করেনি। তিনি শুধু এটুকুই বুঝেছিলেন এই ছেলে তার ভাষা জানে না, বিদেশি। এই ছেলে চেহারা-আকৃতিতে বিদেশি। বিদেশি অতিথিকে নিজের সর্বস্ব দিয়ে আপ্যায়ন করার জন্য তিনি ছিলেন ব্যাকুল! তিনি আমার কাছে এসে মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে দিলেন। আমার বন্ধুর মাধ্যমে তিনি আমার পরিবারের কথা জানতে চাইলেন। আমার বাবা অনেক আগে মারা গেছেন জেনে মুখখানি গোল করে চোখদুটো বড় করলেন। দুঃখ প্রকাশ করলেন। মায়ের কথা আমি জানালাম, তার মতো বৃদ্ধা। গ্রামে থাকেন। তখন মনে পড়ল, আমার মায়ের কথা। মনে মনে তুলনা করলাম, আমার মায়ের সঙ্গে কাশ্মীরি এই মো-জির। জিজ্ঞাসা করলেন, ভাইবোনের কথা। বললাম, চার ভাই আর চার বোন। মে'রাজ কাশ্মীরি ভাষায় বুঝিয়ে দিল, চুয়ার বোওই, চুয়ার বেহেন। পোশাকের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। রুমের এক কোনায় ঝুলিয়ে রাখা নিজের ফেরেন (জুব্বার মতো শীতের পোশাক বিশেষ) বের করে দেখালেন এটা তার পোশাক। আমি জানালাম, আমার মা বাড়িতে শাড়ি পরেন। বাইরে গেলে বোরখা পড়েন। মে'রাজ তার মাকে উচ্চারণ করে দিল 'সাড়ি'। তিনি বোঝেননি। তাকে বোঝানো হলো, হিন্দুস্থানি পোশাক। তিনি মেনে নিলেন। কোনো মন্তব্য করলেন না।

ওর বাবাকে দেখে মনে হলো তিনি বিব্রত। তিনিও একভাষী, কাশ্মীরি। শেষ বিকালের দিকে গরু নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন। আমার দিকে প্রথমবার তাকিয়ে আবার চোখ ফিরিয়ে নিলেন। একটু পরে আমার বন্ধু তাকে জানাল আমার পরিচয়। তিনি আমার দিকে তাকালেন। আমি বেশ স্পষ্ট গলায় হাসি দিয়ে উচ্চারণ করলাম, আসসালামু আলাইকুম। এই বাক্যটি তার জন্য অপরিচিত ছিল না। তিনি হাসিমুখে জবাব দিলেন। কাছে এলেন আমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে সবিনয়ে ঝাকালেন। বন্ধু জানাল, বাংলাদেশ থেকে এসেছে। হেসে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, বাঙ্গাল! কোনো ভাল-মন্দ প্রতিক্রিয়া লক্ষ করলাম না। তারপর চলে গেলেন গোসলখানার দিকে। ফেরার সময় আমি একইভাবে দোয়া চাইলাম। শুকরিয়া জানালাম। তিনি হাসলেন। হাত মিলিয়ে বিদায় দিলেন। মনে হলো, মা-জি যতটা যত্নবান তিনি ততটা নন। বিদেশি মানুষের সামনে তিনি যথেষ্ট অন্তর্মুখী। বন্ধুর বোনদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তারা সরাসরি আমাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করেনি। কিভাবে জিজ্ঞাসা করবে তা নিয়ে হয়তো বিব্রত ছিল। কারণ ভাষা যে দুর্বোধ্য। ফিরে আসার আগে অবশ্য ওদের বাসায় গিয়েছি আরও বহুবার। যতবার গিয়েছি, পেয়েছি বাংলাদেশের মেহমানের জন্য অপরিসীম তাড়া আর অস্থিরতা। শেষবার ফেরার আগে মা সুটকেস

খুলে সাদা কাপড়ের একটা প্যাকেট বের করলেন। সোনালি সুতার নকশা আঁকা সালোয়ার-কামিজের কাপড়। আমাকে দিলেন। বললেন, তোমার মায়ের জন্য বকশিস। আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম, আমার মা সালোয়ার-কামিজ পরেন না। তিনি শাড়ি পরেন। তাকে জানালাম, কাশ্মীরি চাদর আমার মায়ের পছন্দের। এবং তা আমি কিনেছি। তখন তিনি খুশি হলেন। আমি বললাম, আপনার দোয়া আমার মায়ের কাছে পৌঁছাবে। আরও বললাম, আপনাদের জন্য আমার মাকে দোয়া করতে বলব। তিনিও দোয়া করলেন। ওই মা'কে ভোলা যাবে না কোনো দিন।

চিত্র ২০.২: কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখকসহ বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা

আরেক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম। ওর বাবা শিক্ষিত, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। দুই ভাই সরকারি চাকরিজীবী। ওদের পরিবারের সবাই বাংলাদেশকে জানে। শিক্ষক বাবা, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাংলাদেশের সবকিছু জানতে চাইলেন। প্রধান ফসল কী? আমরা কী খাই। মানুষের অবস্থা কেমন? ধনী ও দরিদ্র্যের খবর জানলেন। ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের কথা জানতে চাইলেন। রাজনৈতিক অস্থিরতার কথা জানতে চাইলেন। বিয়ে-আচার-ব্যবহার, রাজনীতি-সংস্কৃতি সবকিছু জিজ্ঞাসা করলেন।

তরুণদের অনেকে বলেছে, তারা বাংলাদেশকে চেনে সাকিব আল হাসানের নামে। বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ভাল খেলে এটা তারা জানে। তারা, সাধারণত ক্রিকেটে পাকিস্তানের সমর্থন করে। ২০১৩ সালের এশিয়া কাপে পাকিস্তান সেমিফাইনালে

বাদ পড়ার পর ফাইনালে ভারতের বিরুদ্ধে তারা বাংলাদেশের বিজয়ের জন্য বুক বেঁধে প্রত্যাশা করেছে। ২০১৫ সালের বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালেও তারা ভারতের বিরুদ্ধে সমর্থন করেছে বাংলাদেশকে। ন্যাশনাল কনফারেন্সের (ভারতমুখী রাজনৈতিক দল) এক নেতার সঙ্গে (ফেব্রুয়ারি ২০১৫) এক রাতে কফি পান করছিলাম দিল্লির খান মার্কেটে। তিনি মজা করে বলছিলেন, 'আমরা অনেক বিষয়ে ভারতের সঙ্গে থাকতে চাইলেও তিনটি বিষয়ে আমাদের পাকিস্তানের পক্ষেই থাকতে হবে। এক. ক্রিকেট, দুই. ঈদের চাঁদ এবং তিন. নারায়ে তাকবির স্লোগান। আমরা ভারতকে বলে থাকি, এই তিন বিষয়ে আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে। এতে আপনাদের নাখোশ হওয়ার কিছু নেই।' মোটকথা হলো, কাশ্মীরের অধিকাংশ তরুণ ক্রিকেটে বাংলাদেশকে সমর্থন করে পাকিস্তানের পরে আর ভারতের বিরুদ্ধে। তারা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চেনে 'নিষ্ঠুর' এবং ভারতমুখী রাজনীতিক হিসেবে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়ে তাদের মধ্যে রয়েছে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া। আমি আশ্চর্য হয়েছি একটি বিষয়ে যে, কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের গানি কাশ্মীরি স্কলার্স হোস্টেলে অবস্থানরত পিএইচডি গবেষকদের যার সঙ্গেই পরিচিত হয়েছি তিনিই আমাকে যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন।

কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি সায়েন্সের শিক্ষককে প্রশ্ন করেছিলাম, বাংলাদেশকে কেমন দেখেন আপনি (১৬/০২/১৫; নয়া দিল্লি)? তিনি বললেন, 'বাংলাদেশ অসীম সম্ভাবনাময় দেশ। ও দেশের মানুষ কঠোর পরিশ্রমী। দ্রুত উন্নত হওয়ার জন্য তারা অদম্য। অর্থনৈতিকভাবে তারা এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। কিন্তু, সামরিকভাবে তাদের শক্তি তেমন নয়। অনেকটা ভারতের ওপর নির্ভরশীল। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মতো ভারতের বিগ-ব্রাদার সুলভ ভূমিকা থেকে বাংলাদেশ বের হতে পারছে না। সামরিক ছাড়াও অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেই এটা হচ্ছে। এখনও দেশটির বড় একটা সংখ্যক মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে রয়েছে। সেদিকে খুব বেশি মনোযোগ দেওয়া জরুরি ছিল সরকারের। দেশটি এখনও ১৯৭১ সালের কিছু বিষয়ের সমাধান করতে পারছে না। জামায়াতে ইসলামীর লোকদের যেভাবে ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে তা দেশটিকে আরও বেশি সংঘাতের দিকে ঠেলে দেবে। তাদের ফাঁসি না দিয়ে জেলখানায় পুরে রাখা যেত। তারা সেখানেই মরতো, এতে কোনো অসুবিধা হতো না। কিন্তু, ফাঁসি দিয়ে তাদের আরও শক্তিশালী করে দেওয়া হয়েছে।'

আমি প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরেও তো জামায়াতে ইসলামী আছে। সম্ভবত তারাও একই আদর্শের অনুসারি। এই ধর্মীয় গ্রুপটির ব্যাপারে আপনার মতামত কি? একজন কাশ্মীরি হিসেবে এই দলটির বিষয়ে আপনার অভিজ্ঞতা কী? বললেন–

> "জামায়াতে ইসলামী একটা ইসলামী রাজনৈতিক দল। তবে, রাজনীতির বাইরেও তাদের রয়েছে অনেক ব্যবস্থা। তারা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ, শিক্ষা-

প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। ১৯৭০'র দশকেই তারা এরকম অনেক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতো জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরে। সৈয়দ আলী গিলানী (জামায়াতে ইসলামী ও হুরিয়াত কনফারেন্স উভয়ের সদস্য) তখন জামায়াতের নির্বাচিত এমএলএ ছিলেন। ধর্মভিত্তিক এই দলটি সবসময়ই 'সেক্যুলার'[৫] আদর্শের ন্যাশনাল কনফারন্সের (আবদুল্লাহ) জন্য ছিল চ্যালেঞ্জ। ১৯৪০-এর দশক থেকে জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের জাতীয়তাবাদী সকল আন্দোলনে শেখ আবদুল্লাহর এই ন্যাশনাল কংগ্রেস অনবদ্য অবদান রেখেছে। কিন্তু, তারা জামায়াতে ইসলামীর আদর্শের মোকাবিলা রাজনৈতিকভাবে করতে পারেনি। শেখ আবদুল্লাহ এখনও কাশ্মীরের মানুষের কাছে স্মরণীয়। তার নেতৃত্বেই কাশ্মীরে জামিদারদের হাত থেকে জমি অধিগ্রহণ করে সবাইকে বণ্টন করা হয়েছে। জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের মানুষের আর্থসামাজিক এই পরিবর্তনের ফল তারা কয়েক প্রজন্ম ধরে ভোগ করবে। কিন্তু তিনিই জামায়াত মোকাবিলায় ভুল করেছেন। ১৯৭০-এর দশকে জামায়াতকে নিষিদ্ধ করা হয় তার আমলে। তাদের পরিচালিত স্কুলগুলো পোঁড়ানো হয়। অনেক মানুষকে মারা হয়। পুলিশ দিয়ে চালানো হয় তাদের ওপর অনেক নির্যাতন। পরে তারা আবার অন্যভাবে সামনে আসে। বাংলাদেশেও আওয়ামী লীগ তেমন ভুল করছে।"

জানতে চাইলাম, অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক শক্তির জন্য ধর্মীয় দল একটা চ্যালেঞ্জ। এটা সত্য। কিন্তু, এটা মোকাবিলার উপায় কি? তিনি বললেন–

'সেক্যুলারিজম একটা আদর্শ। যারা সেক্যুলার তাদের কাছে এটা শ্রেষ্ঠ। ভারতে অনেকের কাছে হিন্দুত্ব শ্রেষ্ঠ। তেমনি জামায়াতের লোকদের কাছে ইসলাম শ্রেষ্ঠ। সেক্যুলার শক্তি কেন মনে করে যে, শুধু সেক্যুলারিজমই একমাত্র আদর্শ? জনগণের ভোটে যারা ক্ষমতায় যাবে তারা তাদের আদর্শে চালাবে। তারপর জনগণের যদি পছন্দ না হয় তাহলে তারা পাঁচ বছর পর দেখে নেবে। কিন্তু, সেক্যুলার দলগুলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি সেই আস্থা রাখতে পারছে না। মিশরেও তাই হয়েছে। সব জায়গায়ই হচ্ছে।'

একজন ব্যক্তির বক্তব্য এখানে তুলে ধরেছি। সিংহভাগ কাশ্মীরি শিক্ষিত মানুষের মন্তব্য এমনই। মোটকথা, বাংলাদেশের রাজনীতির বিষয়ে অধিকাংশ কাশ্মীরির মতামত মূলত পাকিস্তানের রাজনৈতিক মতামতের কাছাকাছি। শুধু শিক্ষিত কেন, সাধারণ মানুষও এর বিপরীত নয়। রমজান মাসের শেষ শুক্রবার জুমাতুল বিদা (২৬ জুলাই ২০১৪)। হজরতবাল মসজিদে সেদিন উপচে পড়া ভিড়। হাজার হাজার মানুষ সেদিন এসেছে সেখানে নামাজ ও দোয়া করতে। সেখানে গিয়ে দেখলাম নানা বয়সের মানুষ শুয়ে-বসে আছে গাছের ছায়ায়। আমি আর আমার নেপালি বন্ধু বিষ্ণু বসলাম এক জায়গায়। বিষ্ণু হাফপ্যান্ট পরা হলেও তেমন কেউ খেয়াল করছে না। তবে, আমার চেহারা কাশ্মীরিদের থেকে আলাদা হওয়ার কারণে

সবাই খেয়াল করে। প্রৌঢ় এক লোক সামনে বসা ছিলেন। তিনি গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কাহা সে? তখন ভাষা বুঝতে আমার অসুবিধা হতো। বিষ্ণু জবাব দিল, 'ম্যায় নেপাল সে হুঁ, অর ইয়ে বাংলাদেশ সে'। আমার দিকে তাকিয়ে বারবার বলতে লাগলেন, 'বাংলাদেশ সে আগে গেয়া?' একপর্যায়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, Do you know Bangladesh? হেসে বললেন, 'ও ভি মাশরেকে পাকিস্তান থা। হিন্দুস্থান জবরদস্তি কারকে বাটোয়ারা কার দিয়া। পাকিস্তান সে আলাক বানা দিয়া। বাংলাদেশ তো হামারা দেশ লাগতা থা'। বৃদ্ধের নাম গোলাম মোহাম্মদ। তিনি অনন্তনাগ জেলার বাসিন্দা। এসব কথার খুব একটা জবাব দিতে পারতাম না প্রথম দিকে। কারণ, মুখে উর্দু ফুটতো না। পরে যখন দুই এক লাইন উর্দু উচ্চরণ করা শিখলাম তখন খুব শক্ত উত্তর দেওয়া শুরু করেছিলাম।

একবার এক দোকানি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাহা সে?' আমি বললাম, 'বাংলাদেশ সে'। হাসতে হাসতে বললেন, 'তোমলোক পাকিস্তান সে আলাক বানায়া?' আমি সেদিন তাকে বলেছিলাম, 'পাকিস্তান ভি হামারা ভাই লাগতা থা। মাগার, হামলোগকো গুলি কারকে খুন লে লিয়াথা। হাম লোগোকো মার দিয়া। ইয়ে অ্যায়সা মুসলমান ব্রাদার লাগতা থা'। তিনি আর কখনও এ বিষয়ে প্রশ্ন করেননি। প্রায় দুই বছর ওই দোকানির সঙ্গে আমার সখ্য ছিল। তার দোকান থেকেই চাল-ডাল কিনতাম সবসময়।

বিশিষ্টজনদের সঙ্গে কাশ্মীরের স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নের কথা উঠলেও আসতো বাংলাদেশ প্রসঙ্গ। তাদের কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা একটা বড় উদাহরণ। তাদের বক্তব্য হলো, পাকিস্তানের বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সংগ্রাম করেছে। একইভাবে, ভারতের বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে কাশ্মীর। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী বাংলাদেশে যে অমানবিক নিষ্ঠুরতা চালিয়েছে ১৯৭১ সালে, কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাবাহিনী একই হিংস্রতা চালাচ্ছে ৬/৭ দশক ধরে। এই প্রসঙ্গে একবার খাবার টেবিলে আলোচনা উঠেছিল কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর এক শিক্ষকের সঙ্গে। তিনি বললেন, বাংলাদেশিরা স্বাধীনতা পাওয়ার ৪২ বছরেও সেই হিংস্রতার বেদনা ভুলতে (Reconcile) পারেনি। আমরা স্বাধীনতা না পেয়েও কিভাবে ভুলব?

প্রসঙ্গত, এখানে একটা উদ্ধৃতি দেওয়া জরুরি। বিখ্যাত সুফি খানকাহ চারার-এ-শরীফে ১৯৯৫ সালে কয়েক ডজন মিলিট্যান্ট সশস্ত্র অবস্থায় আশ্রয় নেয়। সেখানে দীর্ঘ দুই মাস উত্তেজনার শেষে প্রায় ২৫ হাজার সৈন্য ওই এলাকায় অবতীর্ণ হয়। রাতভর যুদ্ধ হয়। আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয় গ্রামসুদ্ধ। খানকাহ ধ্বংস হয়। পুরো গ্রামটিও তছনছ হয়ে যায়। পরে দেখা গেল মাত্র দুইজন যুবকের লাশ। বাকিরা নিশ্চিন্তে পালিয়ে গেছে। সে সময় এক স্থানীয় নাগরিক ক্ষোভ প্রকাশ করলে সেনা সদস্যদের মন্তব্য ছিল, 'ঢাকার মুসলমানদের ওপর পাকিস্তানি সৈন্যরা কী করেছে, দেখনি?'[৬] একাধিক সূত্রেই এমনটি জানা গেছে, ঢাকায় পাকিস্তানি সৈন্যদের

নিপীড়নের দোহাই দিয়ে ভারতীয় সৈন্যরা কাশ্মীরে তাদের সব নিপীড়নকে বৈধ করত। এভাবেই কাশ্মীরের রাজনীতিতে ঘুরে ফিরে আসে বাংলাদেশ। অনেকে বাংলাদেশ আর কাশ্মীরের তুলনা করে বলে, 'তোমরা লড়েছো পাকিস্তানি ফৌজের বিরুদ্ধে ভারতের সাহায্যে। আমরা লড়ছি ভারতীয় ফৌজের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সাহায্যে। শত্রু-মিত্র বদলে গেছে। স্বাধীনতার মর্ম আমাদের একই'।

হার্ভার্ড পিএইচডি অধ্যাপক সিদ্দিক ওয়াহিদ, স্বাধীনতার প্রক্রিয়া নিয়েও বাংলাদেশের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বলেছেন, স্বাধীনতার আগে বাংলাদেশ ঐক্যবদ্ধ ছিল না। পাকিস্তানের শোষণ তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছে। ২৫ মার্চের সেনা অপারেশন তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছে। স্বাধীনতার পরপরই আবার তারা সংঘাত শুরু করেছে। বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশিরাই হত্যা করেছে। সুতরাং, কাশ্মীরের স্বাধীনতা যদি অর্জিত হয়, তারপরই পূর্ণ শান্তি বিরাজ করবে এমনটি নয়। শান্তির জন্য কাশ্মীরিদেরকে কাজ চালিয়ে যেতে হবে নিরন্তর (জামিয়া মিলিয়া, দিল্লি, মার্চ, ২০১৫)।

সব মিলিয়ে বাংলাদেশের জন্য কাশ্মীর মূলত একটা দ্বিধা। স্পষ্টতই, বাংলাদেশ যখন পাকিস্তানের অংশ ছিল, তখন কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্তানের জাতীয় অবস্থানই ছিল বাংলাদেশের জাতীয় অবস্থান। কিন্তু, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ এক নতুন জাতিসত্তা। কাশ্মীর প্রশ্নে আমাদের অবস্থানও তাই নতুনত্বের দাবি করে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, আমাদের পবিত্র স্বাধীনতা কাশ্মীরিদের জন্য ছিল একটা শক্। কারণ, যে পাকিস্তান কাশ্মীরের 'স্বাধীনতার ত্রাতা', সে ভেঙে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল ১৯৭১ সালে। জিএন গওহর লিখেছেন,

> In 1971, Pakistan shattered the hopes here. Frustation prevailed throughout and the whole nation got a severe shock. People could not react in any manner for a pretty long time. The shimla pact revived the hopes to some extent.[৭]

বাংলাদেশ ও কাশ্মীরের সংযোগটাকে গোটা উপমহাদেশের ভূরাজনীতির প্রেক্ষাপটে তুলে ধরার জন্য ইতিহাসবিদ শ্রীনাথ রাঘাভানের কয়েকটি বাক্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি লিখেছেন–

> '১৯৭১ সালের যুদ্ধটি ছিল ১৯৪৭-এর বিভাগের পর উপমহাদেশের ভূ-রাজনীতির ইতিহাসে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। একদিকে এটা বাংলাদেশ নামে একটা জনবহুল জাতির জন্ম দিয়েছে। অন্যদিকে এটা ভারত ও পাকিস্তানের ক্ষমতার ভারসাম্যটাকে ভারতের পক্ষে হেলিয়ে দিয়েছে। পরবর্তীতে উপমহাদেশের সমস্ত সংঘাতই ওই যুদ্ধের ধারাবাহিকতা। কাশ্মীরের মধ্যে লাইন অব কন্ট্রোল, ভারত ও পাকিস্তানের নিউক্লিয়ার

শক্তি হয়ে ওঠা, কারগিলের সিয়াচেন গ্লেসিয়ারে যুদ্ধ, কাশ্মীরে শুরু হওয়া সশস্ত্র বিদ্রোহ আর বাংলাদেশের রাজনৈতিক যন্ত্রণা– সবকিছুই ঘুরেফিরে আলোচনাকে নিয়ে যায় ১৯৭১ সালের ওই নয়টি গুরুত্বপূর্ণ মাসের কথায়।'[৮]

এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে ধারণা নেওয়া যেতে পারে যে, কেন কাশ্মীরিদের কাছে পাকিস্তান ভাগ করার দায়ে তির্যক মন্তব্য শুনেছি। বস্তুত, ভারতীয় ফৌজের প্রতি তাদের ঘৃণা হচ্ছে পর্বতসম। সেই ভারতের সৈন্যরা বাংলাদেশের স্বাধীনতায় নিঃস্বার্থ সহায়তা করেছে এটা তারা বিশ্বাস করে না। তবে, পাকিস্তানি সৈন্যদের নির্মম বর্বরতার বিপরীতে বাংলাদেশিদের প্রতি সহানুভূতি তাদের আছে।
শিক্ষিত ও পেশাজীবীদের কেউ কেউ বাংলাদেশকে জানে ড. ইউনূসের নামে। একজন কাশ্মীরিকে পেয়েছিলাম যিনি বাংলাদেশকে চেনেন রানা প্লাজার ভয়াবহতা থেকে। বাংলাদেশের গার্মেন্টের কাপড় কাশ্মীরের মানুষের কাছে খুবই পছন্দনীয়। বাংলাদেশিদের কাছ থেকে কটনের পোশাক উপহার পেলে তারা খুশি হয় সবচেয়ে বেশি। ব্যক্তিগতভাবে আমার ঘরের মধ্যে লুঙ্গি পরার অভ্যাস আছে। লুঙ্গি পর্তুগিজদের রেখে যাওয়া পোশাক হলেও বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে এর কদর রয়েছে ব্যাপক। কাশ্মীরের কোনো ব্যক্তিকেই আমি লুঙ্গি পরতে দেখেনি। আমার পরনের দুটো লুঙ্গি পুরনো হওয়ার পর ওখানকার বাজারগুলোতে খুঁজে কোথাও লুঙ্গি মেলেনি। পরে, বাংলাদেশের এক বন্ধুকে পাঠাতে বলেছিলাম। বছর খানিক পরে আমার একাধিক কাশ্মীরি বন্ধুকে দেখেছি লুঙ্গির প্রশংসা করতে। আমি পরে তাদের লুঙ্গি উপহারও দিয়েছিলাম। ওরা হোস্টেলে অনেকেই ট্রাউজার পরে ঘুমায়। আর, পোশাক বদলায় বাথরুমে। বাংলাদেশের অসংখ্য এলাকা আছে যেখানে এখনও বাথরুম বলতে আলাদা কোনো ঘর নেই, টয়লেট আছে। টিউবয়েলের সামনে দাঁড়িয়ে বা পুকুরে ঝাঁপিয়ে গোসল করে গ্রামবাংলার অগণিত মানুষ। তাদের জন্য লুঙ্গি এক দারুণ পোশাক।
অপর এক বৃদ্ধ গোলাম নবীর মাইক্রোবাসে আমরা ১০ বিদেশি শিক্ষার্থী চলছিলাম। জিজ্ঞাসা করলেন, কাহাসে? আমরা বললাম, বাংলাদেশ সে। তিনি জানলেন আমরা মুসলমান। তারপরই তার জিজ্ঞাসা বাংলাদেশি মেয়েদের ইশারা করে, টিকা (কপালের টিপ) লাগানো হয়েছে কেন? এ হিন্দুয়ানি। মুসলমান হয়ে কেন টিকা লাগাতে হবে? বাংলাদেশের মেয়েরা এই প্রশ্নের মুখে পড়ে প্রায় নিয়মিতই। প্রায়ই তারা প্রশ্ন করে, 'তোমাদের বাংলাদেশের মেয়েরা টিকা পরে। অথচ এটা শক্তভাবে নিষিদ্ধ ইসলামে। এটা হিন্দু সংস্কৃতি'। একবার আমি জবাবে বললাম, 'হ্যাঁ। এটা নিষিদ্ধ তা আমি জানি। আমাদের দেশে অনেকে এটা পরে। অনেকে পরে না। যার পছন্দ হয় পরে, যার পছন্দ হয় না পরে না। আলেমরা এ ব্যাপারে বক্তব্য দিয়ে থাকেন। কেউ অনুসরণ করে, কেউ করে না'। আমাদের কাশ্মীরি বন্ধুরা অভিযোগ করে, 'বাংলাদেশি মেয়েরা বলছে, তারা সাবাই এটা পরে। এটা তাদের কালচার।'

আমি বললাম, হ্যাঁ। যারা টিকা (টিপ) পরে তাদের এটা কালচার। যা পরে না তাদের এটা কালচার নয়। আসলে এখানে আমরা পাঁচজন শিক্ষার্থী যে বাংলাদেশের সবকিছুর প্রতিনিধিত্ব করতে পারছি তা মনে করো না। বাংলাদেশে ধার্মিক মানুষ আছে। আবার অধার্মিক মানুষও আছে। কেউ ধর্ম পালন করে না, তার মানে এই নয় যে বাংলাদেশের মানুষ অধার্মিক। আরও বললাম, আমি মুসলিম। কিন্তু আমি দাড়ি সেভ করি। তার মানে এই নয়, সব বাংলাদেশিই দাড়ি রাখে না। সত্যিকারের বাংলাদেশকে দেখতে হলে তুমি বাংলাদেশে যাও।

কাশ্মীরের খবরের কাগজে নিয়মিত বিজ্ঞাপন দেখা যায় বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের। বেশ কয়েকজন মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে যাদের সন্তান কিংবা ভাইবোন বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজে পড়ে। তেমন এক শিক্ষার্থী যায়ের মুহাম্মদের সঙ্গে দেখা করেছিলাম অনেকটা আগ্রহ নিয়ে। ঢাকার একটি মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস পড়ছে। দুই মাসের ছুটিতে সে তার দেশে ফিরেছে। দেখলাম সে বেশ ভাল বাংলা শিখেছে। তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, কিভাবে দেখেছে বাংলাদেশকে? জানাল, ভাল ও মন্দলাগার কথাগুলো। ঢাকা শহরের ট্রাফিক জ্যামই ওর কাছে সবচেয়ে দুঃসহ বলে জানাল। ও জানাল, ঢাকায় ওর ক্লাসে ১০০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় ৩০ জন কাশ্মীরি। তবে, কলেজ কর্তৃপক্ষ বিদেশিদের ছাত্রাবাসেও ইংরেজি পত্রিকা রাখে না বলে ওর খবরের কাগজ পড়া হয় না। বাংলাদেশে লেখাপড়ার জন্য ভিসা পেতে কোনো অসুবিধা হয়েছে কিনা জানতে চেয়েছিলাম। জানিয়েছে, না। দিল্লিস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন থেকে এক বছরের ভিসা পেতে ওর লেগেছে মাত্র এক দিন। পরে, আগারগাঁও সিআইডি অফিস থেকে ভিসার মেয়াদ বাড়িয়েও নিতে পেরেছে। কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিষয়ে অধ্যয়নরত আরেক শিক্ষার্থী জানিয়েছিল, সে বাংলাদেশে মেডিকেল সায়েন্স পড়ার জন্য ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু, উত্তপ্ত আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পেরে দেশে ফিরেছে। মোদ্দাকথা, কাশ্মীরিদের মধ্যে কেউ কেউ বাংলাদেশে বেড়িয়েছে; অধিকাংশই দূর থেকে খবরের কাগজের মাধ্যমে জেনেছে আর গ্রামের কেউ কেউ একেবারেই দেখেনি। এই তিন ধরনের মানুষের কাছে বাংলাদেশ তিন রকমের। বিপরীতক্রমে, বাংলাদেশ থেকেও আমার মতো কেউ কেউ কাকতালীয়ভাবে কাশ্মীরে গিয়ে অবস্থান করছে, দেখছে-জানছে, আর অনেকেই কাশ্মীরকে জানতে চাইছে নানা মাধ্যমে। এই দুই জানার মধ্যে বিদ্যমান দিন-রাতের বিশাল ফারাক।

নোট/সূত্র

১. Rasool, M T (August 11, 2015); Kashmir's Bangladesh faces discrimination; Rising Kashmir; Srinagar; 10

২. পানিবাদামকে ইংরেজিতে বলে ওয়াটার নাট। ওয়াটার চেস্টনাট। স্থানীয় কাশ্মীরিরা একে বলে সিংগাড়া। তিনকোণা একটা ফল। কাশ্মীরের লেকের পানিতে ভাসমান

গাছে এগুলো হয়। স্বাদ খানিকটা কাঁঠালের বীজের মতো। উপরে শক্ত একটা কালো খোসা থাকে। সেটি ধারলো ছুরি দিয়ে উঠিয়ে বিক্রি করা হয় বাজারে। সেগুলো বেসনে মিশিয়ে তেলে ভেজেও বিক্রি হয়।

৩. Rai, Mridu (2004); *Hindu Rulers Muslim Subjects*; New Delhi: Permanent Black; 200

৪. Amitav Ghosh (1988); *The Shadow Lines*; UK: John Murray-2011; হজরতবালের মুই মুবারক সম্পর্কে আরও জানতে পড়ুন সপ্তম অধ্যায়।

৫. বিস্তারিত জানতে পড়ুন লেখকের অপ্রকাশিত গবেষণা '*রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব: শেখ মো. আবদুল্লাহ ও শেখ মুজিবুর রহমান* (২০১৬)'; এমএ থিসিস; কাশ্মীর ইউনিভার্সিটি।

৬. Gouhar, G. N (2001); Military Operation in Kashmir: Insurgency at Charar-e-Sharif; New Delhi: Manas Publication; 184-85

৭. প্রাগুক্ত, ১৩১। বিস্তারিত ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায়

৮. Raghavan, Srinath (2013); 1971: The Global History of the Creation of Bangladesh; England: Harvard University Press; P4.

২১
আগামীর কথা

কী হবে তবে ভবিষ্যৎ? এই মৃত্যুর অবধারিত ধারা কি চলবেই? অধ্যাপক সিদ্দিক ওয়াহিদের মন্তব্য ছিল, 'ভারত শেষ কাশ্মীরিকেও হত্যা করবে। তারা সহজে মুক্তি দেবে না'। বিভেদ-বিভাজন আর সুযোগসন্ধানী শ্রেণির সংখ্যা বাড়ছে দিন দিন। তাহলে কি পাক-ভারত দখলদারিই হবে ভাগ্য। পৃথিবীর অসংখ্য বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে মতামত দিয়েছেন। পেনসিলভেনিয়া ও কার্ডিফ ইউনিভার্সিটির সাবেক শিক্ষার্থী মাহবুব মাকদুমী (কাশ্মীর) লিখেছিলেন নোয়াম চমস্কির মতামত। চমস্কির মন্তব্য ছিল, '৮০র দশকের শেষের দিকের ভুয়া নির্বাচনের পর কাশ্মীরের অবস্থা দেখা যাচ্ছে বীভৎস। এই সংঘাতটা ভারত-পাকিস্তান উভয়ের জন্য হাস্যকর। তবে, অপেক্ষাকৃত বড় শক্তি হওয়ায় ভারত কম ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। কিন্তু পাকিস্তানের জন্য ভারতের সঙ্গে সমানে সমান লড়তে সকল পুঁজি বিনিয়োগ করতে হচ্ছে। যা বিধ্বংসী। ভারত গণভোট দেবে বলে আশাবাদী নন তিনি। তার সহাস্য মন্তব্য ছিল, 'ভারত জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে পিলবিসাইটের সুযোগ কখনোই দেবে না। সে জানে জনগণ সেখানে তার থেকে রেহাই চায়। পাকিস্তান ও ভারতের উচিত *এক ধরনের ফেডারেল কাঠামোতে একমত হওয়া,* যা কাশ্মীরকে 'কমবেশি রকমের স্বাধীনতা' দেবে। এক ধরনের সেন্সিবেল নেগোসিয়েশন দরকার যা নিরস্ত্রীকরণ, সেনা সংঘাত অবসান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ খুলে দেবে।[১]

পৃথিবীর অনেক বিশেষজ্ঞের মতের পাশাপাশি জনগণের মতামত কি? বিশেষজ্ঞরা নিরপেক্ষ মতামত দেন। আমিও হয়তো তেমন। আমার কাছে কাশ্মীরের জনগণ, পাকিস্তান কিংবা ভারত প্রত্যেকেই সমান। কারণ, আমি তাদের প্রতিনিধি নই। জাতিরাষ্ট্র আমার পরিচয় আলাদা করে দিয়েছে। আমাকে পরিচিত হতে হয় বাংলাদেশি হিসেবে। আমার হাতের পাসপোর্ট আমার পরিচয় বহন করে। কাশ্মীরের কাছে আমি বহিরাগত। আমিও মানুষ। মানুষের সহদর। এই নীতিতে জনগণের পক্ষে দাঁড়ানোর দুঃসাহস আমরা করি না। কিন্তু, ভ্যালির বাসিন্দারা একটি সক্রিয় পক্ষ। তারা কখনও কখনও বিভ্রান্ত। কিন্তু, যেকোনো সভা-সেমিনারে কিংবা আলোচনায় কাশ্মীরি তরুণদের যে শক্ত মতামত তা বড়ই প্রভাব বিস্তারকারী। অনেকের কাছে তা অবিবেচনাপ্রসূত, অ্যারোগেন্ট। সিংহভাগ জনগণের দাবি, তাদের সুযোগ দেওয়া হোক রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণের। এর পাশাপাশি রয়েছে আন্তর্জাতিক নানা ফ্যাক্টর। পাকিস্তান ও ভারতীয় রাজনীতির

পটপরিবর্তনসহ বিভিন্ন কারণে বদলে যাচ্ছে বিভিন্ন প্রেক্ষিত। শুধু খুলছে না সমাধানের পথ।

অভ্যন্তরীণভাবে রাজ্যটির তিনটি প্রকট সমস্যা আলোচনার দাবি রাখে। প্রথমত, সম্প্রদায়গত বিভেদ। রাজ্যটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে (ভারত শাসিত) জম্মু-কাশ্মীরে মোট মুসলিম জনসংখ্যা ৮৫ লাখ। হিন্দুর সংখ্যা ৩৫ লাখ। অন্যান্য ধর্মাবলম্বী (বৌদ্ধ, শিখ, খ্রিস্টান) প্রায় পাঁচ লাখ। অর্থাৎ ৬৮ শতাংশ মুসলিম জনসংখ্যা। আজাদ কাশ্মীর ও গিলগিত-বালতিস্তানের (পাকিস্তানের অধীনস্থ) হিসাব যোগ করলে মুসলিম সংখ্যা ৮০ শতাংশের বেশি হবে। কিন্তু সংখ্যালঘু জনসংখ্যার মতামতেরও গুরুত্ব আছে। স্পষ্ট হওয়া জরুরি এই সংখ্যালঘু হিন্দু জনসংখ্যা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নয়। বরং, জম্মু অঞ্চলের প্রায় ছয়টি জেলায় তারা মেজরিটি। অর্থাৎ, জনসংখ্যা মূলত দুই প্রান্তে ভাগ করা; হিন্দু মেজরিটি জম্মু আর মুসলিম মেজরিটি কাশ্মীর। গত ৭০ বছরে জেঅ্যান্ডকে'র রাজনীতির মূল বৈশিষ্ট্য ছিল মূলত সাম্প্রদায়িক বিভেদের রাজনীতি। অস্বীকার করার উপায় নেই, কাশ্মীর ভ্যালির হিন্দু-ব্রাহ্মণ ও মুসলিম নাগরিকরা একসঙ্গে বসবাস করে আসছে সহস্র বছর ধরে। তাদের মধ্যে ভিন্নতা ছিল। ভেদাভেদও ছিল। কিন্তু, খড়গহস্ত শত্রুতা ছিল না। কিন্তু, বিগত দশকগুলোর রাজনীতি এই দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্ক শত্রুতার চরম সীমায় নিয়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত, ভৌগোলিক সংকট ও লাদাখবাসীর ভিন্নমত একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। জম্মুর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পুঞ্চ, রাজৌরি ও কিশতোয়ার নিয়ে রয়েছে আরেক প্রশ্ন। এই এলাকাগুলো কাশ্মীর ভ্যালির সঙ্গে ভালভাবে সংযুক্ত নয়। কিন্তু, অনেক ঐতিহাসিক উদাহরণে তাদের সঙ্গে কাশ্মীরি অতীতের সংযোগ মেলে। অনেকেই মনে করেন, জম্মুর কয়েকটি জেলা ভারতকে দিয়ে দেওয়া হোক। বাকি সব মিলে আমাদের পাকিস্তানে যেতে দেওয়া হোক। কিন্তু, এই সমস্যার সমাধান কোন পন্থায় হবে? এর জন্য সব পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য কোনো সমাধান আলোচিত হচ্ছে না এখনও। তৃতীয়ত, কাশ্মীরিদের মধ্যেও সমস্যা সমাধানের প্রশ্নে সুনির্দিষ্ট ঐক্যবদ্ধ অবস্থা নেই। আবদুল্লাহ পরিবার ও এনসি এখনও ভারতে সঙ্গে যুক্ত থেকে স্বায়ত্তশাসনকেই কাশ্মীরিদের সর্বোচ্চ প্রাপ্য বলে মনে করে। আর আজাদির দাবিতো আছেই। অনেকে বলে থাকেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সমঝোতা হলেই সব সমস্যা চুকে যাবে।

অভ্যন্তরীণ এই সব জটিলতা, বিভেদকেও ছাপিয়ে সামনে হাজির হয় ভারত-পাকিস্তানের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এবং কাশ্মীর প্রশ্নে তাদের অবস্থান। স্পষ্টতই, অভ্যন্তরীণ জটিলতাগুলোও অনেক ক্ষেত্রে ভারত ও পাকিস্তানের অনড় অবস্থানের ফল। এই দুই দেশের সক্রিয় তৎপরতার বাইপ্রোডাক্টও বটে। দুই দেশের সমঝোতার পথে প্রথম যে ইস্যু সামনে আসে তা হলো, সন্ত্রাসবাদ। সাম্প্রতিককালের প্রায় সব সমঝোতার আলোচনায়ই ভারতের পক্ষ থেকে বক্তব্য

ছিল, সন্ত্রাসবাদ দমনে পাকিস্তানকে ভারতের সঙ্গে একমত হতে হবে। অর্থাৎ, কাশ্মীরের 'সন্ত্রাসী' বা 'জিহাদি' গোষ্ঠীগুলোকে ভারতবিরোধিতার জন্য পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ করতে হবে। স্পষ্টতই, পাকিস্তানের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা ওই গোষ্ঠীগুলো এখন কম পায়। তবে, নৈতিক সমর্থন অবশ্যই পায়, এবং তা শতভাগ। কিন্তু, এই প্রশ্নে সমঝোতায় আসতে পাকিস্তানের সেখানে অনীহা রয়েছে। হ্যাপি মুন জ্যাকব লিখেছেন, 'কৌশলগত কারণেই[২] পাকিস্তান সন্ত্রাস নির্মূলের প্রশ্নে ভারতের সঙ্গে সমঝোতা করছে না। কারণ, সন্ত্রাসবাদ প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেলে কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারত আর কোনো আলোচনা করবে না। তিনি এও উল্লেখ করেছেন, ভারতের জন্য হুমকি যেসব সন্ত্রাসবাদী সংগঠন- যেমন লস্কর-ই-তৈয়েবা, তারা পাকিস্তানের জন্য হুমকি নয়। বরং, তারা পাকিস্তানকে ভারতের বিরুদ্ধে সীমিত হলেও লড়তে সহযোগিতা দিচ্ছে। অর্থাৎ, সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সমঝোতায় পৌঁছা ভারত ও পাকিস্তানের জন্য মৌলিক বিষয় নয়। জিইয়ে থাকা সংঘাত এবং মানুষের ভোগান্তি হলো দুই দেশের স্বার্থসিদ্ধির একটি কৌশলগত উপাদান। দাবার ঘুঁটি। তবে, ৯/১১ পরবর্তী নানা ঘটনায় কোণঠাসা পাকিস্তান বাহ্যত সন্ত্রাসবাদ প্রশ্নে ভারতের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে অনেক ক্ষেত্রে রাজি হয়েছে। স্পষ্টতই, ৯/১১ পাকিস্তানকে সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করতে ভূমিকা রেখেছে। ফলে, এই পরিচিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে পাকিস্তানও কাশ্মীরের হিজবুল মুজাহিদীনসহ বিভিন্ন সংগঠনকে সরাসরি সহয়তা বন্ধ করেছে। গোপনে সহায়তা যে করছেনা তা বলা কঠিন।

কিন্তু, আস্থা সৃষ্টির জন্য এটুকুই যথেষ্ট নয়। তাছাড়া, ৯/১১-এর পর বিশ্বরাজনীতির ফোকাস কাশ্মীর থেকে সরে আফগানিস্তান ও ইরাকে চলে গেছে। এখন তা চলে গেছে সিরিয়ায়। ফলে কাশ্মীর সমস্যা আর বিশ্বদরবারে বড় কোনো সমস্যা নয়। ওয়ার অন টেররিজমের সঙ্গে ভারত অংশ নিয়েছে। তারই অংশ হিসেবে, কাশ্মীরের বিদ্রোহী গ্রুপগুলোকে এমনকি স্বাধীনতাকামী (আনআরমড) রাজনৈতিক গ্রুপগুলোকেও বৈশ্বিক সন্ত্রাসের অংশীদার হিসেবে চিহ্নিত করণের প্রচেষ্টা ভারতের পক্ষ থেকে আছে।

দ্বিতীয়ত, ভারতের বাইল্যাটারালিজম বনাম পাকিস্তানের আন্তর্জাতিকায়ন পরস্পরবিরোধী। এ হলো কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত ও পাকিস্তানের মৌলিক বিভেদ। ভারতই কাশ্মীর সমস্যাকে প্রথম জাতিসংঘে নিয়ে গিয়েছিল। মহারাজা ইন্সট্রুমেন্ট অব একসেশনে স্বাক্ষর করে ভারতে যুক্ত হয়েছেন। এই কাগজের বলে ভারতের ধারণা ছিল আন্তর্জাতিক বিচারে কাশ্মীরের অধিকার ভারত পাবে। কিন্তু, সেটি হয়নি। নানা কারণে, জাতিসংঘের রেজ্যুলেশনগুলোর মোদ্দাকথা দাঁড়ায়, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত (Final Dsposition) নির্ধারিত হবে গণতান্ত্রিক পন্থায় গৃহীত জনগণের ইচ্ছার ভিত্তিতে (Will of the people expressed by the democratic method)। তখন থেকে পাকিস্তান সবসময়ই সমস্যার সমাধানে জাতিসংঘের

ভূমিকার পক্ষে ছিল। ভারত বলেছে, সমাধান হবে দ্বিপক্ষীয়ভাবে। তবে, দুই পক্ষই বিভিন্ন সময়ে নিজেদের অবস্থানে কিছুটা রদবদল করলেও আখেরে আবার নিজস্ব অবস্থানে ফিরে গেছে।

দুই দেশের মধ্যে সমঝোতার পথে তৃতীয় জটিলতা হলো, কাশ্মীরি জনগণ ও তাদের স্থানীয় প্রতিনিধিত্বের অংশীদারিত্ব। পাকিস্তান বিভিন্ন সময় কাশ্মীরি নেতাদেরকে আলোচনার অংশীদার হিসেবে উল্লেখ করেছে। ২০১৫ সালেও নওয়াজ শরীফ জাতিসংঘে তার বক্তব্যে বলেছেন, কাশ্মীরি নেতারা গুরুত্বপূর্ণ পার্টি। কিন্তু, শিমলা চুক্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাশ্মীরি নেতৃত্বকে অংশীদার হিসেবে স্পষ্ট স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। আর ভারতের পক্ষ থেকে কখনোই কাশ্মীরিরা বিরোধের অংশীদার হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। এভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ পক্ষকে সমাধান পক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়া বা অস্বীকার করার মাধ্যমে সমাধান প্রস্তাবগুলোকে সর্বজনীনতাহীন করে দেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে ২০০৪ সালে (যখন ভারত-পাকিস্তান কম্পোজিট ডায়লগ প্রসেস চলছিল) ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দলের প্রধান জন ওয়ালস কুশনান বলেছিলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি যে সেখানে তিনটি পক্ষ রয়েছে। তাদের প্রত্যেকেরই কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে গ্রহণযোগ্য স্বার্থ রয়েছে। এই তিনটি পক্ষ হলো, ভারতীয় সরকার, পাকিস্তানি সরকার এবং কাশ্মীরি জনগণ ও তাদের প্রতিনিধিরা। সুতরাং, এই সবপক্ষকে সম্পৃক্ত করতে হবে।'[৩]

চতুর্থ সমস্যা হচ্ছে পাকিস্তানের সাবেক প্রসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফের চার দফা প্রস্তাবের ব্যর্থতা। অনেকের মূল্যায়ন হলো, মোশাররফ চেষ্টা করেছিলেন কাশ্মীরকে বাঁচাতে, তার পক্ষে সম্ভব সর্বোচ্চ উপায়ে।[৪] ২০১৫ সালে জাতিংসংঘের সাধারণ পরিষদে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ আরেকটি (চার দফাবিশিষ্ট) সমঝোতার প্রস্তাব দেন।[৫] সেটিও অনেকটা মোশারফের প্রস্তাবের মতো। তিনি বলেছিলেন,

১. দুই দেশ লাইন-অব-কন্ট্রোলে গুলিবিনিময় সম্পূর্ণ বন্ধ (Cease fire) করবে। জাতিসংঘ সেটি মনিটর করবে।
২. দুই দেশ কোনো অবস্থাতেই পরস্পরকে ভীতি প্রদর্শন বা শক্তি প্রদর্শন করবে না। এবং এটি জাতিংসঘের মৌলিক নীতি।
৩. কাশ্মীর থেকে মিলিটারি সরিয়ে নেওয়া (Demilitarize) হবে।
৪. উভয়পক্ষ নিঃশর্তভাবে পৃথিবীর উচ্চতম যুদ্ধক্ষেত্র সিয়াচেন গ্লেসিয়ার থেকে সৈন্য সরিয়ে নেবে।

অবশ্য তিনি সেখানেও কাশ্মীরি প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনাকে অপরিহার্য বলে উল্লেখ করেন। অর্থাৎ, তার প্রস্তাবে (১) কাশ্মীরি বিদ্রোহী নেতাদেরকে আমলে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। (২) জাতিসংঘকে কোনো না কোনোভাবে সম্পৃক্ত করার

কথা বলা হয়েছে। এবং প্রস্তাবটি তিনি তুলেছেনই জাতিসংঘে। এই দুইটি বিষয়কেই অস্বীকার করে আসছে ভারত সব সময়। সেদিক থেকে নওয়াজ শরীফের প্রস্তাব কমই গ্রহণযোগ্য বিপরীত পক্ষের কাছে। অপেক্ষাকৃতভাবে, মোশাররফের প্রস্তাব বেশি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল। সে সময় একমাত্র সৈয়দ আলী গিলানী ছাড়া সবাই পারভেজ মোশাররফের প্রস্তাবের পক্ষে একমত হয়েছিল।[৬] কিন্তু, এরই মধ্যে পারভেজ মোশাররফ নিজ দেশেই ক্ষমতাচ্যুত হন। ফলে, সে প্রস্তাবের ভিত্তিতে আলোচনা আর অগ্রসর হয়নি।

২০১৫ সালের অগাস্টে ন্যাশনাল সিকিউরিটি এডভাইসর লেভেল আলোচনা শুরু হয়েছিল। পাকিস্তানের পক্ষে আজিজ এবং ভারতের পক্ষে অজিৎ দোভালের মধ্যে এ আলোচনা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা অপুষ্ট গর্ভপাতের ভাগ্য বরণ করে। ২৩-২৪ অক্টোবর এই আলোচনার নির্ধারিত দিন ছিল। আজিজ এসেছিলেন। কিন্তু, আগমূহূর্তে পররাষ্ট্র মন্ত্রী সুষমা স্বরাজ শর্ত দিয়ে দেন যে, পাকিস্তানের পক্ষ থেকে আশ্বাস দিতে হবে, তারা 'সেপারেটিস্ট' নেতাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা করবে না।

পরদিন, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ তার মন্ত্রিসভায় বলেন, কাশ্মীরি নেতাদের মতামত ছাড়া কাশ্মীরের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কাশ্মীরের নেতারা কোনো তৃতীয় পক্ষ নয়। তারা একটা গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ'।[৭] হুরিয়াত নেতা শাবির শাহ দাবি করেন, হুরিয়াত কনফারেন্সই জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের সব এলাকার মানুষের মতামতের সত্যিকার প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু, ভারতীয় সংবিধানের অধীনে কোনোভাবেই হুরিয়াতের সঙ্গে নয়াদিল্লির আলোচনা সম্ভব নয়।

পঞ্চমত, দুই দেশের সেনাবাহিনীর অবস্থান কী? তারা কি সমাধান চায়? ১৯৬৫ সাল নাগাদ জাতিসংঘের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাধানের সকল উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছিল। তার পর থেকেই উভয় দেশ সমস্যার একটা সামরিক সমাধানে আগ্রহী। যারই ফল হলো ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। কিন্তু, তা কোনো সমাধান দিতে পারেনি।[৮] ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয়ও ব্যাপক জ্বালানি সরবরাহ করে কাশ্মীর সমস্যায়। ঢাকায় পরাজয়ের পর পাকিস্তানি নীতি নির্ধারকদের মধ্যে উপলব্ধি হয় বলপ্রয়োগ করে ভারতের হাত থেকে কাশ্মীর নেওয়া সম্ভব নয়। এছাড়া ১৯৭১ পরবর্তী শিমলা চুক্তি আন্তর্জাতিক মহলের ভূমিকাকে আরও সীমিত করে দেয়। ফলে কাশ্মীরের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকরাও নতুন পথ ভাবতে শুরু করে। কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে যুক্ত হবে কি হবে না, সে প্রশ্ন অনেকটা গুরুত্বহীন হয়ে যায়। নতুন ভাবনা শুরু হয়, ভারতের মধ্যে জেঅ্যান্ডকে কী ধরনের স্ট্যাটাস পাবে। ভারতও অনেকটা আত্মবিশ্বাস পায়। শেখ আবদুল্লাহসহ অনেক রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি দেয়।[৮] জাতিসংঘের বাতলে দেওয়া গণভোটের প্রশ্নটিই শুধু পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়।

এই প্রেক্ষিতে সমস্যার সস্তা ও ত্বরিত সমাধান দৃশ্যত অসম্ভব মনে হচ্ছে। ভুলে গেলে চলবে না যে সমস্যাটির পেছনে হাজার বছরের পুরনো কারণও যুক্ত রয়েছে। প্রথমত, দীর্ঘমেয়াদে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি উদ্যোগ নেওয়া জরুরি।

> ১. জনগণের সমস্যাবলী উপলব্ধি ও তাদের শান্তিপ্রতিষ্ঠার পথে অংশীদার করা,
>
> ২. বিভিন্ন গ্রুপকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা,
>
> ৩. সিভিল সোসাইটির সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য ইনস্টিটিউশন গড়ে তোলা জরুরি। সেটা হতে পারে উভয় পাশে,
>
> ৪. কাশ্মীর সমস্যার বর্ণনা একেক পক্ষ একেকভাবেই প্রদান করছে। একাধিক পরস্পরবিরোধী জাতীয়তাবাদী চশমার মধ্যদিয়ে সমস্যাটিকে দেখা ও ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। এখন বৈশ্বিকভাবে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ও বোধগম্য একটা ঐক্যবদ্ধ ন্যারেটিভ (বয়ান) তৈরির উদ্যোগ নেওয়া দরকার,
>
> ৫. কাশ্মীরের মুসলমানদের সঙ্গে বৃহত্তর হিন্দু সমাজের একটা সম্পর্ক স্থাপন জরুরি। সকল মুসলিম সন্ত্রাসী নয় এটি যেমন একটি সত্যকথা, তেমনি সকল হিন্দুকে সাম্প্রদায়িক বলার সংকীর্ণতা থেকেও মুসলিম সম্প্রদায়রের উত্তোরণ ঘটাতে হবে। একইভাবে ইসলামের বিভিন্ন তরিকার মধ্যেও আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে যেন একসঙ্গে সবাই চর্চা চালিয়ে যেতে পারে। আর এই সবকিছুর আগে সহিংসতার অবসান ঘটাতে হবে।[৯]

এজন্য আগে সংঘাত নিরসনের টেকসই পদ্ধতির ধারণা জরুরি। বিশেষজ্ঞরা বলেন, সৃষ্টির শুরু থেকেই নানা ধরনের সংঘাতের মধ্য দিয়েই বিশ্বব্যবস্থা এগিয়ে চলেছে। আবার সংঘাত নিরসন করে শন্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগও এসেছে একের পর এক। ইয়োহান গালটুং, উইলিয়াম উরিসহ বিশ্ব শান্তি আন্দোলনের পুরোধাগণ তাই এখন বলছেন, সংঘাত যেমন সর্বকালীন, শান্তিরক্ষার প্রচেষ্টাও তেমন সর্বকালীন। তারা বলছেন, পৃথিবী যতদিন আছে, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় ভূমিকা ততদিন চালিয়ে যেতে হবে। যেকোনো সময় একটি সংঘাতের সমাধান হওয়ার পর সামান্য কারণে আবার সেখানে যুদ্ধ লেগে যেতে পারে। এজন্য পিস অ্যান্ড কনফ্লিক্ট স্টাডিজের জনক ইয়োহান গালটুং তার 'সক্রিয় শান্তি' (Active Peace) তত্ত্বে সংঘাত নিরসনের তিনটি পর্যায় ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রথমত, সংঘাত ব্যবস্থাপনা (Conflict Management): অর্থাৎ, যে কোনো উপায়ে অস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ করা। এই পর্বে অন্তত সহিংসতা ও প্রাণহানির অবসান ঘটানোর চেষ্টা হয়। এ অবস্থাকে অনেকে আর্মড পিস হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। এই অবস্থায়ও বিরোধপূর্ণ পক্ষগুলো একে অপরের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। চরম যুদ্ধাবস্থা থেকে এই প্রথম পর্যায়ে উন্নীত করার প্রচেষ্টাকে শান্তি রক্ষা (Peace

Keeping) বলা হয়। শান্তি রক্ষার এই পর্যায় থেকেও সামান্য কারণে আবার যুদ্ধ লেগে যেতে পারে। যেমনটা হয় কাশ্মীরে। এই দেখা যায় সবকিছু স্বাভাবিক, কোনো প্রাণহাণি নেই। প্রতিবাদ নেই। পর্যটকরা যাচ্ছে। নির্বাচন হচ্ছে। ভারত সরকার বলছে সবকিছু ঠিকঠাক। নরমাল। কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে ভালভাবেই আছে। ভূ-স্বর্গে স্বর্গীয় শান্তি বিরাজ করছে। কিন্তু, হঠাৎ করেই কোনো এক জঙ্গলে বুরহানের মৃত্যু হলো। আর শান্তির পায়রা উড়ে গেল। একদিকে বিক্ষুব্ধ জনগণ মাসের পর মাস হরতাল পালন করছে। সরকার চালু রাখছে কারফিউ। অন্যদিকে, সশস্ত্র প্রতিরোধকারী ও সৈন্যদের মধ্যে গুলিবিনিময় হচ্ছে। এই সশস্ত্র শান্তি (Armed Peace) আসলে প্রকৃত শান্তি নয়। পৃথিবীর সব সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা শান্তি বলতে এই পর্যন্তই বোঝে। তাদের বয়ানে শান্তি মানেই হলো যেখানে যুদ্ধ নেই। মিলিটারিজম বিশ্বাস করে যে, 'শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তি প্রয়োগ করতে হয়'। এজন্য, পৃথিবীর ইতিহাসে ১৯ শতককে বলা হয় শান্তির শতক। কারণ, ওই শতকে কোথাও বড় কোনো যুদ্ধ হয়নি। কিন্তু, ওই শান্তি পরের শতকে এসে অশান্তি হয়ে গেল। বিশ্বযুদ্ধে জ্বলে উঠলো দুনিয়া। এরপর বাকি সময় ধরে চলল শীতল যুদ্ধ আর অসংখ্য স্বাধীনতার সংগ্রাম। প্রমাণ হয়ে গেল, সশস্ত্র শান্তি আসলে শান্তি নয়।

সংঘাত সমাধানের দ্বিতীয় পর্যায়কে গালটুং বলছেন সংঘাত নিরসন (Conflict Resolution)। এই পর্বে বিবদমান সব পক্ষ একে অপরের কথা শুনতে আগ্রহী হবে। তারা প্রত্যেকেই অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়। সবাই মিলে একটা সমঝোতায় আসে বা আসতে চায়। এই কার্যটি বিবদমান পক্ষগুলো নিজেরা স্বপ্রণোদিত হয়ে করতে পারে। আবার সেখানে তৃতীয় কোনো পক্ষ মধ্যস্থতা করতে পারে। তৃতীয় পক্ষ তাদের সমঝোতায় আসতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাধ্যও করতে পারে, সালিশ ব্যবস্থার মতো। সক্রিয়তার এই দ্বিতীয় পর্বকে গালটুং বলেছেন শান্তি তৈরি (Peace Making)। বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের সশস্ত্র গোষ্ঠীর মধ্যে স্বাক্ষরিত ১৯৯৭ সালের শান্তিচুক্তি মূলত এই পর্যায়েরই শুরু। কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে গত পৌনে এক শতাব্দীব্যাপী চলমান বিরোধের সমাধান কাজ এই পর্ব পর্যন্ত আসতেই পারেনি।

শান্তি প্রচেষ্টার তৃতীয় ধাপ নিয়ে আলোচনা কাশ্মীর ইস্যুতে অপ্রয়োজনীয়। তা হলো, পৃথিবীর যেসব সংঘাত নিরসন (Resolution) হয়েছে সেটাও পূর্ণ শান্তির নিশ্চয়তা নয়। শান্তির পূর্ণ নিশ্চয়তা হবে তখনই যখন সংঘাত পরিবর্তিত হবে সম্প্রীতিতে। একে গালটুং বলেছেন Conflict Transformation। এই পর্বে উন্নীত হলে বিবদমান পক্ষগুলো একে অপরকে আর শত্রু ভাববে না, ঘৃণা করবে

না। কাশ্মীরে সেই পর্যায়ের শান্তির আশা আমরা করতেই পারি। সেজন্য, অবিলম্বে সকল পক্ষের কাছে অন্তত প্রাণহানি বন্ধ করার মিনতি রইল।

এই বাস্তবতায়ই দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে হবে বাংলাদেশিদের। মনে রাখা দরকার, স্বাধীনতা চাওয়া বা না চাওয়া যে কারও মৌলিক অধিকার। অন্য কেউ তা আদায় করে দিতে পারে না। কাশ্মীরিদের স্বাধীনতা অর্জনে বাংলাদেশিদের লড়ার সুযোগ নেই। কাশ্মীর বিরোধের শান্তিপূর্ণ ও ন্যায্য মীমাংসার প্রত্যাশা করতে পারি আমরা; শান্তি কামনা করতে পারি; মানুষে মানুষে সখ্য আর আস্থার আশা করতে পারি।

ভারত দাবি করে কাশ্মীর হচ্ছে 'ক্রাউন অব ইন্ডিয়া'। ভারত-পাকিস্তানের সংঘাত যদি সম্প্রীতিতে রূপ নেয় তাহলে কাশ্মীর হয়ে উঠতে পারে গোটা দক্ষিণ এশিয়ার মুকুট। 'ক্রাউন অব সাউথ এশিয়া।' এটা হতে পারে আমাদের দৃঢ় আশাবাদ।

আমাকে কাশ্মীরের বন্ধুরা প্রায়ই প্রশ্ন করত, তুমি কাশ্মীর সমস্যার কী সমাধান চাও। তুমি কি আমাদের আজাদির সমর্থন করো? আমি বলতাম, 'তোমাদের কাশ্মীরকে নিয়ে দুই দেশ টানাহেঁচড়া করছে। তোমরা নিজেরাই এখানে একটা পক্ষ হিসেবে স্বীকৃতি পাওনি। চতুর্থ পক্ষ হিসেবে তোমরা আমাকে যুক্ত করতে চাও?' দৃশ্যত, কাশ্মীর প্রশ্নে বাংলাদেশিদের কোনো অবস্থান, জটিলতায় নতুন মাত্রা যোগ করবে। তাই, শেষ প্রান্তে এসে আমি বরং দুটি বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে নিজেকেই প্রশ্ন করি, বিধ্বস্ত, বিপন্ন কাশ্মীর আমাকে কী দিয়েছে?[১১]

নোট/সূত্র

১. Mahboob Makdoomi; Greater Kashmir; August 8, 2015; P9.
২. Happymon Jacob; *Is Pakistan Unable to Defeat terrorism?*; Greater Kashmir, P10; September 20, 2015.
৩. J-k.com; *Kashmir, World's Most Beautiful Prison*; http://www.jammu-kashmir.com/archives/archives2004/kashmir20040721a.html (accessed: 14, Oct; 2015)
৪. Mahmood Ur Rashid; *Signs of Change, at last!*; Greater Kashmir; September 19, 2015; P11.
৫. Greater Kashmir; October 1, 2015; P1.
৬. Ahmed, Samir; Contextualizing Mosharraf's Four Point Formula; Journal of Kashmir Studies, 2012; Pp: 87-105.

৭. Greater Kashmir; August, 26; 2015; P:1.
৮. Sajad Padder; India-Pakistan Composit Dialogue Process (2015); Pp: 20-30.
৯. Mehmood-ur-Rashid; Two Nations Practice; Greater Kashmir; September 26, 2015; P:11.
১০. Zakaria Polash; কাশ্মীর সমস্যার সমাধান কী? (সেপ্টেম্বর ১৯, ২০১৬) http://www.ntvbd.com/author/zakaria-polash
১১. জাকারিয়া পলাশ; কাশ্মীর থেকে শেখা; সাম্প্রতিক দেশকাল; নভেম্বর ১০, ২০১৬ (ধারাবাহিকের শেষ পর্ব)।

২২

কাশ্মীর থেকে শেখা

দুটি বছর। নির্মল প্রকৃতির বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়েছি। দেখেছি কতগুলো মানুষের নির্মল চেহারা আতঙ্কে ফ্যাকাশে হতে হতে বীভৎস হয়ে গেছে। এখন তারা ভয়ঙ্কর। মৃত্যু এখন তাদের কাছে ভয় নয়, সাহসের সঞ্চয়। ভারতীয় সাংবাদিক হুমরা কোরায়শী কাশ্মীরের ওপর লিখেছেন একটি বই। তিনি একবার এক আলাপে বলেছিলেন, তোমরা কাশ্মীরে থাকছো, দেখছো। বিনিময়ে কাশ্মীরকে কী দেবে? কী করবে কাশ্মীরের মানুষের জন্য? এই প্রশ্নের কোনো জবাব সেদিন ছিল না আমার কাছে। আজও জানি না কী দেওয়ার আছে আমার কাশ্মীরকে? তবে, কাশ্মীর আমাকে দিয়েছে কিছু পরম প্রিয় বন্ধু।
কাশ্মীর আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে ফের মনুষ্যত্ব। কাশ্মীর আমাকে উপলব্ধি করতে শিখিয়েছে, মৃত্যুর মধ্যে জীবনকে। কাশ্মীর আমাকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছে বাঙালির বিদ্রোহের কবি কাজী নজরুলের বাণী– 'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাসরি, আর হাতে রণতূর্য'। এখনও কাশ্মীরের ঘরে ঘরে ওয়ানয়ুন সুর করে বেজে ওঠে আনন্দ-অনুষ্ঠানে, বিয়েতে। ওয়াজারা রাধেন ওয়াজওয়ান। আবার সেখানেই গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে কফিনে ঢোকে তাগড়া যুবক। যেখানে আমার মতো বিদেশিরা নিরাপদ অনেকটাই। কিন্তু, মাটির ছেলেরা কবরের আগ পর্যন্ত নিরাপত্তাহীন। সেই মাটির ছেলেদের নিরাপত্তার প্রত্যাশা করেই ফিরছি স্বদেশে, নিরাপদে। কাশ্মীরকে সে হিসেবে কিছুই দেওয়া হয়নি। তবে, কাশ্মীর থেকে নিয়েছি অনেক।

কাশ্মীরের কাছ থেকে আমি ঠিক তিনটি বিষয় শিক্ষালাভ করেছি। প্রথমত, কাশ্মীরি ভাষা। ভাষাটির এক অন্যরকম শক্তি আছে। আছে জযবা। এ ভাষার শব্দভাণ্ডার সীমিত কিন্তু আবেগ অসীম। ছোটো-খাটো বাক্য কিন্তু তীব্র প্রভাব সৃষ্টিকারী। বাংলাভাষার চেয়ে অনেক কম শব্দ এর অভিধান। এতে সংস্কৃত, ফার্সি, আরবি, উর্দু, ইংরেজি আর হিব্রুসহ অনেক ভাষার শব্দ আছে। কিন্তু ভাষাটির নিজের শব্দ খুবই কম। আমার ধারণা এটা এখনও একটা রিসিভার ল্যাঙ্গুয়েজ। গ্রাহক। বিতরণকারী নয়। ভাষা হলো একটা সমাজের প্রবেশদ্বার। আমি সে দুয়ার যখনই খুলেছি তখন দেখি সময় হয়েছে ফেরার। এখন কাশ্মীর আমাকে বারবার টানে।

দ্বিতীয়ত, কাশ্মীর আমাকে দিয়েছে একটি রাজনৈতিক উপলব্ধি। কাশ্মীর থেকেই আমি প্রথম উপলব্ধি করেছি জাতিরাষ্ট্রের সীমাবদ্ধতা। অভিজ্ঞতা পেয়েছি যে কিভাবে জাতিরাষ্ট্র অক্ষম হয়ে পড়ে অনেক সময়। সৈন্য, সামন্ত, গোলাবারুদসহ সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের উপস্থিতি সত্ত্বেও তার সুগভীর ভিত্তি যদি নড়বড়ে হয় তখন যে কী অবস্থা হয় তা উপলব্ধি করেছি কাশ্মীর থেকে। কাশ্মীরি লোকদের আচরণের মধ্যে রাষ্ট্রের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা বা ভক্তি নেই। সেখানে সামাজিক কাঠামো কার্যকর রয়েছে রাষ্ট্রের চেয়ে বহুগুণ।
সত্যিই, সমাজ হলো একটি স্থানিক লোকাল গ্রোন প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্র হলো মৌলিকভাবে বহিরাগত। স্পষ্টতই, ইউরোপীয়। সমাজ একই সঙ্গে হারমনি আর কনফ্লিক্টের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়। রাষ্ট্র চলে ক্ষমতার ভিত্তিতে। রাষ্ট্র দাবি করে তার শক্তি প্রয়োগের বৈধতা আছে। আমার দেশে এমনই একটা রাষ্ট্রযন্ত্র আজ সমাজের ওপর আধিপত্য করে। আর কাশ্মীরে দেখেছি সমাজ বুড়ো আঙ্গুল দেখায় রাষ্ট্রকে। যদিও রাষ্ট্র সেখানে প্রশাসনযন্ত্র চালায় কিন্তু মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ ব্যাপকভাবে পরিচালিত এবং প্রভাবিত হয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো দ্বারা। কাশ্মীরের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাষ্ট্রগুলো আজও এই সীমাবদ্ধতাগুলো উপলব্ধি করেছে বলে মনে হয় না। যত দ্রুত তারা বুঝতে পারে ততই ভাল।
তৃতীয়ত, আমি এখান থেকে শিখেছি বিশ্বাসের গভীরতা। বুঝেছি, বিশ্বাস কতটা গভীরভাবে মানুষের কার্যক্রমকে বাতলে দিতে পারে। এখানকার অধিকাংশ মানুষ ভাবে এবং চলে তাদের বিশ্বাসের ভিত্তিতে। তারা অন্যকে ভালবাসে কেবল বিশ্বাসের কারণে, আস্থাও রাখে। আবার কেবল বিশ্বাসের কারণেই ঘৃণা করে। সমাজের এই বৈশিষ্ট্যটি অনেক কল্যাণকর বিবেচিত হতে পারে। এটা সমাজে শান্তি আনতে পারে। কেবলমাত্র যদি বিভিন্ন বিশ্বাসের মধ্যকার সম্পর্কগুলো সঠিকভাবে উপলব্ধি ও নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু, কাশ্মীরিদের বিশ্বাসগুলো বহুধাবিভক্ত। স্পষ্টতই, সেখানে আছে স্টিরিওটাইপস আর প্রিজুডিস। একের বিরুদ্ধে অন্যের। সেটাই সৃষ্টি করেছে বিশৃঙ্খলা আর অস্থিরতা। সেই অস্থিরতা অবসানের আশাবাদ জানিয়ে কাশ্মীরি ভাষায়ই শেষ করি, 'খোদায়েস পৈঠ হাওয়ালাহ'– খোদা ভরসা।

পরিশিষ্ট-১: অমৃতসর চুক্তি

Treaty of Amritsar (*March 16, 1846)*

The treaty between the British Government on the one part and Maharajah Gulab Singh of Jammu on the other concluded on the part of the British Government by Frederick Currie, Esq. and Brevet-Major Henry Montgomery Lawrence, acting under the orders of the Rt. Hon. Sir Henry Hardinge, G.C.B., one of her Britannic Majesty's most Honorable Privy Council, Governor-General of the possessions of the East India Company, to direct and control all the affairs in the East Indies and by Maharajah Gulab Singh in person 1846.

Article 1
The British Government transfers and makes over for ever in independent possession to Maharajah Gulab Singh and the heirs male of his body all the hilly or mountainous country with its dependencies situated to the eastward of the River Indus and the westward of the River Ravi including Chamba and excluding Lahol, being part of the territories ceded to the British Government by the Lahore State according to the provisions of Article IV of the Treaty of Lahore, dated 9th March, 1846.

Article 2
The eastern boundary of the tract transferred by the foregoing article to Maharajah Gulab Singh shall be laid down by the Commissioners appointed by the British Government and Maharajah Gulab Singh respectively for that purpose and shall be defined in a separate engagement after survey.

Article 3
In consideration of the transfer made to him and his heirs by the provisions of the foregoing article Maharajah Gulab Singh will pay to the British Government the sum of seventy-five lakhs of rupees (Nanukshahee), fifty lakhs to be paid on or before the 1st October of the current year, A.D., 1846.

Article 4
The limits of territories of Maharajah Gulab Singh shall not be at any time changed without concurrence of the British Government.

Article 5
Maharajah Gulab Singh will refer to the arbitration of the British Government any disputes or question that may arise between himself and the Government of Lahore or any other neighboring State, and will abide by the decision of the British Government.

Article 6
Maharajah Gulab Singh engages for himself and heirs to join, with the whole of his Military Forces, the British troops when employed within the hills or in the territories adjoining his possessions.

Article 7
Maharajah Gulab Singh engages never to take to retain in his service any British subject nor the subject of any European or American State without the consent of the British Governnent.

Article 8
Maharajah Gulab Singh engages to respect in regard to the territory transferred to him, the provisions of Articles V, VI and VII of the separate Engagement between the British Government and the Lahore Durbar, dated 11th March, 1846.

Article 9
The British Government will give its aid to Maharajah Gulab Singh in protecting his territories from external enemies.

Article 10
Maharajah Gulab Singh acknowledges the supremacy of the British Government and will in token of such supremacy present annually to the British Government one horse, twelve goats of approved breed (six male and six female) and three pairs of Cashmere shawls.

This Treaty of ten articles has been this day settled by Frederick Currie, Esq. and Brever-Major Henry Montgomery Lawrence, acting under directions of the Rt. Hon. Sir Henry Hardinge, Governor-General, on the part of the British Government and by Maharajah Gulab Singh in person, and the said Treaty has been this day ratified by the seal of the Rt. Hon. Sir Henry Hardinge, Governor-General.
Done at Amritsar the sixteenth day of March, in the year of our Lord one thousand eight hundred and forty-six, corresponding with the seventeenth day of Rubee-ul-Awal (1262 Hijri).

(Signed) H. Hardinge (Seal), (Signed) F. Currie & (Signed) H. M. Lawrence

পরিশিষ্ট-২: ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ

(*Part XXI.—Temporary, Transitional and Special Provisions.—Art.* 370.)

370.

(1) Notwithstanding anything in this Constitution,—

(*a*) the provisions of article 238 shall not apply in relation to the State of Jammu and Kashmir;

(*b*) the power of Parliament to make laws for the said State shall be limited to—

(*i*) those matters in the Union List and the Concurrent List which, in consultation with the Government of the State, are declared by the President to correspond to matters specified in the Instrument of Accession governing the accession of the State to the Dominion of India as the matters with respect to which the Dominion Legislature may make laws for that State; and
(*ii*) such other matters in the said Lists as, with the concurrence of the Government of the State, the President may by order specify.

> [*Explanation.*—For the purposes of this article, the Government of the State means the person for the time being recognised by the President as the Maharaja of Jammu and Kashmir acting on the advice of the Council of Ministers for the time being in office under the Maharaja's Proclamation dated the fifth day of March, 1948]

(*c*) the provisions of article 1 and of this article shall apply in relation to that State;

(*d*) such of the other provisions of this Constitution shall apply in relation to that State subject to such exceptions and modifications as the President may by order1 specify: Provided that no such order which relates to the matters specified in the Instrument of Accession of the State referred to in paragraph (*i*)

of sub-clause (*b*) shall be issued except in consultation with the Government of the State: Provided further that no such order which relates to matters other than those referred to in the last preceding proviso shall be issued except with the concurrence of that Government.

(2) If the concurrence of the Government of the State referred to in paragraph (*ii*) of sub-clause (*b*) of clause (1) or in the second proviso to sub-clause (*d*) of that clause be given before the Constituent Assembly for the purpose of framing the Constitution of the State is convened, it shall be placed before such Assembly for such decision as it may take thereon.

পরিশিষ্ট-৩: পারভেজ মোশাররফের চার দফা প্রস্তাব

The four-point formula General Musharraf prescribed is:

1. Kashmir should have the same borders but people be allowed to move freely across the region
2. The region should have self-governance or autonomy but not independence
3. Troops should be withdrawn from the region in a phased manner
4. A joint mechanism comprising representatives from India, Pakistan and Kashmir be set up to supervise the implementation of such a roadmap for Kashmir.